তাফহীমুল কুরআন

সারসংক্ষেপ

আমপারার তাফসীর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

তাফহীমুল কুরআন

সারসংক্ষেপ

আমপারার তাফসীর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.bjilibrary.com

তাফহীমুল কুরআন (সারসংক্ষেপ)
আমপারার তাফসীর

প্রকাশক	ঃ	আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯
প্রথম সংস্করণ	ঃ	সেপ্টেম্বর - ১৯৮২
৩৩তম মুদ্রণ	ঃ	আগস্ট - ২০১৭ শ্রাবণ - ১৪২৪ জিলকদ - ১৪৩৮
কম্পিউটার কম্পোজ	ঃ	এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
নির্ধারিত মূল্য	ঃ	১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।
মুদ্রণে	ঃ	আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Summary of **"TAFHIMUL QURAN 30th Juz."**, By Sayyed Abul A'la Maududi. Translated and Edited by Prof. Ghulam Azam, Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price : Taka 100.00 (One hundred) only.

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

※	অনুবাদকের কথা	ক-ঠ
১.	সূরা আল-ফাতিহা	১
২.	সূরা আন-নাবা	৯
৩.	সূরা আন-নাযি'আত	১৭
৪.	সূরা 'আবাসা	২৪
৫.	সূরা আত-তাকভীর	৩১
৬.	সূরা আল-ইনফিতার	৩৬
৭.	সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন	৪০
৮.	সূরা আল-ইনশিক্বাক	৪৬
৯.	সূরা আল-বুরূজ	৫০
১০.	সূরা আত-তারিক	৫৫
১১.	সূরা আল-আ'লা	৫৮
১২.	সূরা আল-গাশিয়া	৬২
১৩.	সূরা আল-ফাজর	৬৬
১৪.	সূরা আল-বালাদ	৭২
১৫.	সূরা আশ-শামস	৭৭
১৬.	সূরা আল-লাইল	৮০
১৭.	সূরা আদ্-দোহা	৮৪
১৮.	সূরা আলাম-নাশ্রাহ্	৮৭
১৯.	সূরা আত-তীন	৯০
২০.	সূরা আল-'আলাক	৯৩
২১.	সূরা আল-ক্বাদর	৯৯
২২.	সূরা আল-বায়্যিনাহ	১০২
২৩.	সূরা আয্-যিলযাল	১০৬
২৪.	সূরা আল-'আদিয়াত	১০৮
২৫.	সূরা আল-ক্বারি'আ	১১০
২৬.	সূরা আত-তাকাসুর	১১২
২৭.	সূরা আল-'আসর	১১৪
২৮.	সূরা আল-হুমাযাহ	১১৭
২৯.	সূরা আল-ফীল	১২০
৩০.	সূরা কুরাইশ	১২৪
৩১.	সূরা আল-মাঊন	১২৭
৩২.	সূরা আল-কাওসার	১২৯
৩৩.	সূরা আল-কাফিরূন	১৩৩
৩৪.	সূরা আন-নাসর	১৩৭
৩৫.	সূরা আল-লাহাব	১৪০
৩৬.	সূরা আল-ইখলাস	১৪৪
৩৭.	সূরা আল-ফালাক্ব	১৪৭
৩৮.	সূরা আন-নাস	১৪৭
※	অনুবাদে আরবি ও উর্দূ শব্দের ব্যবহার	১৫৫

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

ছাত্র জীবন থেকেই কুরআন পাককে বুঝবার কিছু চেষ্টা করেছিলাম। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কয়েকটা তাফসীরের সাহায্যে যেটুকু চেষ্টা করলাম, তাতে তেমন উৎসাহ বোধ করলাম না। উপদেশমূলক কথাগুলো খুব ভাল লাগলেও এ বিরাট কিতাবের সব কথা বুঝবার সাধ্য আমার নেই মনে করেই এ চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে আমি এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতের সাথে চার মাসের জন্য বের হয়ে পড়ি। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা বোধ করলাম। ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে কিছু শেখার সৌভাগ্য হলো। কিন্তু সেখানে কুরআন শেখার ব্যাপারে কোন সহজ পথ পেলাম না। কুরআনকে বুঝবার সুযোগ সেখানে হয়নি।

পথের সন্ধান

১৯৫৪ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের (আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনী খেদমত কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন) সাপ্তাহিক দারসে কুরআন ৪-৫ কিস্তি শুনবার পর মনে হলো যে, কুরআন বুঝা অসম্ভব নয়। তিনি এমন সুন্দর ও সহজভাবে কুরআনকে পেশ করার কায়দা কোথায় পেলেন, তা জানতে চাইলাম। মৃদু হেসে জওয়াব দিলেন, "এটা আমার কোন বাহাদুরী নয়, তাফহীমুল কুরআনের কেরামতী।" এ তাফসীরের নাম ইতঃপূর্বে শুনিনি। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)-এর কয়েকখানা বই ইতঃপূর্বে পড়েছিলাম। এখন তাঁর তাফসীর পড়ার জন্য মন পাগল হয়ে উঠলো।

কিন্তু তখনও এর বাংলা তরজমা ছাপা শুরু হয়নি। তাবলীগ জামায়াতে কয়েক বছর কাজ করার সময় উর্দূতে "হিকায়াতে সাহাবা" বইখানা সবক নিয়ে নিয়ে পড়ায় সামান্য যে পরিমাণ উর্দূ ভাষা শিখতে পেরেছিলাম ঐটুকু সম্বল করেই তাফহীমুল কুরআনের পয়লা খন্ড পড়া শুরু করলাম। তাফহীমুল কুরআনের দীর্ঘ ভূমিকায় কুরআন বুঝবার ব্যাপারে যে সুস্পষ্ট পথ পেলাম, তাতে পরম উৎসাহ বোধ করলাম। সাহস করে দারসে কুরআন দেয়া শুরু করলাম। কুরআন বুঝা ও বুঝানোর কাজ পাশাপাশি চলতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ। সরাসরি কুরআনকে বুঝতে পারার মধ্যে যে কী মজা ও তৃপ্তি, তা ইতঃপূর্বে কখনও এমনভাবে অন্তর দিয়ে অনুভব করিনি।

বিভিন্ন তাফসীর

উর্দূ শেখার ফলে অন্যান্য উর্দূ তাফসীর দেখারও সুযোগ পেলাম। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর বায়ানুল কুরআনও বেশ ভাল লেগেছে। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (র.)-এর মা'আরেফুল ক্বোরআনে এত বিষয় আলোচনা হয়েছে যার ফলে এই একখানা তাফসীর পড়লে অনেক তাফসীর পড়ার কাজ হয়ে যায়। মুফতী সাহেবের তাফসীর সবশেষে রচিত বলে অতীতের অনেক তাফসীরের সারকথা এখানে এক জায়গায়ই পাওয়া যায়। অবশ্য প্রত্যেক তাফসীরেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক ফুলেরই রং এবং গন্ধ আলাদা। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র.)-এর তরজমা ও শায়খুল ইসলাম মাওলানা

www.bjilibrary.com

শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.)-এর হাশিয়াতে অল্প কথায় বেশ মূল্যবান কথা পাই। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর অনূদিত আমপারাও তাফহীমুল কুরআনের মতোই ভাব প্রকাশক অনুবাদ। তিনি শাব্দিক অনুবাদ না করে আয়াতের ভাবটুকু বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এ অনুবাদ থেকেও আমি উপকৃত হয়েছি।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

তাফহীমুল কুরআন যে বৈশিষ্ট্যের দরুন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, তা এ তাফসীরখানা না পড়া পর্যন্ত বুঝে আসতে পারে না। মধু কেমন তা খেয়েই বুঝতে হয়। অন্যের কথায় মধুর স্বাদ ও মিষ্টতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নবুওয়াতের ২৩ বছরে রাসূল (সা.) কালেমা তাইয়্যেবার দাওয়াত থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইকামাতে দ্বীনের যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন, সে কাজটি করাবার জন্যই কুরআন পাক নাযিল হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আল্লাহ পাক প্রয়োজন মত যখন যে হিদায়াত পাঠিয়েছেন, তা-ই গোটা কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই কুরআনকে আসলরূপে দেখতে হলে রাসূল (সা.)-এর ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের সাথে মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তাফহীমুল কুরআন এ কাজটিই করেছে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী আন্দোলন ও কুরআন

কুরআন মজীদকে ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিতে বুঝবার যে সার্থক চেষ্টা তাফহীমুল কুরআনে করা হয়েছে, তা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হতে হলে ইসলামী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিকে জানতে হবে। আল্লাহ মানুষের জন্য যা ভাল মনে করেন, তা সমাজে চালু করা এবং যা মন্দ মনে করেন, তা সমাজ থেকে উৎখাত করাই ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কুরআনের ভাষায় এরই নাম "জিহাদুন ফী সাবীলিল্লাহ" বা আল্লাহর পথে জিহাদ।

কোন আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন চালায়, সে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে তার হাতে সমাজ ও রাষ্ট্র চালাবার ক্ষমতা আসা দরকার। যদ্দিন ক্ষমতা না আসে, তদ্দিন বর্তমান ক্ষমতাসীন শক্তির সাথে সংঘর্ষ ও টক্কর চলতে থাকে। রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতী জীবনের প্রথম ১৩ বছরে এ সংগ্রামেরই বাস্তব চিত্র দেখা যায়। এ তের বছরে যে সব সূরা নাযিল হয়েছে, তা সঠিকভাবে বুঝা-ই যাবে না যদি রাসূল (সা.)-এর ঐ সংগ্রামের ছবি সামনে না থাকে।

আন্দোলন যখন বিজয়ী হয়, তখনই আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়া শুরু হয়। যে ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, তা গড়বার কাজ রাসূল (সা.)-এর মাদীনায় হিজরাত করার পর থেকেই শুরু হয়। দশ বছরে তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কুরআনের আলোকে গড়ে তোলেন। এ দশ বছরে যেসব সূরা নাযিল হয়, তা ভালভাবে বুঝতে হলে রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতের শেষ দশটি বছরের বিচিত্র অবস্থার সাথে মিলিয়েই ঐ সব সূরা পড়তে হবে।

মাক্কী ও মাদানী সূরা

কুরআন শরীফের প্রত্যেক সূরার উপরই 'মাক্কী' বা 'মাদানী' শব্দ লেখা আছে। এর সঠিক অর্থ সবাই জানে না। যে সূরা মাক্কায় নাযিল হয়েছে তা 'মাক্কী' এবং যে সূরা মাদীনায় নাযিল হয়েছে, তা 'মাদানী' সূরা বলে মনে করা হয়। এ ধারণা সঠিক নয়।

www.bjilibrary.com

রাসূল (সা.)-এর উপর যখন পয়লা ওহী নাযিল হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এ ২৩ বছরই হলো তাঁর নবুওয়াতের জীবন। এর মধ্যে ১৩ বছর তিনি মাক্কা শহরকে কেন্দ্র করে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ৫৩ বছর বয়সে তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন এবং জীবনের বাকী ১০ বছর মাদীনাকে কেন্দ্র করেই ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করেন।

আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা.)-এর উপর যে বিরাট দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা এক কথায় "ইসলামকে বিজয়ী করার দায়িত্ব" (সূরা তাওবা ৩৩, ফাতহ ২৮, সাফ ৯ আয়াত দ্রষ্টব্য)। এর অর্থ হলো, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা চালু করা এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, তা উৎখাত করা। এ বিরাট দায়িত্বকে বিভিন্ন নামে প্রকাশ করা হয়। কুরআনের ভাষায় এর নাম 'জিহাদুন ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদ। এ কথাটিকেই বাংলায় বলা যায় ইসলামী আন্দোলন।

যে জিনিস কায়েম বা চালু নেই, তা কায়েম করার চেষ্টাকেই আন্দোলন বলে। যেমন ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু করার জন্য যে চেষ্টা করা হয়, তারই নাম ভাষা আন্দোলন। কোন পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টার নামই হলো স্বাধীনতা আন্দোলন। তেমনি যে দেশে দ্বীন ইসলাম সমাজে ও রাষ্ট্রে চালু নেই, সেখানে এ উদ্দেশ্যে চেষ্টা করাকেই বলে ইসলামী আন্দোলন বা আল্লাহর পথে জিহাদ।

রাসূল (সা.) তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে যে দীর্ঘ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, তার প্রথম ১৩ বছরকে মাক্কী যুগ এবং বাকী ১০ বছরকে মাদানী যুগ বলা হয়। প্রথম ১৩ বছর যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, সে সবই মাক্কী সূরা এবং পরবর্তী ১০ বছরের সূরাগুলো মাদানী সূরা। আন্দোলনের এ দুটো যুগের ভিত্তিতেই মাক্কী বা মাদানী নামে সূরাগুলো পরিচিত। সূরা নাসর বিদায় হজ্জের সময় মাক্কার কাছে মিনায় নাযিল হয়। অথচ এই সূরাটিকে মাদানী বলা হয়। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোন্ জায়গায় কোন সূরা নাযিল হয়েছে, সে হিসাবে মাক্কী বা মাদানী নাম দেয়া হয়নি। বরং কোন যুগে নাযিল হয়েছে, সে হিসাবেই সূরার পরিচয় দেয়া হয়েছে।

যে কোন আন্দোলনেরই দুটো যুগ থাকে। আন্দোলনের শুরু থেকে এর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সংগ্রাম যুগ বলা যায়। আর সাফল্য শুরু হলেই বিজয় যুগের সূচনা হয়। এ হিসাবে রাসূল (সা.)-এর প্রথম ১৩ বছরকে সংগ্রাম যুগ ও হিজরাতের পরে ১০ বছরকে বিজয় যুগ বলা যায়। প্রথম ১৩ বছরে তিনি ইসলামী সমাজ কায়েমের যোগ্য লোক তৈরি করেন বলে সে সময়টাকে ব্যক্তি গঠনের যুগ আর পরের দশ বছরকে সমাজ গঠনের যুগও বলা চলে। এ বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল-আন'আমের ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এভাবেই বিভিন্ন নামে রাসূল (সা.)-এর ২৩ বছরের ইসলামী আন্দোলনকে চেনা যায়।

মাক্কী যুগ মানে সংগ্রাম যুগ ও ব্যক্তি গঠনের যুগ। মাদানী যুগ হলো বিজয় যুগ ও সমাজ গঠনের যুগ। সূরাগুলোকে মাক্কী বা মাদানী নামে পরিচিত করার বিরাট উদ্দেশ্য আছে। কোন সূরা মাক্কী না মাদানী, তা না জানলে এর অর্থ ও মর্ম পরিষ্কার বুঝা সম্ভব নয়। তাই কুরআনকে সঠিক ভাবে বুঝতে হলে কোন্ যুগে কোন্ সূরা নাযিল হয়েছে, সে কথা জানা খুবই জরুরী। অবশ্য মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে কতক সূরা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বেশীর ভাগ মুফাসসিরের মতে

www.bjilibrary.com

৮৬টি সূরা মাক্কী এবং বাকী ২৮টি মাদানী। মাওলানা মওদূদী (র.) যেসব সূরাকে মাক্কী বা মাদানী বলে উল্লেখ করেছেন, তাতে ঐ মতের সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সূরার ভূমিকায় এ বিষয়ে যে গবেষণা পেশ করেছেন, তাতে প্রমাণ হয় যে, মাত্র ২৫টি সূরা মাদানী, আর ৮৯টি মাক্কী।

মোট ১৭টি সূরা সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। এর মধ্যে ১৪টিই আমপারাতে আছে। বিশেষ করে সূরা বাইয়্যিনাহ, যিলযাল, আদিয়াত, মাউন, ফালাক ও নাস-এ ৬টি সূরা সম্পর্কে ব্যাপক মত-পার্থক্য রয়েছে।

এসব মতভেদের মূল কারণ হলো সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন রেওয়াইয়াত। একই সূরা সম্পর্কে কয়েক রকম বিবরণ পাওয়া যায়। কোন একটি সূরার বক্তব্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় পেশ করা হয়েছে। ঐ সময় যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা ঐ সূরাটি আগে শুনেননি, তাদের ধারণা হয়েছে যে, ঐ সময় এবং ঐ উপলক্ষেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। যেমন সূরা ইখলাস। এতে আল্লাহ সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। যখনই আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কেউ রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছে, তখনই তিনি সূরা ইখলাস শুনিয়ে দিয়েছেন। এভাবে মাক্কা ও মাদীনায় একই সূরা বিভিন্ন সময় পেশ করা হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব আল-ইতকানে উল্লেখ করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন ঘটনার সাথে কোন সূরার মিল দেখতে পেতেন, তখন ঐ ঘটনাকে ঐ সূরাটি নাযিল হবার উপলক্ষ বলে উল্লেখ করতেন। মাক্কী ও মাদানী যুগের বিভিন্ন ঘটনার সাথে কোন এক সূরার মিল থাকার ফলে সূরাটি নাযিল হবার সময় সম্পর্কে একাধিক মত দেখা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমপারার বেশ ক'টি সূরার পরিচিতিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনে সূরা "আদ দাহার"-এর ভূমিকায় মুফাসসিরগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোন কোন সূরার প্রথম অংশ মাক্কী যুগে এবং বাকী অংশ মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে। কিন্তু সে সূরাটি মাক্কী বলেই চিহ্নিত হয়েছে। যেমন সূরা মুয্যাম্মিল। আবার কোন বড় সূরাকে মাক্কী বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এর কোন অংশ মাদানী যুগে নাযিল হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বিষয়ে মিল থাকার দরুন ঐ অংশটিকে সে সূরায়ই শামিল রাখা হয়েছে। মোটকথা, মাক্কী ও মাদানী হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি ছোট সূরা নিয়ে মতভেদ হলেও কুরআনের বড় বড় সূরাগুলোসহ প্রায় একশ'টি সূরা সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই।

কুরআন বুঝবার আসল মজা

তাফহীমুল কুরআন এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করেছে যে, রাসূল (সা.)-এর ঐ আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ যুগে এবং কি পরিবেশে নাযিল হয়েছে, তা উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হিদায়াত দেয়া হয়েছে। এভাবে আলোচনার ফলে পাঠক রাসূল (সা.)-এর আন্দোলনকে এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকাকে এমন সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝতে পারে, যার ফলে কুরআন বুঝার আসল মজা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে। তাফহীমুল কুরআন ঈমানদার পাঠককে

www.bjilibrary.com

রাসূল (সা.)-এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাযির করে। দূর থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে যাতে পাঠক নিজেকে হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় দেখতে পায়, সে ব্যবস্থাই এখানে করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ও ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, তা এ তাফসীরে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার উপায় নেই। এ তাফসীর পাঠককে ঘরে বসে শুধু পড়ার মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না, তাকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে সে বাস করে, সেখানে রাসূলের সেই সংগ্রামী আন্দোলন না চালালে কুরআন বুঝা অর্থহীন বলে তার মনে হয়। তাফহীমুল কুরআন কোন নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতার লেখা এ তাফসীর পাঠককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাকিদ দেয়। এটাই এ তাফসীরের কৃতিত্ব।

বাংলা ভাষায় তাফহীমুল কুরআন

উর্দূতে ৬ খণ্ডে তাফহীমুল কুরআন সমাপ্ত। ১৯৪২ সালে এর রচনা শুরু হয়ে '৭২ সালে শেষ হয়। মোট ৩০ বছরে ৩০ পারা কুরআনের এ তাফসীর লেখা হয়। বাংলা ভাষায় ১৯ খণ্ডে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জনাব মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এর অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান উচ্চ শিক্ষিত মহলের জন্য অবশ্যই উপযোগী, কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরাট অংশ অর্ধ শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত। তারা সহজ ভাষায় এর অনুবাদের অভাব বোধ করছিলেন। কিন্তু সহজ করে লেখার কাজটি যে খুবই কঠিন, সে কথা লেখকরাই শুধু বুঝতে পারেন। কবির ভাষায়,

"সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে
সহজ করে যায় কি লেখা সহজে?"

আমপারার তরজমা সবচেয়ে বেশী জরুরী মনে করে পয়লা এরই তরজমা পেশ করা হলো। আমপারা প্রকাশিত হবার পর পাঠকদের কাছ থেকে পরামর্শ আশা করব, যাতে কুরআন পাকের তরজমায় তাদের মতামত থেকে আমি উপকৃত হতে পারি। সহজ ভাষায় আল্লাহর বাণীকে পেশ করার এ প্রচেষ্টাকে তখনই আমি সার্থক মনে করব, যখন আমপারার এ তরজমা পড়ার পর অল্প শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকারা গোটা কুরআনকে বুঝবার জন্যে অধীর আগ্রহ প্রকাশ করবে। আমি বড় আশা নিয়ে এ কাজে হাত দিয়েছি। সব মানুষেরই মহান আল্লাহর কালাম বুঝবার অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। কুরআন পাক শুধু আলেম সমাজের জন্য নাযিল হয়নি। আরবি ভাষা জানলে কুরআন বুঝে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তা আরবি না জানলে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আরবি ভাষা না জানলেও কুরআন বুঝা সম্ভব। কুরআনের মর্ম সাধারণ লোকের পক্ষেও বুঝা অসম্ভব নয়। আমার গভীর বিশ্বাস জন্মেছে যে, কুরআনের আলো ঘরে ঘরে পৌছানো কঠিন নয়।

তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ

তরজমায় হাত দিয়ে মনে হলো যে, বিপুলসংখ্যক মানুষের পক্ষে তাফহীমুল কুরআনের মতো সংক্ষিপ্ত তাফসীরও পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তাহলে তারা কিভাবে কুরআন বুঝবার সৌভাগ্য লাভ করবে? তাফহীমুল কুরআনের লেখক নিজেই এর ব্যবস্থা করে গেছেন। "তরজমায়ে কুরআন

www.bjilibrary.com

মজীদ” নামে তিনি আর একখানা কিতাব রচনা করে গেছেন। এতে এক পৃষ্ঠায় কুরআনের আয়াত ও পাশেই তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ দেয়া হয়েছে। তরজমার নীচে সংক্ষিপ্ত টীকায় ঐ সব কথা বুঝানো হয়েছে, যা শুধু তরজমা থেকে বুঝা যায় না। আমি এ কিতাবখানা অনুবাদ করার মাধ্যমে আমার উপরোক্ত বিরাট আশা পূরণ করতে চাই। কিন্তু তাফহীমুল কুরআনে সূরাগুলোর ভূমিকা হিসাবে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা “তরজমায়ে কুরআন মজীদে” নেই। আমার ধারণা যে, সূরাগুলোর ঐসব ভূমিকা বিস্তারিত তাফসীরেরই সার-সংক্ষেপ। সূরার ভূমিকা ও তরজমা মিলিয়ে বক্তব্য মোটামুটি পরিষ্কার হয়। বিস্তারিত ব্যাখ্যার কাজ এ দ্বারা না হলেও বুঝবার কাজটুকু অবশ্যই হয়। তাই সূরার ভূমিকাও এতে শামিল করার দরকার মনে করেছি।

সূরার বক্তব্য ঃ আলোচনার ধারা

তাফহীমুল কুরআনে সূরাগুলোর সব ভূমিকা একই ধরনে লেখা হয়নি। কোথাও সূরার আলোচ্য বিষয় এমনভাবে একটানা লেখা হয়েছে যে, আয়াতের সাথে মিলিয়ে বুঝা সহজ হয় না। আবার কোন কোন সূরার ভূমিকায় আলোচ্য বিষয়কে বিভিন্ন পয়েন্টে ভাগ করে এবং আয়াতের নম্বর উল্লেখ করে এমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে যে, তাফসীর না পড়েও শুধু অনুবাদের সাহায্যে মূল কথা সহজে বুঝা যায়। আমি এ দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকেই পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বেশী উপকারী ও সহজ মনে করেছি। গোটা সূরাকে পয়েন্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এক এক অংশে যে কয়টি আয়াতের মর্মকথা এক সাথে আলোচনা করা সহজ হয়, সে কয়টি আয়াতের নম্বর উল্লেখ করে ঐ সব আয়াতের বক্তব্য পেশ করেছি। ‘আলোচনার ধারা’ শিরোনামে এ পদ্ধতিতে যা লিখেছি, তা তাফসীরের সার-সংক্ষেপ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

সূরার ভূমিকায় “আলোচনার ধারা” নাম দিয়ে সূরাকে পাঠক-পাঠিকার নিকট পরিচিত করতে গিয়ে তাফহীমুল কুরআনে দেয়া সূরার ভূমিকার হুবহু অনুবাদ করা সঠিক মনে হয়নি। অর্থাৎ এ আলোচনা তাফহীমের সূরার শুরুতে যে ভূমিকা আছে এর অনুবাদ নয়। কিন্তু যা লিখেছি, তা অবশ্যই ঐসব ভূমিকার ভিত্তিতেই রচিত। কোথাও ভূমিকার কথাগুলো যথেষ্ট মনে না করে তাফহীমুল কুরআনের তাফসীর থেকে কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা এনে জুড়ে দিয়েছি। আবার কোথাও কোন কথাকে সহজ করার জন্য আমার নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কিছু কথা লিখে দিয়েছি। কিন্তু আমার কোন কথাই তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যার বিপরীত বা এর চেয়ে ভিন্ন ধরনের কিছু নয়। আমি তাফহীমুল কুরআনের বক্তব্যকেই পেশ করতে চেয়েছি। তাফহীমুল কুরআনের সম্পূর্ণ তাফসীর যারা পড়বার সুযোগ ও সময় পান না, তাদের কাছে এ মহান তাফসীরের খোলাসা (সার-সংক্ষেপ) কি করে পেশ করা যায়, এটাই আমার বড় ধান্দা। সংক্ষিপ্ত যে টীকা “তরজমায়ে কুরআন মজীদে” দেয়া হয়েছে, তা এত সংক্ষিপ্ত যে, তা দ্বারা তাফসীরের সার কথা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আলোচনার ধারাতেই সে সার কথা দেবার চেষ্টা করেছি।

এ উদ্দেশ্য সফল করার প্রয়োজনেই সূরার ভূমিকাকে মাধ্যম বানাতে বাধ্য হয়েছি। তাফহীমুল কুরআনে সূরার যে ভূমিকা দেয়া আছে শুধু এর অনুবাদ দিয়ে সে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। অবশ্য ঐ সব ভূমিকাই আমার আলোচনার মূল ভিত্তি।

www.bjilibrary.com

বিশেষ শিক্ষা

কোন কোন সূরার ভূমিকায় "আলোচনার ধারা"র শেষে "বিশেষ শিক্ষা" শিরোনামে যা লেখা হয়েছে, তা অনুবাদকের রচনা। প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত বইটির যে সব পৃষ্ঠার বেশী অংশ খালি রয়ে গেছে, সেখানেই এ "বিশেষ শিক্ষা" যোগ করে দেয়া হয়েছে।

মূল কিতাব ও অনুবাদে কিছু পার্থক্য

অনুবাদ অর্থ শব্দের হুবহু তরজমা নয়। মূল লেখায় যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, ঐ ভাবটি অন্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলার নামই অনুবাদ। সে চেষ্টাই আমি করেছি। তাফহীমুল কুরআনেও আয়াত সমূহের উর্দূ তরজমায় কুরআনের শাব্দিক অর্থের চেয়ে মূল ভাবের দিকেই বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। আমিও উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে এ নীতিরই অনুসরণ করেছি।

কুরআনের আয়াত সমূহের যে তরজমা তাফহীমুল কুরআনে আছে, তাতে আয়াতের নম্বর উল্লেখ করা নেই। কারণ তাফহীমে কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ করা হয়নি। কুরআনের আসল কথার অনুবাদ করতে গিয়ে কোথাও দু'তিন আয়াতের অর্থ একই বাক্যে লেখা হয়েছে। তাই সেখানে অনুবাদে আয়াতের নম্বর দেয়া হয়নি। কিন্তু নম্বর ছাড়া আয়াতের সাথে মিলিয়ে তরজমা পড়া যায় না বলে পাঠকের যে অসুবিধা হয়, তা বিবেচনা করে আমি অনুবাদেও আয়াতের নম্বর দিয়েছি। কিন্তু একাধিক আয়াতের অনুবাদের কথাকে যেখানে আলাদা করা যায়নি, সেখানে এক সাথেই একাধিক আয়াতের নম্বর দেয়া হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী (র.) তাফহীমুল কুরআনে আয়াতগুলোর যে উর্দূ তরজমা করেছেন, বাংলায় তার ভাবের অনুবাদ করতে গিয়ে নিম্নরূপ ব্যতিক্রম হয়েছে ঃ

(১) কোথাও কথা পরিষ্কার করার জন্য বন্ধনীর মধ্যে এমন কথা যোগ করা হয়েছে, যা তাফহীমে নেই।

(২) কোন কোন উর্দূ শব্দের সহজ বাংলা না পেয়ে মূল আরবির সাথে মিল রেখে এমন বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাফহীমের ঐ উর্দূ শব্দের অনুবাদ নয়।

(৩) উর্দূ অনুবাদে যে শব্দ মূল আরবি থেকে অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে, তার অনুবাদ বন্ধনীর ভেতর রাখা হয়েছে, যাতে মূল আরবির অতিরিক্ত কথাটুকু চিহ্নিত করা যায়। এতে মূল আরবির সাথে অনুবাদের মিল তালাশ করা পাঠকদের জন্য সহজ হবে। অনুবাদে বন্ধনীর কথাগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠক বন্ধনীর কথাগুলো সহ একটানা পড়ে যেতে পারে।

(৪) উর্দূ অনুবাদের সাথে বাংলা অনুবাদে আরো কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু তাতে ভাবের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও হয়নি। যেমন ঃ

ক) সূরা আত্ তীনের শুরুতে উর্দূ তরজমায় 'কসম' কথাটি একবার মাত্র লেখা হয়েছে। কুরআনে চার বার কসম বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলায় তিনবার লেখা হয়েছে।

খ) উর্দূতে বন্ধনী দিয়ে যত জায়গায় কুরআনের শব্দের অতিরিক্ত কথা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে কোন কোন জায়গায় বাংলা অনুবাদে ঐ অতিরিক্ত কথা লেখা প্রয়োজন মনে হয়নি।

(৫) তাফহীম থেকে শুধু কুরআনের আয়াতের অনুবাদই আমি করেছি। আর তরজমায়ে

www.bjilibrary.com

কুরআন মজীদের টীকাগুলোর অনুবাদ এতে জুড়ে দিয়েছি। সূরার ভূমিকায় "আলোচনার ধারা" নামে যে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা মূলত তাফহীমুল কুরআনের তাফসীরেরই সার-সংক্ষেপ। এ অংশটুকু অনূদিত নয়, সম্পাদিত। অবশ্য এতে মূল লেখকের কথাকে আরও সহজবোধ্য করার জন্য দু' এক কথা আমার পক্ষ থেকেও শামিল করে দিয়েছি।

সূরা ফাতিহা সম্পর্কে

আমপারার এ তাফসীরে সূরা ফাতিহাও শামিল করা হলো। যদিও এ সূরাটি আমপারার অংশ নয়, তবু এর গুরুত্বের কারণে শুরুতেই এর আলোচনা করা দরকার মনে করেছি। আমপারার তাফসীরের বেলায় তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ পেশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সূরা ফাতিহার বেলায় এর উল্টো ব্যাপার ঘটেছে। তাফহীমে সূরা ফাতিহার তাফসীর খুবই সংক্ষেপ। আমি এ সূরাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যা তাফহীমে নেই।

সূরা ফাতিহা-ই হলো কুরআনের সার। তাই এ সূরাটি সম্পর্কে মনের সব আবেগই উজাড় করে পেশ করা কর্তব্য মনে করেছি। আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার সঠিক সম্পর্ক এ সূরার মাধ্যমে কায়েম হলেই আশা করা যায় যে, কুরআন বুঝা সহজ হবে।

টীকা সম্পর্কে

তরজমায়ে কুরআন মজীদে যে ফুটনোট বা টীকা লেখা আছে, এর অনুবাদেও মূল কিতাবের টীকার নম্বর অনুযায়ীই সাজানো হয়েছে। কিন্তু কোথাও আমি অতিরিক্ত টীকা দেয়া দরকার মনে করেছি। আমার দেয়া টীকার সংকেত সংখ্যা অংকে না দিয়ে (❖☼) চিহ্ন দ্বারা দেয়া হয়েছে, যাতে মূল কিতাবের টীকা থেকে এগুলো আলাদাভাবে চেনা যায়।

আমি অতিরিক্ত টীকার যে ব্যাখ্যা লিখেছি, তা তাফহীমুল কুরআনের তাফসীর থেকেই নিয়েছি। যেখানে এসব টীকার অভাবে আয়াতের অর্থ বুঝা যায় না, সেখানেই অতিরিক্ত টীকা দিয়েছি।

তাফহীমুল কুরআন উর্দূ ভাষায় লিখিত এবং অতি উন্নতমানের সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। প্রত্যেক ভাষারই বিশেষ পরিভাষা ও মুহাবারা (বাক-পদ্ধতি) থাকে। এসবের শাব্দিক তরজমা যেখানে মানানসই ও শোভন হবে না বলে মনে করেছি, সেখানে বাংলা ভাষায় প্রচলিত ভাবার্থ দিয়েছি।

উপরিউক্ত কয়টি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এ অনুবাদ চিন্তা ও ভাবের দিক দিয়ে তাফহীমুল কুরআনেরই বিশ্বস্ত ভাষান্তর বলে আমার ধারণা। বাংলাভাষী মুসলিম জনগণের কাছে আল্লাহর মহান বাণী পৌঁছাবার যে বিরাট আশা নিয়ে এ কাজে হাত দেবার সাহস করেছি, তাতে সত্যিকার সফলতা মহান মনিবের কাছেই কামনা করি। এ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ও সুপরামর্শের আবেদন জানাই।

এ সংক্ষিপ্ত তাফসীর পড়ার নিয়ম

প্রত্যেক সূরার ভূমিকায় সূরার নাম, নাযিলের সময়, আলোচ্য বিষয় ও নাযিলের পরিবেশ পর্যন্ত পড়ার পর সূরার তরজমার সাথে "আলোচনার ধারা" মিলিয়ে পড়তে হবে। আলোচনার

www.bjilibrary.com

ধারায় সূরাটিকে কয়েকটি পয়েন্টে ভাগ করে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এর এক একটি পয়েন্টে যে কয়টি আয়াতের সারকথা লেখা আছে, সে আয়াতগুলোর তরজমা পড়ার পর আলোচনার ধারায় লিখিত ব্যাখ্যা পড়লে বুঝতে সহজ হবে। তরজমার সাথে আলোচনা মিলিয়ে না পড়লে সূরার আসল কথা পরিষ্কার হবে না।

ট্রেনসলিটারেশন (এক ভাষার অক্ষর অন্য ভাষায় প্রকাশ করা)

আরবিতে এমন কতক অক্ষর আছে, যার উচ্চারণ প্রকাশ করার জন্য বাংলায় কোন অক্ষর নেই। যেমন আরবিতে ج ذ ز ظ এর চারটি অক্ষরকে বাংলায় 'জ' বা 'য' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অথচ 'জাল' ও 'যা' বলতে এ দুটো অক্ষরের উচ্চারণ ج এর মতই করা হয়। তাহলে বাকী তিনটি আরবি অক্ষরের উচ্চারণ বাংলায় কিভাবে লেখা হবে? আরবিতে ث س ص এ তিনটি অক্ষরের উচ্চারণ বাংলায় একমাত্র 'স' দিয়েই করতে হয়।

আরবি	বাংলা	আরবি	বাংলা
ج	জ	الفجر	আল-ফাজর
ذ	য	عذاب	আযাব
ز	য	الزلزال	আয-যিলযাল
ظ	য	ظلم، ظالم	যুলুম, যালিম
ث	স	الكوثر	আল-কাওসার
س	স	الناس	আন-নাস
ص	স	العصر	আল-আসর
ض	য	وضوء	ওযু

আরবিতে স্বরবর্ণ মাত্র তিনটি আছে। আলিফ, ওয়াও এবং ইয়া। বাংলায় এ তিনটির উচ্চারণ হবে, আ, ও, ই। বাংলায় এসবের অর্ধেক উচ্চারণও আছে- যেমন অ, উ, এ। কিন্তু আরবিতে অর্ধ-উচ্চারণ নেই। আরবি ও বাংলায় উচ্চারণের এ পার্থক্যের কারণে বহু আরবি শব্দের বাংলা উচ্চারণ অশুদ্ধ হয়ে যায়। এ জাতীয় কিছু শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি-

আরবি	বাংলা ভুল উচ্চারণ	সঠিক উচ্চারণ
مكة	মক্কা	মাক্কা
مدينة	মদীনা	মাদীনা
قيامة	কেয়ামত	কিয়ামাত
اخرة	আখেরাত	আখিরাত
توحيد	তওহিদ	তাওহীদ
رسالة	রেসালাত	রিসালাত
قرآن	কোরআন	কুরআন

আমার লেখায় আরবি উচ্চারণ অনুযায়ীই বাংলায় লিখেছি।

এসব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরিভাষার উচ্চারণ কুরআনে যেমন আছে, বাংলায়ও সে রকম হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। বাংলায় প্রচলিত অশুদ্ধ বানানে অভ্যস্ত হবার দরুন প্রথম প্রথম

www.bjilibrary.com

কিছু অসুবিধা বোধ করলেও শুদ্ধ উচ্চারণের আকর্ষণের ফলে পাঠকগণ এ বানান পছন্দ করবেন বলেই আশা করি।

আমপারার কতক শব্দের অর্থ

আমপারা এবং কুরআন মজীদের বহু সূরায় কয়েকটি শব্দ এমন আছে, যার বিভিন্ন রকম অর্থ করা হয়ে থাকে। এসব আরবি শব্দের বেশীর ভাগই উর্দূতেও ব্যবহার হয়।

তাই যারা বাংলায় অনুবাদ করেছেন, তাঁরা বিভিন্নভাবে অর্থ করেছেন। আমি ঐ সব শব্দের যে ভাবে অর্থ করেছি, তার যুক্তি বুঝাবার জন্য এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি।

(১) يوم الدين এখানে দ্বীন মানে جزاء বাংলায় প্রতিদানই এর সঠিক অনুবাদ। অর্থাৎ বদলা দেবার দিন বা বিচার দিবস। সহজ বাংলায় প্রতিদানের জায়গায় আমি লিখেছি বদলা। جزاء অর্থও বদলা।

(২) ما ادراك আদরাকা মানে তোমাকে জানাল বা সতর্ক করল। মা আদরাকা অর্থ কিসে তোমাকে জানাল। তাফহীমুল কুরআনে অনুবাদ করা হয়েছে- তুমি কী জান? কী এর স্থলে কি লিখলে অর্থ সঠিক হয় না। 'তুমি কী জান' মানে What do you know? আর 'তুমি কি জান' মানে Do you know? তাফহীমে What do you know অর্থ করা হয়েছে।

(৩) كذّب শব্দটির অর্থ বিভিন্ন রকম, করা হয়েছে, উর্দূতে ঝুঠলায়া লেখা হয়েছে। এর অর্থ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, মিথ্যা বলে প্রকাশ করেছে, মিথ্যা মনে করেছে ইত্যাদি অর্থ বিভিন্ন অনুবাদে পাওয়া যায়। আমি শেষ পর্যন্ত 'মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে' অর্থই পূর্ণ অর্থ প্রকাশক বলে মনে করেছি।

এ শব্দটির আর একটি অর্থ করা হয় 'মানতে অস্বীকার করেছে'। আমি স্থান বিশেষে এ অর্থও লিখেছি।

(৪) اية। এর অর্থ নিদর্শন, হুকুম, কুরআনের বাক্য। অবস্থা ভেদে এসব অর্থই সঠিক।

(৫) اجر। এর অর্থ পারিশ্রমিক, সাওয়াব, বদলা বা প্রতিদান। পুরস্কার অর্থেও ব্যবহার হয়। কুরআনে মোহরানার অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। جزاء অর্থ ভাল ও মন্দ উভয় রকম প্রতিদানই বুঝায়, কিন্তু اجر। কেবল ভাল প্রতিদান বা পুরস্কারকেই বুঝায়।

অনুবাদে আরবি ও উর্দূ শব্দের ব্যবহার

আমপারার অনুবাদে বহু আরবি ও উর্দূ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এসবের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ পরিশিষ্ট হিসাবে বই-এর শেষ দিকে দেয়া হয়েছে। আশা করি, এ দ্বারা আরবি ভাষা সম্পর্কে যারা কিছু জ্ঞান রাখেন, তারাও উপকৃত হবেন। আল্লাহ পাক লেখক, অনুবাদক, পাঠক ও পাঠিকা সবাইকে কুরআনের বরকত দান করুন।

গোলাম আযম
যিলক্বাদ, ১৪০২ হিজরী
আগষ্ট, ১৯৮২ ঈসায়ী
ভাদ্র, ১৩৮৯ সাল।

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ
১১৯, কাজী অফিস লেন
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে

অনুবাদ করার সময় অল্প-শিক্ষিত সাধারণ পাঠক-পাঠিকার বুঝবার উপযোগী সহজ বাংলা শব্দ তালাশ করতে গিয়ে এবং কঠিন শব্দ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করার ফলে, মাঝে মাঝে এমন শব্দও ব্যবহার করতে হয়েছে, যা আমার কাছেও পুরোপুরি পছন্দসই মনে হয়নি। তাছাড়া উর্দূ অনুবাদ থেকে বাংলায় তরজমা করতে গিয়ে সব জায়গায় মূল আরবির দিকে খেয়াল রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে কোথাও কোথাও বহুবচনের জায়গায় একবচন লেখা হয়ে গিয়েছিল। তাফহীমুল কুরআনে যে উর্দূ তরজমা করা হয়েছে এর ভাব ঠিক রেখেই বাংলায় সেভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে স্বাভাবিকভাবেই ভাষাগত কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর কিছুসংখ্যক পাঠকের দৃষ্টিতে এ জাতীয় ভুল ও বেমিল ধরা পড়েছে। তারা কেউ মৌখিকভাবে এবং অনেকে লিখিতভাবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি যারা বিদ্বেষাত্মক ভাষায় এবং জনগণকে ক্ষেপাবার উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন, তাদের সমালোচনা থেকেও আমি উপকৃত হয়েছি। আমি এসব ধরনের পাঠকের প্রতিই আন্তরিক শুকরিয়া জানাই।

এসব ভুল যদিও এমন পর্যায়ের ছিল না যার ফলে কুরআনের অর্থ বিকৃত হয়, তবু একটি সংশোধনপত্র ছাপিয়ে অবিকৃত ও অবিলিকৃত কপিতে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যেগুলো বিলি ও বিক্রি হয়েছে, সে সবের জন্যও অতিরিক্ত সংশোধনপত্র ছাপানো হয়েছে এবং যথাস্থানে পৌঁছাবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণকে ঐ সমস্ত ভুল থেকে সংশোধন করার যে চেষ্টা করা হয়েছে, তারপরও যদি কারো চোখে কোন ভুল ধরা পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবার জন্য আবেদন জানাই। আল্লাহ্ পাক অনিচ্ছাকৃত ভুল মাফ করেন। এটাই সান্ত্বনার বিষয়। তবু কুরআনের অনুবাদে যাতে কোন ভুল না থাকে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখার প্রয়োজনেই দ্বিতীয় সংস্করণের বেলায় আরও বেশী সাবধানতা অবলম্বন করেছি।

ভাষা বেশী সহজ হবার অভিযোগ

কোন কোন পাঠক জানিয়েছেন যে আমার অনুবাদের ভাষা খুব বেশী সহজ ও সাধারণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের মতে এতটা সহজ ভাষা না হলেই ভাল হতো। যারা কঠোর ভাষায়

www.bjilibrary.com

সমালোচনা করেছেন, তারা মন্তব্য করেছেন যে এতে নাকি কুরআনের "সাহিত্যিক মানের অবমূল্যায়ন" করা হয়েছে। এ অভিযোগ পেয়ে আমি আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানাই। সহজ ভাষায় লেখার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা বোধ হয় তিনি সফল করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

সহজ ও সাধারণের উপযোগী ভাষায় কুরআন পাকের ভাব প্রকাশ করার যে উদ্দেশ্যে আমি এ অনুবাদে হাত দিয়েছি, তার সাথে ঐসব সম্মানিত অভিযোগকারীদের মূল্যবান মতের মিল না হওয়ায় আমি বিস্মিত হইনি। সাহিত্যিক মানের দোহাই দিয়ে কঠিন বাংলাভাষায় কৃত কুরআনের অনুবাদ নিয়ে যারা তৃপ্তি ও গৌরব বোধ করেন, তাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য আমি অনুবাদ করিনি। সাহিত্য সৃষ্টিও আমার লক্ষ্য নয়। যারা কোনরকমে বাংলাভাষা পড়তে পারেন, সেই সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছাবার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ পাক এ গুনাহগারের ঐ উদ্দেশ্য পূরণ করুন- এটাই আন্তরিক বাসনা।

আমি কুরআনের অনুবাদক নই

আমি স্পষ্ট ভাষায় সবার খেদমতে আরয করতে চাই যে, আমাকে কেউ কুরআনের অনুবাদক মনে করবেন না। আমি তাফহীমুল কুরআন থেকে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। আমি একটি উর্দূ অনুবাদের অনুবাদক মাত্র। বাংলা ভাষায় কুরআন পাকের যতগুলো অনুবাদ পাওয়া যায়, তাদের ভাব ও ভাষায় এত পার্থক্য লক্ষ্য করেছি যে, কুরআনের সরাসরি তরজমা করার কোন সাহসই আমি পাই না। এ কারণেই কোন ভাষার কোন অনুবাদই কুরআনের মর্যাদা পেতে পারে না। কুরআন শুধু আরবি ভাষায় রচিত। এর কোন অনুবাদই কুরআন নয়, কুরআনের অনুবাদ মাত্র।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফাতিহা

নাম ঃ ফাতিহা অর্থ যা দিয়ে খোলা হয় বা শুরু করা হয়। কুরআন শরীফের পয়লা সূরা হিসাবে এর এ নাম রাখা হয়েছে। এ সূরা দিয়েই কুরআন শুরু করা হয়েছে। সাধারণত সূরার কোন একটি শব্দের ভিত্তিতে প্রায় সব সূরারই নামকরণ করা হয়েছে। একমাত্র দুটো সূরার নাম এমন শব্দে রাখা হয়েছে, যা ঐ সূরায় নেই। একটি সূরা ফাতিহা আর একটি সূরা ইখলাস।

নাযিলের সময় ঃ নবুওয়াতের প্রথম দিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়। পরিপূর্ণ সূরা হিসাবে এ সূরাই প্রথম নাযিল হয়েছে। এর আগে সূরা আলাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্সির-এ তিনটি সূরার পয়লা কয়েকটি আয়াত নাযিল হলেও সূরা ফাতিহার পূর্বে আর কোন পূর্ণ সূরা নাযিল হয়নি।

আলোচ্য বিষয় ঃ এমন এক দোয়া, যা কুরআন পড়া শুরু করার সময় পড়া উচিত।

নাযিলের পরিবেশ ঃ (এ লেখাটুকু মূল লেখকের নয়—অনুবাদকের)

রাসূল (সা.) যে সমাজে পয়দা হয়েছিলেন, সেখানে যত মন্দ রীতি-নীতি ও কাজ-কর্ম চালু ছিল, তা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই ছোট বয়স থেকেই অন্য সবার চেয়ে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও চাল-চলন আলাদা ধরনের ছিল। আল্লাহ পাক যেহেতু সব মানুষকেই কোন্টা ভাল ও কোন্টা মন্দ, তা মোটামুটি বুঝবার তাওফীক দিয়েছেন, সেহেতু মাক্কাবাসীরা যত খারাপ কাজই করুক রাসূল (সা.) এর চরিত্রের প্রশংসা করতো।

যে বয়সে মানুষ ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, সে বয়স থেকেই সমাজে যা কিছু খারাপ দেখতেন, তা তিনি অপছন্দ করতেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মন সমস্ত মন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই তরুণ বয়সেই তিনি সম-বয়সীদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল'১ নামক একটি সমিতিতে শরীক হয়ে সমাজ-সেবার কাজ শুরু করেন। বিধবা ও ইয়াতীমকে সাহায্য করা, ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া, যুলুম করা থেকে ফিরিয়ে রাখা, আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা এবং এ জাতীয় অনেক কাজ তিনি ঐ সমিতির মাধ্যমে করতে থাকলেন। এসব কাজের ফলে সবাই রাসূল (সা.)-কে 'আস-সাদিক' ও 'আল-আমীন' অর্থাৎ একমাত্র সত্যবাদী ও একমাত্র আমানতদার বলে প্রশংসা করতে লাগলো।

সমাজকে ভাল করা এবং সমাজের মন্দ দূর করার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি কথা বুঝতে পারলেন ঃ

১। 'হিলফুল ফুযুল' সমিতির মাধ্যমে যুবক বয়সেই মুহাম্মাদ (সা.)-এর সেবার মনোভাব বিকাশ লাভ করে। তাই রাসূল (সা.)-এর জীবনে এ সমিতির গুরুত্ব যথেষ্ট। এ সমিতির ইতিহাস ও এর নামকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। এ সমিতিটি রাসূল (সা.) গঠন করেননি। সমিতিটি আগেই গঠিত হয়েছিল। এতে রাসূল (সা.) যোগদান করার পর এর গঠনমূলক কাজের প্রকাশ হয় এবং সমিতির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ফাদল ইবনে ফুদালা, ফাদল ইবনে বিদায়াহ, ফুদাইল ইবনে হারিস, ফুদাইল ইবনে শারায়াহ, ফাদল ইবনে কুযায়াহ এ সমিতি গঠন করেন। তাদের প্রত্যেকের নামই ফাদল বা ফুদাইল ছিল। এর মূল শব্দ فضل এবং এর বহুবচন فضول (ফুদুল)। এরা সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আরবিতে চুক্তিকে حلف (হিলফ) বলা হয়। সুতরাং 'হিলফুল ফুদুল' মানে হলো ফাদল নামধারী কয়েকজনের চুক্তি।

www.bjilibrary.com

(১) সমাজের অসৎ নেতা, কর্তা, ধনী ও প্রভাবশালীদের মন্দ চরিত্রের কারণেই সমাজে এত খারাবী চালু আছে।

(২) তাদের অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও যুলুমের ফলেই সমাজে এত অশান্তি ও দুঃখ দেখা যায়।

(৩) সাধারণ মানুষ যালিম নেতাদের তৈরি আইন ও নিয়ম-কানুনে এমনভাবে বাঁধা যে, এসব মুসীবত থেকে মুক্তির কোন পথই তারা পাচ্ছে না।

এসব কথা রাসূল (সা.)-এর দরদী মনকে পেরেশান করতে লাগলো। কি করে সমাজকে সংশোধন করা যায় এবং কিভাবে মানুষের অশান্তি ও দুঃখ দূর করা যায় এ চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুললো। অনেক সময় তিনি একা একা কোন নিরিবিলি জায়গায় এসব নিয়ে চিন্তা করতেন, নীরবে আল্লাহকে ডাকতেন এবং দোয়া করতেন। এতে তাঁর চিন্তা ও পেরেশানী আরও বেড়ে গেলো। শেষ দিকে তিনি মাক্কার বাইরে মিনার নিকটে একটি উঁচু পাহাড়ের উপরের এক গুহায় বসে ভাবতেন, আর আল্লাহর কাছে ধরনা দিতেন।

যে পাহাড়ের গুহায় তিনি বসতেন, তা পাথরের তৈরি এবং গুহাটিতে ঢুকবার পথটুকু সরু। গুহার চারপাশই পাথরে ঘেরা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, গুহার ভেতর বসলে সামনে কয়েক ইঞ্চি জায়গা এতটুকু ফাঁকা আছে যে, সেখান থেকে দু'মাইল দূরে কা'বা ঘর স্পষ্ট দেখা যায়। অবশ্য আজকাল কা'বা শরীফের চারপাশের উঁচু দালানের জন্য ঐ গুহা থেকে কা'বা ঘর চোখে পড়ে না। কিন্তু কা'বার চারপাশের বায়তুল হারামের মাসজিদ ও মিনার দেখা যায়।

এ গুহাটিকেই 'হেরা গুহা' বলে। আর পাহাড়টিকে জাবালুন নূর বা 'আলোর পাহাড়' বলা হয়। কিছু দিন রাসূল (সা.) এভাবে আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে থাকলেন। মাঝে মাঝে একসাথে কয়েকদিন গুহাতেই কাটাতেন এবং হযরত খাদীজা (রা.) খাবার ও পানি দিয়ে যেতেন। ক্রমে ক্রমে গুহায় একটানা থাকার সময়টা আরও লম্বা হতে লাগলো। যতই দিন যায়, রাসূল (সা.)-এর দরদী মনের অস্থিরতা আরও বেড়ে চলে।

দীর্ঘ কয়েক মাস বৃষ্টি না হবার ফলে চৈত্র মাসে যেমন পিপাসায় মাঠ ফেটে বৃষ্টির পানির জন্য হা-হুতাশ করতে থাকে, মানব সমাজের অশান্তি কিভাবে দূর করা যায় সে চিন্তায় রাসূল (সা.)-এর অনুভূতিশীল মন তেমনি কাতরভাবে আল্লাহর কাছে পথের দিশা চাইতে লাগলো।

এমন অবস্থা ও পরিবেশেই সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আ.) চৈত্র মাসের আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির মতো ওহী নিয়ে হাযির হন। সূরা 'আলাকে'র পয়লা পাঁচটি আয়াত হেরা গুহায়ই নাযিল হয়। হঠাৎ এত বড় ঘটনায় রাসূল (সা.) ঘাবড়ে যান। কিন্তু তবু বেশ কিছুদিন ওহী না আসায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তখন সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র পয়লা সাতটি আয়াতে তাঁকে রাসূল হিসাবে প্রাথমিক দায়িত্ব দেয়া হয়। আরও কিছু পরে সূরা 'মুয্‌যাম্মিলে'র পয়লা কয়েকটি আয়াতে তাঁকে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার হিদায়াত দেয়া হয়।

www.bjilibrary.com

এভাবে কয়েক কিস্তি কয়েকটি সূরার অংশ নাযিলের পর রাসূল (সা.) যখন ওহীর সাথে পরিচিত হলেন, জিবরাঈল (আ.)-এর কয়েকবার আগমনে মনের প্রাথমিক ভয় ও বিব্রত ভাব যখন দূর হয়ে গেল এবং নবুওয়াতের মহান ও বিরাট দায়িত্ব যখন ঠিকভাবে বুঝে নিলেন, তখনই পরিপূর্ণ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা প্রথম একপশলা বৃষ্টির মতো নাযিল হয়। সমাজের দুরবস্থা ও মানুষের অশান্তি দূর করার যে ওষুধ তিনি এতদিন অস্থিরভাবে তালাশ করছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের খোঁজ তিনি এ সূরাটিতে পেয়ে গেলেন।

আলোচনার ধারা ঃ মানুষ স্বাভাবিকভাবে ঐ জিনিসের জন্য দোয়া করে, যার অভাব সে বোধ করে এবং যার কামনা-বাসনা তার দিলে আছে। আর তাঁর কাছেই সে দোয়া করে, যাঁর সম্পর্কে সে মনে করে যে, তিনি ঐ জিনিসটি দেবার ক্ষমতা রাখেন। কুরআনের শুরুতে এ দোয়া শেখাবার মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সঠিক পথ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই এ কিতাবখানা পড়ে, সত্য তালাশের মনোভাব নিয়েই যেন পড়ে এবং নির্ভুল জ্ঞানের উৎস যে একমাত্র আল্লাহ- একথা খেয়াল করে তাঁরই কাছে পথ দেখাবার দরখাস্ত করে যেন এ কিতাবখানা পড়া শুরু করে।

এটুকু বুঝবার পর একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সূরা ফাতিহা ও বাকী কুরআন শরীফের সম্পর্ক কোন বই এবং এর ভূমিকার মতো নয়। বরং এ সম্পর্ক হলো দোয়া ও দোয়ার জওয়াবের মতো। সূরা ফাতিহা বান্দাহর পক্ষ থেকে একটি দোয়া, আর গোটা কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ দোয়ার জওয়াব। বান্দাহ দোয়া করছে, "হে প্রভু! আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও।" এর জওয়াবে মনিব গোটা কুরআন বান্দাহর সামনে রেখে দিয়ে যেন বলছেন, "তোমরা যে হিদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের জন্য আমার কাছে দরখাস্ত করেছ এ কুরআনই সেই হিদায়াত ও পথ।"

সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আরও কতক জরুরী কথা (এ অংশটুকুও অনুবাদকের লেখা) ঃ

১। সূরা ফাতিহা শুধু একটি দোয়া নয়- শ্রেষ্ঠতম দোয়া। মানুষের সব চাওয়ার বড় চাওয়াই এখানে শেখানো হয়েছে। "সিরাতুল মুস্তাকীম"ই মানুষের পার্থিব লক্ষ্যবিন্দু। এ পথে চলা মানে আল্লাহর নিয়ামতে ডুবে থাকা এবং আল্লাহর গযব ও গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকা। কুরআন ও হাদীসে যত দোয়া শেখানো হয়েছে সবই সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা। এ সূরাটি এমন একটি সামগ্রিক দোয়া- যা দ্বারা এতে একসাথে সব কিছু চাওয়া হয়েছে।

২। দোয়া ও চাওয়া বললে তিনটি কথা বুঝা যায় ঃ

(ক) কারো কাছে দোয়া করা হচ্ছে বা চাওয়া হচ্ছে।

(খ) কেউ দোয়া করছে বা চাচ্ছে।

(গ) দোয়াপ্রার্থী কোন কিছু চাচ্ছে।

সূরা ফাতিহায় আসলে এ তিনটি কথাই আছে। পয়লা তিন আয়াতে শেখানো হয়েছে যে, "কার কাছে চাইতে হবে।" এর পরের আয়াতটিতে জানান হয়েছে যে, যারা দোয়া করবে,

www.bjilibrary.com

তাদের মধ্যে কি কি গুণ থাকতে হবে। মানে, কারা চাইলে পাবে। বাকী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, কোন্ জিনিস চাইতে হবে। মোটকথা, কার কাছে চাইতে হবে, কারা চাইলে পাবে এবং কী চাইতে হবে, এ তিনটি কথাই মানব জাতিকে এ সূরায় শেখানো হয়েছে।

৩। রাসূল (সা.) এ সূরায় কী শিক্ষা পেলেন ঃ (ক) প্রথম কয়টি আয়াতে রাসূল (সা.)-কে বলা হয়েছে, "হে রাসূল! আপনি সমাজের কল্যাণ ও মানুষের সুখ-শান্তির জন্য পেরেশান হয়ে যে পথ তালাশ করছেন, তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সে পথ একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির 'রব' হিসাবে সবার অভাব পূরণ করেন, যিনি সবচেয়ে দয়াময় এবং যিনি শেষ বিচরের দিনের মালিক। যিনি গোটা সৃষ্টি অভাব পূরণ করেন, মানব জাতির হিদায়াতের অভাবও শুধু তিনিই পূরণ করতে পারেন। আর মানুষের শুধু দুনিয়ার দুঃখ দূর করার চিন্তা করলেই চলবে না, মরণের পরও যাতে মানুষ সুখ পায়, সে ভাবনাও থাকতে হবে। তাই যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, তিনিই সত্যিকার শান্তির পথ দেখাবার যোগ্য- অন্য কেউ নয়।

হে রাসূল! আপনি সেই মহান রবের কাছেই ঐ পথ পাবেন, যা এদ্দিন হয়রান হয়ে তালাশ করছেন। তাঁরই নাম আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর, যার মধ্যে যত গুণ- এসব যে আল্লাহ পয়দা করেছেন সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। গুণ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ সৃষ্টি জগতে যার যার মধ্যে দেখা যায়, তারা কেউ এসব সৃষ্টি করেনি। তাই প্রশংসার বাহাদুরী তাদের পাওনা হতে পারে না। সুন্দর মানুষ, মিষ্টি ফল, মধুর চাঁদ ইত্যাদি যিনি পয়দা করেছেন, বাহাদুরী একমাত্র তাঁরই। তাই প্রশংসার মতো যা-ই পাওয়া যায় একমাত্র "আলহামদু লিল্লাহ" বলাই সবার কর্তব্য।

(খ) "আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি ও তোমারই কাছে সাহায্য চাই"- এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, "হে রাসূল! যে জিনিস আপনি চাচ্ছেন, তা পেতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। সমাজের সংশোধন ও মানুষের কল্যাণ সাধন এমন কঠিন কাজ, যা একা একা করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আপনাকে এমন একদল লোক যোগাড় করতে হবে, যারা আপনার সাথে মিলে আমার দাসত্ব করবে এবং আমার সাহায্য চাইবে।

এ আয়াতটিতে এজন্যই বহুবচনের পদ "আমরা" ব্যবহার করা হয়েছে। জামায়াতবদ্ধভাবে সুসংগঠিত চেষ্টা ছাড়া সমাজের কল্যাণ করা অসম্ভব। পরোক্ষভাবে এ আয়াতে এটাকেই পয়লা শর্ত বানানো হয়েছে। এ কাজ একা করা সম্ভব নয়।

দু'নম্বর শর্ত হলো, মানব সমাজের হিদায়াত ও শান্তি যারা চায়, তাদেরকে পূর্ণ তাওহীদবাদী হতে হবে। একমাত্র আল্লাহর দাসত্বই তাদের জীবনধারা হতে হবে, আল্লাহর হুকুম ও মরযীর বিপরীত অন্য কোন শক্তির যারা পরওয়া করে, তারা এ কঠিন পথে চলার যোগ্য নয়।

তিন নম্বর শর্ত হলো, যারা এ পথের পথিক, তারা সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায়, তারা আর কারো মুখাপেক্ষী হয় না। তারা আর কারো দয়া ও সহায়তার ধার ধারে

www.bjilibrary.com

না। সারা দুনিয়া তাদের বিরোধী হলেও একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে তারা আল্লাহর দেখানো পথে মানব সমাজকে সংশোধন করার চেষ্টা করে।

এটাই হচ্ছে 'ইকামাতে দ্বীনের' পথ। এরই অন্য নাম আল্লাহর পথে জিহাদ। বাংলা ভাষায় একেই বলা হয় 'ইসলামী আন্দোলন'। তাই আন্দোলনের শুরুতেই রাসূল (সা.)-কে এসব শর্তও সূরাটিতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

(গ) শেষ কয়টি আয়াতে রাসূল (সা.)-কে অনেক মূল্যবান কথা শেখানো হয়েছে। আল্লাহর কাছে ঐ পথই চাইতে হবে, যা সরল ও মযবুত। দুটো বিন্দুর মাঝখানে সরল রেখা একটাই হবে। আর বাঁকা রেখা অনেক হতে পারে। যেটা যত বাঁকা, সে রেখাটা ততই লম্বা। অশান্তি থেকে শান্তি পর্যন্ত যে সোজা পথ, তাও একটাই। আর বাঁকা পথের কোন সীমা-সংখ্যা নেই। তাই একমাত্র সিরাতুল মুস্তাকীমই চাইতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মেহেরবানী ও নিয়ামাত পাওয়া এবং আল্লাহর গযব ও গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকার নিয়তেই সিরাতুল মুস্তাকীম চাইতে হবে। সূরা নিসার ৬৯ আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ পথটিই নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ লোকদের পথ এবং তাঁরাই নিয়ামাত পেয়েছেন।

এ আয়াত কয়টিতে পরোক্ষভাবে আরও একটা কথা শেখানো হয়েছে যে, হে রাসূল! কোন্ পথটা সিরাতুল মুস্তাকীম, তা আপনি নিজে বাছাই করবেন না। কারণ, বাছাই করতে আপনার ভুল হতে পারে। আপনার তো নিয়ামাত দরকার এবং গযব ও গুমরাহী থেকে বাঁচা প্রয়োজন। তাই নিজেকে পুরাপুরি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করুন। যে পথ তিনি দেখাবেন, সে পথেই চলুন। আপনার নিজস্ব মত, রুচি ও খেয়ালের দ্বারা সে পথ বাছাই না করে ঐ পথকেই সিরাতুল মুস্তাকীম মনে করবেন, যে পথ কুরআনে দেখানো হচ্ছে।

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব (এ অংশটুকুও অনুবাদকের রচনা) ঃ

১। আল্লাহর পথে বান্দাহ্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সেতুবন্ধন হলো এ সূরা। বান্দাহ্ তার মনিবেরই শেখানো দোয়ার মাধ্যমে তাঁর নিকট ধরনা দেবার এক মহা-সুযোগ পেয়েছে। এ যেন সরকারীভাবে দেয়া দরখাস্তের ফরমে দস্তখত করার সুযোগ। যে দরখাস্ত কবুল করবে, সে-ই যদি দরখাস্তের ফরম পূরণ করার জন্য দেয়, তাহলে এ দরখাস্ত মনযুর হবারই পূর্ণ আশা।

এ সূরায় রাহমান ও রাহীম হিসাবে পরিচয় দিয়ে যে দোয়া শেখানো হয়েছে এ দোয়া যাতে বারবার পেশ করা হয়, সেজন্য নামাযে প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি পড়ার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটাও আর একটা বড় মেহেরবানী। এর মানে হলো, দরখাস্তের ফরম সত্ত্বেও ফরমটা পূরণ করতে যেন অবহেলা না করা হয়, সেজন্য জোর তাকীদ দেয়া হলো।

২। কুরআন মাজীদে এ সূরার নাম দেয়া হয়েছে উম্মুল কিতাব বা কুরআনের মূল বা সার কথা। এ সূরার মারফতে মানুষের মন-মগয যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটাই

www.bjilibrary.com

কুরআনের বুনিয়াদী শিক্ষা। যার মানসিকতা এ সূরার ভিত্তিতে তৈরি হলো, সে কুরআন পাকের মূল স্পিরিট পেয়ে গেলো। অর্থাৎ সূরা ফাতিহার প্রাণসত্তা যে পেলো কুরআনের দেখানো পথে চলা তার জন্যই সহজ।

'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ- নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে তুলে দেয়া। আর এটাই সূরা ফাতিহার সারকথা ও কুরআনের মর্মকথা।

৩। সূরা ফাতিহা সম্পর্কে এক হাদীসে কুদসীতে (যে হাদীসে কোন কথাকে সরাসরি আল্লাহ নিজে বলেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।) আল্লাহ পাক এমন আবেগময় ভাষায় কথা বলেছেন, যা বান্দাহ্‌র মনে গভীর দোলা না দিয়ে পারে না। হাদীসখানার তরজমা নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, "কুসসিমাতিস্ সালাতু বাইনী ও বাইনা আবদী নিসফাইন, ওয়া লিআবদী মা-সাআলানী।" "নামায আমার ও বান্দাহ্‌র মধ্যে আধাআধি ভাগ করা হয়েছে, আর আমার বান্দাহ্ আমার কাছে যা চাইলো, তা-ই তার জন্য রইলো।"

"যখন বান্দাহ্ বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'হামিদানী আবদী' (আমার বান্দাহ্ আমার প্রশংসা করলো)। যখন বান্দাহ্ বলে, 'আররাহমানির রাহীম', তখন আল্লাহ বলেন, 'আসনা আলাইয়া আবদী' (আমার বান্দাহ্ আমার গুণ গাইলো)। যখন বান্দাহ্ বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'মাজ্জাদানী আবদী' (আমার বান্দাহ্ আমার গৌরব বর্ণনা করলো)।

"যখন বান্দাহ বলে, ই-ইয়াকানা'বুদু ওয়া ই-ইয়াকানাসতাঈন', তখন আল্লাহ বলেন, 'হাযা বাইনা ও বাইনা আবদী, ওয়া লিআবদী মা-সাআলা' (অর্থাৎ আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে এটাই সম্পর্ক যে, সে শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং শুধু আমারই কাছে চাইবে, আর যা সে চাইবে তা-ই পাবে)।"

আর বান্দাহ্ যখন বলে, ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম ... ওয়া লাদ্দোয়াল্লীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'হাযা লিআবদী, ওয়া লিআবদী মা-সাআলা' (এটা আমার বান্দাহ্‌র জন্যই রইলো, আর আমার বান্দাহ্‌র জন্য তা-ই, যা সে চাইলো)।"

এ হাদীসে মহব্বতের এমন অগ্নিকণা রয়েছে যে, বান্দাহ্‌র দিলে ঈমানের বারুদ থাকলে এবং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর প্রাণস্পর্শী কথাগুলোর দিকে গভীর মনোযোগ দিলে আল্লাহর সাথে মহব্বতের এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, আবেগের গভীরতায় বান্দাহ্ মনিবের অতি কাছে বলে অনুভব করবে।

এ সূরা পড়ার সময় এ হাদীসটির কথা খেয়াল থাকলে এক একটি আয়াত পড়ার পর আল্লাহর প্রেমময় জওয়াবটা মনের কানে শুনবার জন্য বান্দাহ্‌কে থামতেই হবে। এমন জওয়াবে যে তৃপ্তি ও শান্তি, তা তারাই বোধ করতে পারে, যারা আয়াতগুলো ধীরে ধীরে মজা নিয়ে পড়ে।

www.bjilibrary.com

৪। এ সূরাটি দুনিয়ার বাদশাহ্‌র সাথে অসহায় মানুষের এক গোপন কথাবার্তা। কিন্তু এখানে বাদশাহ্‌র কথাগুলো গোপনই আছে। শুধু দয়ার কাঙ্গাল মানুষের কথাগুলোই সূরাটিতে দেয়া হয়েছে। যেমন কোন রাজার দরবারে কোন প্রজা গিয়ে পয়লা রাজার গুণগান করে। রাজা জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? প্রজা বলে, 'আর কে, আপনারই নগণ্য খাদিম ও দয়ার ভিখারী। রাজা তখন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি চাও? প্রজা তখন তার আসল বাসনা জানায়।

সূরা ফাতিহায় এমনি একটা ছবি ফুটে উঠেছে। বান্দাহ্‌ পয়লা আল্লাহর গুণগান করার পর আল্লাহ্‌ যেন জিজ্ঞেস করছেন, 'কে তুমি ?' বান্দাহ্‌ বিনয়ের সাথে জওয়াব দিচ্ছে, "একমাত্র আপনার-ই দাস, আপনার কাছেই সাহায্যপ্রার্থী।" আল্লাহ আবার বলেন, "আচ্ছা বুঝলাম, তুমি আমার কাছে কী চাও ?" বান্দাহ্‌ বলে, "আমাকে সঠিক পথে চালাও।" আল্লাহ বলেন, "কোন পথটাকে তুমি ঠিক মনে কর ?" বান্দাহ্‌ বলে "সে পথ আমি চিনি না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ঐপথে চালাও যে পথে চললে তোমার নিয়ামাত সব সময় পাওয়া যাবে, কোন সময় গযবে পড়ার কারণ ঘটবে না ও পথ হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না।"

তখন আল্লাহ বলেন, "যদি সত্যি তুমি চাও যে, আমি তোমাকে সঠিক পথে চালাই, তাহলে এই নাও কুরআন। কুরআনের কথামত চল, তাহলে গযব থেকে বেঁচে থাকবে, ভুল পথে যাবার কোন কারণ ঘটবে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমার সন্তুষ্টি ও নিয়ামাত ভোগ করবে।"

৫। কুরআন শরীফের শুরুতে এ সূরাটি স্থাপন করে মানব জাতিকে এ কথাই জানানো হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীম আল্লাহর দেয়া এমন বিরাট নিয়ামাত যে, এটা ইখলাসের সাথে মনে প্রাণে পরম আকুতি নিয়ে আল্লাহর কাছে না চাইলে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ পাক দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনীয় জিনিসই মানুষকে দিয়ে থাকেন। এর জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোন শর্ত নেই। আল্লাহকে অস্বীকার করলে, এমনকি আল্লাহকে গালি দিলেও তিনি রিযক বন্ধ করবেন না। না চাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার বড় বড় নিয়ামাত আল্লাহ্‌র বিদ্রোহীকেও দেয়া হয়।

কিন্তু সিরাতুল মুস্তাকীম, হিদায়াত বা আল্লাহর দ্বীনের পথ কারো উপর চাপিয়ে দেবার জিনিস নয়। না চাইলে এ মহা নিয়ামাত কোন ব্যক্তি বা জাতিকে দেয়া হয় না। কোন অনিচ্ছুক জাতি হিদায়াত পায় না। কারণ, হিদায়াত আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান এবং এ দান অপাত্রে দেবার নিয়ম নেই। খাঁটি মনে কাতরভাবে মহান ও দয়াময় মনিবের নিকট ধরনা দেয়া ছাড়া এ দান পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফাতিহা	سـورة الـفـاتـحـة
সূরা ঃ ১ — মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ١ — مكية
মোট আয়াত ঃ ৭ — মোট রূকু ঃ ১	ركوعها : ١ — اياتها : ٧
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১. সকল প্রশংসা[১] শুধু আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব।[২]	١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ
২. মেহেরবান ও দয়াময়,	٢- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ
৩. বিচার দিনের মালিক।	٣- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ
৪. আমরা (একমাত্র) তোমারই ইবাদত করি[৩], আর (শুধু) তোমারই কাছে সাহায্য চাই।	٤- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ
৫. আমাদেরকে সোজা-সঠিক পথ দেখাও।	٥- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ
৬. ঐ সব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামাত দিয়েছ,	٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
৭. যাদের উপর গযব পড়ে নি, আর যারা পথহারা হয় নি।[৪]	٧- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع

১। আল্লাহ্পাক এ সূরাটি বান্দাহ্দেরকে এ জন্য শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে তারা একটা দরখাস্ত হিসাবে সূরাটিকে তাদের মনিবের খিদমতে পেশ করে।

২। আরবি ভাষায় 'রব' শব্দটি তিনটি অর্থে বলা হয় ঃ ১-মালিক, মনিব, প্রভু; ২-লালন-পালনকারী; ৩-হুকুমকর্তা, বিধানদাতা, শাসক, ব্যবস্থাপক, বন্দোবস্তকারী। আল্লাহ এ সব অর্থেই সারা জাহানের রব।

৩। 'ইবাদাত' শব্দটিও আরবীতে তিন অর্থে ব্যবহার করা হয়: ১-পূজা-উপাসনা; ২-আনুগত্য ও আদেশ পালন; ৩-দাসত্ব ও গোলামী।

৪। বান্দাহ্র এ দোয়ার জওয়াবই হলো পুরা কুরআন। দাস তার মনিবের কাছে পথ দেখাবার জন্য দোয়া করছে, আর মনিব এর জওয়াবে তাকে এ কুরআন দান করেছেন। শেষ আয়াতের আরও এক রকম তরজমা হতে পারে যেমন, "ঐ সব লোকের পথ নয়, যাদের উপরে গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

সূরা আন-নাবা

নাম ঃ সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতের নাবা শব্দ থেকেই নাম রাখা হয়েছে। নাবা অর্থ খবর বা সংবাদ। এ থেকেই নবী শব্দ তৈরি হয়েছে, যার অর্থ সংবাদবাহক বা পয়গামবার। এ সূরায় বড়-খবর বা মহা-সংবাদ দ্বারা কিয়ামাত ও আখিরাত বুঝানো হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে সূরাটি নাযিল হয়। এর আগের তিনটি সূরা– কিয়ামাহ, দাহর ও মুরসালাত এবং এর পরের নাযিয়াতের সাথে এই সূরাটির আলোচ্য বিষয়ে বেশ মিল আছে এবং পাঁচটি সূরাই মাক্কী যুগের প্রথমভাগে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ কিয়ামাত ও আখিরাতই এর আলোচ্য বিষয়। আখিরাতের প্রমাণ এবং আখিরাতকে মানা ও না মানার ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে এখানে সাবধান করা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ঃ রাসূল (সা.) যখন ইসলামের তাবলীগ শুরু করেন, তখন তিনটি কথাকে পয়লা কবুল করার জন্য জনগণকে দাওয়াত দেন- তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত।

(১) আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও মা'বুদ মানা এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে আর কাউকে শরীক না করাই তাওহীদের মূলকথা।

(২) মুহাম্মাদ (সা.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মানাই রিসালাতের পয়লা কথা।

(৩) এ কথা বিশ্বাস করা যে, এ দুনিয়া এক সময় খতম হয়ে যাবে এবং আর একটা জগত পয়দা হবে, যখন সব মানুষকে আবার জীবিত করা হবে এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের হিসাব নেয়া হবে। শেষ বিচারে যারা মু'মিন ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে, তাদেরকে চিরদিনের জন্য বেহেশতে পাঠানো হবে। আর যারা কাফির, ফাসিক ও মুনাফিক প্রমাণিত হবে, তাদেরকে দোযখে দেয়া হবে। এটাই হলো আখিরাতের সংক্ষেপ কথা।

এ তিনটি কথার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় কথার চেয়ে তৃতীয় কথাটিকে মেনে নেয়াই মাক্কাবাসীরা বেশী কঠিন মনে করলো। আল্লাহ্‌কে তারা বিশ্বাস করতো, কিন্তু একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ, মা'বুদ ও মনিব মানতে হবে এবং আর কারোই ইবাদত করা যাবে না– একথা তারা মানতে রাযী ছিল না। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (সা.)কে তারা নবুওয়াতের আগেই সবচেয়ে সত্যবাদী, সচ্চরিত্র ও আমানতদার বলে স্বীকার করতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূল হিসাবে তাঁকে স্বীকার করতে রাযী ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মাদ (সা.) তাদের কাছে অপরিচিত ছিল না।

www.bjilibrary.com

কিন্তু কিয়ামাত ও আখিরাতের কথা তাদের কাছে একেবারেই আজব মনে হলো। তারা কিছুতেই এ কথাকে সত্য বলে মানতে পারছিল না। এটাকে তারা অসম্ভব ও অবাস্তব মনে করতো। তাই এ কথাটি নিয়ে তারা খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো, এটাকে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করলো এবং এটাকে কল্পনারও অতীত মনে করে চরম বিস্ময় প্রকাশ করলো।

অথচ ইসলামের পথে জনগণকে আনতে হলে আখিরাতের বিশ্বাস তাদের দিলে না বসিয়ে উপায় ছিল না। কারণ, আখিরাতের আকীদা মন-মগযে মযবুত না হলে মানুষ কিছুতেই ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে না। আখিরাতের বিশ্বাস ছাড়া হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝবার যোগ্যতাই সৃষ্টি হয় না এবং ভাল ও মন্দের ব্যাপারে সঠিক মূল্যবোধ মোটেই পয়দা হয় না। রূপ-রস-গন্ধে ভরা এ দুনিয়ার মজা মানুষকে এত জোরে টেনে নেয় যে, আখিরাতের প্রতি মযবুত ঈমান ছাড়া তা থেকে ছুটে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্যেই মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে নাযিল হওয়া সূরাগুলোতে আখিরাতের আকীদা মন-মগযে মযবুত করার জন্য এত জোর দেয়া হয়েছে। অবশ্য আখিরাতের যুক্তি-প্রমাণ এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে তাওহীদের ধারণা আপনা-আপনিই মগযে বসে যায়। ফাঁকে ফাঁকে রাসূল (সা.) ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণও তাতে এসে গেছে। এ থেকেই বুঝা যায়, মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের সূরাগুলোতে আখিরাত সম্বন্ধে বারবার এত আলোচনা কেন করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ পয়লা তিন আয়াতে আখিরাত সম্বন্ধে মাক্কাবাসীরা যে তর্কবিতর্ক ও হাসি-ঠাট্টা করছিল এবং নানা রকম মতামত ও মন্তব্য প্রকাশ করছিল, সেদিকে ইশারা করেই সূরাটি শুরু করা হয়েছে।

(২) ৪ ও ৫ আয়াতে একটু ধমকের সুরে বলা হয়েছে, আখিরাতকে তোমরা স্বীকার করছো না ? একটু অপেক্ষা কর। শিগগিরই জানতে পারবে। মওত বেশী দূরে নয়। মওতের পরই সব জানতে পারবে।

(৩) ৬-১৬ আয়াতে আখিরাত অবিশ্বাসীদের মন-মগযে খোঁচা দিয়ে তাদেরকে কতক প্রশ্ন করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। আল্লাহ পাক দুনিয়ার জীবনে মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য যা কিছু পয়দা করেছেন, সে সবের উল্লেখ করে বলেন, যমীন ও আসমান, দিন ও রাত, পাহাড় ও নদী, স্বামী ও স্ত্রী, ঘুম ও বিশ্রাম, সূর্য ও বৃষ্টি এবং তার সৃষ্ট বাগ-বাগিচা উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য সুবন্দোবস্ত কি আমি করি নি ? মরণের পরপারে তোমাদের জীবনে যা-কিছু হবে, তার ব্যবস্থাও আমি করেছি। এ জীবনে আমি যা করেছি, তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পরকালে কি করব, তা এখন দেখতে পাচ্ছ না বলেই কি তা অস্বীকার করা যুক্তি ও সুবুদ্ধির লক্ষণ ?

তোমাদের জন্য দুনিয়ায় যত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছি, আর কোন সৃষ্টির জন্য তা করিনি। বরং গোটা সৃষ্টিজগত তোমাদের খিদমতের জন্যই পয়দা করেছি। কোন্ যুক্তিতে তোমরা এই

www.bjilibrary.com

ধারণা করছ যে, দুনিয়ার পরপারে তোমাদের কাছে কোন হিসাব চাওয়া হবে না? দুনিয়ায় তোমরা আমার মরযী মতো চলেছ কি-না একথা কি জিজ্ঞেস করা হবে না? তোমরা কি মনে কর দুনিয়ার এ সব কিছু আমি খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করেছি? এর পেছনে কোন বড় উদ্দেশ্যই কি নেই ? তোমাদেরকে দুনিয়ায় এত ক্ষমতা দিলাম এবং ভাল-মন্দ বুঝবার শক্তিও দিলাম। এরপর এসব কিভাবে ব্যবহার করলে এটুকুর হিসাব না নিয়ে এমনিই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে?

(৪) ১৭ ও ১৮ আয়াতে খুব জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তোমাদের এ জীবনের ফলাফল কি হবে, সে বিষয়ে ফায়সালা করার দিন ঠিক হয়েই আছে। শুধু শিংগায় একটা ফুঁক দিতে যা দেরী। তখন তোমরা সবাই দলে দলে হিসাব দেবার জন্য হাশরের ময়দানে হাযির হয়ে যাবে। আজ সে কথা বিশ্বাস কর আর না-ই কর, তাতে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না।

(৫) ১৯ ও ২০ আয়াতে কিয়ামাতের অবস্থার সামান্য ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

(৬) ২১-৩০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আখিরাতের হিসাব-কিতাবের ধার ধারে নি, তাদের সব কীর্তিকলাপ গুনে গুনে রেকর্ড করেছি এবং তাদের 'খিদমাত' করার জন্য দোযখ ওঁত পেতে আছে। সেখানে তাদের সব আমলের পুরাপুরি বদলা দেয়া হবে।

(৭) ৩১-৩৬ আয়াতে ঐসব লোকের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যারা আখিরাতের হিসাব-নিকাশের খেয়াল রেখে পুরো দায়িত্ববোধ নিয়ে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, তাদের নেক আমলের পুরস্কার ছাড়াও অতিরিক্ত অনেক নিয়ামাত দান করা হবে।

(৮) ৩৭-৩৮ আয়াতে আদালতে আখিরাতের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সেখানে কারো পক্ষে তার অনুগামীদের পার করিয়ে নেবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বিনা অনুমতিতে মুখ খোলার ক্ষমতাও কারো হবে না। কথা বলার অনুমতি যারা পাবে, তারা নিজেদের মরযী মতো যা-ইচ্ছা তা-ই বলতে পারবে না। সুপারিশ করার অনুমতি যিনি পাবেন, তিনিও নিজের ইচ্ছামতো যার-তার জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। যার জন্য সুপারিশের অনুমতি হবে, শুধু তারই পক্ষে কথা বলতে পারবেন।

(৯) শেষ দু'আয়াতে চূড়ান্ত ধমক দিয়ে বলা হয়েছে যে, শেষ যে দিনটির কথা জানানো হলো, তা মোটেই দূরে নয়। এখন যার ইচ্ছা হয় আল্লাহর পথে চলুক।

যারা এরপরও আখিরাত বিশ্বাস করতে চায় না, তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা যা-কিছু করছ, সবই সেদিন তোমাদের সামনে হাযির করা হবে। তখন শুধু আফসোস ও অনুতাপ করে বলতে হবে যে, "হায়"! আমি যদি পয়দাই না হতাম, বা এখন যদি মাটিতে মিশে যেতে পারতাম এবং শাস্তি থেকে কোন রকমে রেহাই পেয়ে যেতাম।" কিন্তু এ আফসোস শুধু দুঃখই বাড়াবে-এতে কোন লাভ হবে না।

www.bjilibrary.com

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরায় দোযখ ও বেহেশতের যে ছবি পাশাপাশি আঁকা হয়েছে, তাতে দেখান হয়েছে যে, দোযখ এমন এক চিরস্থায়ী বাসস্থান, যেখানে দুঃখের কোন সীমা নেই, আর বেহেশতে সুখেরও কোন সীমা নেই।

যা মানুষের দরকার তার অভাবের কারণেই দুঃখ বোধ হয়। দেহে পানির অভাব হলেই পিপাসা হয়। স্বাস্থ্যের অভাবে যে দুঃখ হয়, তারই নাম অসুখ বা সুখের অভাব।

এ সূরার ২১ থেকে ২৬ আয়াতে দোযখ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সেখানে যখন পিপাসা বোধ হবে, তখন অবশ্যই পানি দেয়া হবে। কিন্তু সে পানি অভাব দূর করবে না, বরং এমন পানি দেয়া হবে, যাতে পিপাসা লক্ষ-কোটি গুণ বেড়ে যাবে। এতে পানির অভাববোধ বেড়ে গিয়ে দুঃখ বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু বেহেশতের অবস্থা এর বিপরীত হবে। সেখানে অভাবের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সুখ ও আরামের জন্য মানুষ যা চায় সবই সেখানে অফুরন্ত পাবে।

দুনিয়াতে সুখ ও দুঃখ এক সাথে মিলে আছে। "দুঃখ বিনা সুখ লাভ" হয় না। কিন্তু আখিরাতে দুঃখ ও সুখ একেবারেই আলাদা হয়ে যাবে। দোযখে শুধু দুঃখ এবং বেহেশতে শুধু সুখ থাকবে। এ দুটো আর এক সাথে পাওয়া যাবে না।

বেহেশতে শুধু একটি জিনিসেরই অভাব থাকবে যার নাম অভাব এবং যা দুঃখের কারণ। বেহেশত এমন এক বাসস্থান, যেখানে সকল প্রকার অভাবেরই অভাব রয়েছে। আর দোযখে একমাত্র ঐ জিনিসই আছে, যা বেহেশতে নেই। তারই নাম অভাব। অভাব ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই।

Heaven in that eternal abode where there is want of all wants and want of nothing else; and Hell is that eternal abode where there is only want and nothing else.

www.bjilibrary.com

সূরা আন্‌-নাবা

سورة النبا

সূরা ঃ ৭৮ | মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৪০ | মোট রুকু ঃ ২

مكية | رقمها :٧٨ ٨٧

اياتها : ٤٠ | ركوعها : ٢

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. এরা কোন বিষয়টি নিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করছে ?

২. ঐ বড় খবরটি নিয়ে নাকি -

৩. যে বিষয়ে এরা নানা মত প্রকাশ করে চলেছে ?

৪. কক্ষনো নয়[১], শিগগিরই ওরা জানতে পারবে।

৫. হ্যাঁ কক্ষনো নয়, শিগগিরই ওরা জানতে পারবে।

৬. একথা কি ঠিক নয় যে, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি ?

৭. আর পাহাড়গুলোকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি ?

৮. আমি তোমাদেরকে (নারী ও পুরুষের) জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি।

৯. তোমাদের ঘুমকে শান্তির উপায় বানিয়েছি।

১০-১১. রাতকে আবরণ ও দিনকে রুজি-রোজগারের সময় বানিয়েছি।

১২. তোমাদের উপর সাতটি মযবুত (আসমান) কায়েম করেছি।

١- عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ○

٢- عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ○

٣- الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ○

٤- كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○

٥- ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○

٦- اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ○

٧- وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ○

٨- وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ○

٩- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ○

١٠- وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ○

١١- وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○

١٢- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ○

১। মানে, আখিরাতের বিষয়ে এরা যেসব কথা বলে বেড়াচ্ছে, তা সবই ভুল। এরা যা ধারণা করে আছে, তা কক্ষনো সঠিক নয়।

১৩. আমি এক অতি উজ্জ্বল ও অতি গরম বাতি[২] বানিয়েছি।

১৪. মেঘমালা থেকে অবিরাম বৃষ্টিবর্ষণ করেছি।

১৫-১৬. যাতে এর সাহায্যে ফসল, শাক-সবজি ও ঘন বাগান উৎপাদন করতে পারি।

১৭. নিশ্চয়ই মীমাংসার দিনটির সময় নির্দিষ্ট হয়েই আছে।

১৮. যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, তারপর তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।

১৯. আসমান খুলে দেয়া হবে, ফলে গোটা আসমান দুয়ারে পরিণত হবে।

২০. আর পাহাড়কে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।

২১. নিশ্চয়ই দোযখ একটা গোপন ফাঁদ।[৩]

١٣- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝

١٤- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

١٥- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝

١٦- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝

١٧- اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝

١٨- يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝

١٩- وَّفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝

٢٠- وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

٢١- اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

২। এর মানে হলো সূর্য। আরবি 'ওয়াহ্‌হাজ' শব্দটি দ্বারা খুব গরম ও উজ্জ্বল-এ দু' অর্থই বুঝায়। তাই তরজমায় দুটো অর্থই নেয়া হয়েছে।

৩। শিকার ধরার উদ্দেশ্যে যে জায়গা তৈরি করা হয়, তাকেই আরবিতে মেরসাদ বলে। এতে শিকার বেখেয়ালে এসে হঠাৎ আটকা পড়ে। দোযখকে এ অর্থেই গোপন ফাঁদ বলা হয় যে, আল্লাহর বিদ্রোহীরা দুনিয়ার মজায় এমনভাবে মজে থাকে যেন তাদের পাকড়াও হবার কোন ভয় নেই। কিন্তু দোযখ তাদের জন্য এমন গোপন ফাঁদ, যেখানে সে হঠাৎ করে আটকা পড়বে এবং আটক হয়েই থেকে যাবে।

www.bjilibrary.com

২২. বিদ্রোহীদের আবাস।	٢٢- لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۙ
২৩. যেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে।[৪]	٢٣- لّٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا ۚ
২৪-২৫. যেখানে তারা গরম পানি ও পুঁজ ছাড়া কোন রকম ঠাণ্ডা ও পান করার মতো কোন কিছুরই স্বাদ পাবে না।	٢٤- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ ٢٥- اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ
২৬. এটা তাদের (আমলের) পরিপূর্ণ বদলা।	٢٦- جَزَاءً وِّفَاقًا ؕ
২৭. ওরা কোন হিসাব দিতে হবে বলে মনে করতো না।	٢٧- اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ
২৮. আর আমার আয়াতগুলোকে ওরা একেবারে মিথ্যাই মনে করেছিল।	٢٨- وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ؕ
২৯. অথচ প্রতিটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।	٢٩- وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ
৩০. এখন মজা বুঝ, আমি আযাব ছাড়া তোমাদের জন্য আর কিছুই বাড়াব না।	٣٠- فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۚ
রুকু ঃ ২	
৩১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতার একটা পর্যায়।	٣١- اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ
৩২. বাগ-বাগিচা ও আংগুর,	٣٢- حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ

৪। 'আহকাব' অর্থ হলো, একের পর এক আগত যুগ। এক এক যুগ খতম হবার সাথে সাথেই আর এক যুগ শুরু হয়ে যায়- এমন অবস্থা।

٣٣- وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ

৩৩. আর সমবয়সী নবীন যুবতী দল

٣٤- وَّكَأْسًا دِهَاقًا ۭ

৩৪. ও ভরা পানপাত্র।

٣٥- لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ

৩৫. সেখানে তারা কোন বাজে ও মিথ্যা কথা শুনবে না।

٣٦- جَزَاۤءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاۤءً حِسَابًا ۙ

৩৬. (এ সব) তোমার রবের কাছ থেকে বদলা ও বিপুল দান।[৫]

٣٧- رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ

৩৭. অত্যন্ত মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের দুয়ের মাঝে যা-কিছু আছে সব কিছুর মালিক, যাঁর সামনে কথা বলার সাহস কারো হবে না।[৬]

٣٨- يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰۤئِكَةُ
صَفًّا ۟ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

৩৮. যেদিন রূহ[৭] ও ফেরেশতারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, অসীম মেহেরবান যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।

٣٩- ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاۤءَ
اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا

৩৯. ঐ দিনটি সত্য সত্যই (আসবে), এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের কাছে ফিরে যাবার পথ দেখুক।

٤٠- اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖ ۚ يَّوْمَ
يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ
تُرٰبًا ۧ

৪০. আমি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় দেখালাম, যেদিন মানুষ ঐ সব দেখবে যা তার দু'হাত আগে পাঠিয়েছে* এবং কাফির চিৎকার করে বলে উঠবে ঃ হায়! আমি যদি মাটি হতাম!

৫। বদলা দেবার পর বিপুল দানের মানে হলো তাদের নেক আমলের যেটুকু বদলা পাওনা হবে তা দেবার পরও তাদেরকে অনেক বেশী পরিমাণে নিয়ামাত দান করা হবে।

৬। মানে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের পরিবেশ এমন ভয়াল হবে যে, যমীনের অধিবাসী হোক আর আসমানের বাসিন্দা হোক আল্লাহর সামনে মুখ খুলবার বা আল্লাহর আদালতের কাজে দখল দেবার কারো সাহস হবে না।

৭। রূহ অর্থ জিবরাঈল (আ.)। তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে ফেরেশতাদের কথা বলার পর আলাদাভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

* অর্থাৎ মানুষের আমল বা কাজ-কর্ম।

সূরা আন-নাযি'আত

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দ 'নাযি'আত' অনুযায়ী এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ সূরা নাবার পর এ সূরা নাযিল হয়। এর আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, মাক্কী যুগের প্রথম যুগের প্রথম ভাগেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ এর মূল বিষয় আখিরাত। কিয়ামাত ও মরণের পর আবার জীবিত হবার প্রমাণ এবং আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করার কুফল এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ঃ সূরা নাবার সমসাময়িক সূরা হিসাবে এর নাযিলের পরিবেশও সূরা নাবারই অনুরূপ।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৫ আয়াতে আল্লাহ পাক ঐসব ফেরেশতার কসম খেয়েছেন, যারা মৃত্যুর সময় জান বের করে নেয়, আল্লাহর হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে তা পালন করে ও আল্লাহর কথামত গোটা সৃষ্টি জগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কিয়ামাত যে হবেই হবে এবং মৃত্যুর পর যে আবার জীবিত হতেই হবে, সে বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দানের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা ঐ ফেরেশতাদের কসম খেয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, ফেরেশতারা আজ জান বের করে নেবার যোগ্য হয়ে থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে জান ফিরিয়ে দেবারও শক্তি রাখে। যে ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর, তারা আজ যেমন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে চালাচ্ছে, তেমনি একদিন এ জগতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে এবং আবার আর একটি জগত সৃষ্টি করতে পারবে।

(২) ৬-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আজ তোমরা কোন্ যুক্তিতে কিয়ামাতকে অসম্ভব মনে করছ ? এর জন্য তো একটা বড় রকমের ভূমিকম্পই যথেষ্ট। আর একটা ঝাঁকুনি দিলেই আর এক দুনিয়ায় তোমরা সব হাযির হয়ে যাবে। আজ যারা সে কথাকে সত্য মনে করছে না, তারাই সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে এবং ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে তারা ঐসব কিছু দেখতে থাকবে, যা আজ তারা অসম্ভব বলে ধারণা করছে।

(৩) ১৫-২৬ আয়াতে মূসা (আ.) ও ফিরআউনের কাহিনী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করে কিয়ামাতে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, তাঁর দেখানো পথে চলতে অস্বীকার করা এবং চালাকী ও চালবাজি করে তাঁকে পরাজিত করার অপচেষ্টা চালাবার যে কি কুফল, তা ফিরআউন দেখতে পেয়েছে। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি তোমরা ফিরআউনের মতো আচরণ ত্যাগ না কর, তাহলে তোমাদেরকেও ফিরআউনের মতোই দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করতে হবে।

(৪) ২৭-৩৩ আয়াতে আখিরাত ও পরকালের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রথমেই অবিশ্বাসীদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "তোমাদেরকে আবার পয়দা করা বেশী কঠিন কাজ, না চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারায় সজ্জিত এ বিরাট জগত তৈরি করা ?" এ ছোট্ট একটা প্রশ্নের মাধ্যমে আখিরাত হওয়া যে খুবই সম্ভব, সে বিষয়ে মযবুত যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এরপর মানুষ ও তার পালিত পশুর দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু জরুরী, তা পয়দা করার উদ্দেশ্যে আসমান ও যমীনে যে বিরাট সুব্যবস্থা রয়েছে, আল্লাহ্ পাক সেদিকে কাফিরদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দিন ও রাত, সমতল যমীন ও উঁচু পাহাড়, আকাশের বৃষ্টি ও যমীনের ঝরণা এবং এসবের কারণে মানুষ ও পশুর জন্য যত কিছু উৎপন্ন হয় এর প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোনটাই বিনা উদ্দেশ্যে অনর্থক তৈরি করা হয়নি।

এটুকু ইঙ্গিত দিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, মানুষকে এমন একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ জগতে কি বিনা উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয়েছে ? এ প্রশ্নের জওয়াব তালাশ করার দায়িত্ব মানুষের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান কি এ কথাই বলে যে, দুনিয়ায় মানুষকে ভাল ও মন্দ বাছাই করার যোগ্যতা দিয়ে এবং আসমান ও যমীনের সব কিছুকে ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়ে এমনিই ছেড়ে দেয়া হয়েছে ? মরার পর এ সবের কোন হিসাব নেয়া হবে না ?

(৫) ৩৪-৪১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন আখিরাত হবে, তখন মানুষের সেখানকার চিরস্থায়ী জীবনের ভাগ্য এ দ্বারা নির্ধারিত হবে যে, দুনিয়ার জীবনটা সে কিভাবে কাটিয়েছে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার মজা ভোগ করাকে যারা জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিল দোযখই তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে। আর যারা আখিরাতে মনিবের সামনে হাযির হয়ে হিসাব দেবার ভয় করেছে এবং সে অনুযায়ী তাদের নাফসের মন্দ ইচ্ছাকে দমন করেছে, জান্নাতই হবে তাদের স্থায়ী বাসস্থান।

এ কথা দ্বারা উপরের ঐ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হলো যে, মানুষকে দুনিয়ার জীবনে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এর স্বাভাবিক, নৈতিক যুক্তিগত দাবী এটাই যে, আখিরাতে মানুষের পার্থিব জীবনের হিসাব নেয়া এবং এর ভিত্তিতেই তাদের পুরস্কার ও শাস্তি হওয়া উচিত।

(৬) ৪২-৪৪ আয়াতে "কিয়ামাত কবে হবে ?" কাফিরদের এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অবিশ্বাসীরা ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে বারবার রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করতো যে, "কিয়ামাতের এত ভয় দেখাচ্ছ কেন? এখনি কিয়ামাত এনে দেখাও না কেন ? এটা যদি সত্যিই হবে, তাহলে কবে আসবে তাই অন্তত বলে দাও না কেন ?

এ ক'টি আয়াতে এসব প্রশ্নেরই সুন্দর জওয়াব দেয়া হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, কিয়ামাতের দিন-তারিখ জানাবার কোন দায়িত্ব রাসূলকে দেয়া হয় নি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো তা জানা নেই। কিয়ামাত যে অবশ্যই হবে এ বিষয়ে শুধু সাবধান করাই রাসূলের দায়িত্ব।

(৭) ৪৫-৪৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) কিয়ামাত ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক ও সজাগ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে জোর করে আখিরাতে বিশ্বাস করাবার দায়িত্ব রাসূলকে দেয়া হয় নি। এরপর যার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুক এবং পরকালের হিসাবের ভয় করে নিজের জীবনকে সংশোধন করুক। অবশ্য যখন সত্যিই হিসাবের দিন এসে যাবে, তখন এ অবিশ্বাসীরাই ভালভাবে অনুভব করবে যে, চিরস্থায়ী জীবনের কথা ভুলে দুনিয়ার সামান্য সময়ের জীবনকে নিয়ে মত্ত হয়ে থাকাটা কত বড় বোকামি হয়েছে। আখিরাতের স্থায়ী জীবনের সাথে তুলনা করে তারা নিজেরাই তখন বুঝতে পারবে যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনটা বা কবরে থাকার সময়টা সামান্য একটা সকাল বা বিকালের চেয়ে বেশী লম্বা ছিল না।

www.bjilibrary.com

সূরা আন্-নাযি'আত	سورة النّزعت
সূরা ঃ ৭৯ — মাক্কী যুগে নাযিল	مكية — رقمها : ٧٩
মোট আয়াত ঃ ৪৬ — মোট রুকু ঃ ২	اياتها : ٤٦ — ركوعها : ٢
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم

১. ঐ (ফেরেশতাদের) কসম, যারা ডুব দিয়ে টানে,	١- وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ
২. ও আস্তে করে বের করে নেয়।[1]	٢- وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ
৩-৪. (ঐ ফেরেশতাদের) কসম, যারা (মহাশূন্যে) দ্রুত সাঁতার কেটে চলে।[2] তারপর তারা (হুকুম পালনে) একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়।[3]	٣- وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ ٤- فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ
৫. এরপর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) সব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করে।[4]	٥- فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ
৬. যেদিন ভূমিকম্পের ধাক্কা কাঁপিয়ে তুলবে,	٦- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ
৭. এরপর আরো একটা ধাক্কা আসবে।	٧- تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ
৮. সেদিন কতক মন ভয়ে কাঁপতে থাকবে,	٨- قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ
৯. তাদের চাহনি ভীতি-কাতর হবে।	٩- اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ
১০. এরা বলে ঃ আমাদেরকে কি সত্যি আবার ফিরিয়ে আনা হবে,	١٠- يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ؕ
১১. যখন আমরা পচা-গলা হাড্ডিতে পরিণত হবো?	١١- ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ

১। মানে, ঐ ফেরেশতা যে মওতের সময় মানুষের শরীরের সব জায়গায় ঢুকে জানকে বের করে আনে।

২। মানে, আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য ফেরেশতারা এমন ব্যস্তভাবে চলে যেন তারা শূন্যে সাঁতার কাটছে।

৩। আল্লাহর হুকুমের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে যায়।

৪। এ ফেরেশতারা আল্লাহর বিশাল রাজ্যের কর্মচারী, যারা আল্লাহর আদেশমতো সবকিছুর ব্যবস্থা করে থাকে।

www.bjilibrary.com

১২. তারা বলতে থাকে, তাহলে এ ফিরে আসাটা তো বড় ক্ষতিকর হবে।[৫]	١٢- قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ
১৩. অথচ এটা (মাত্র এটুকু কাজ যে) একটা বড় রকমের ধমক আসবে।	١٣- فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ
১৪. তখনই ওরা খোলা ময়দানে হাযির হয়ে যাবে।	١٤- فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ
১৫. তোমার কাছে মূসার ঘটনার খবর কি পৌঁছেছে ?	١٥- هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ
১৬. যখন তার রব তাকে তুয়ার পবিত্র উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন ঃ	١٦- اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ
১৭. ফিরআউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।	١٧- اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ
১৮. তাকে জিজ্ঞেস কর, "তুমি কি পবিত্র হবার জন্য তৈরি আছ ?"	١٨- فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ
১৯. "আর আমি কি তোমার রবের দিকে তোমাকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করে চল ?"	١٩- وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ
২০. এরপর মূসা (ফিরআউনের কাছে গিয়ে) তাকে বড় প্রমাণ দেখালেন।[৬]	٢٠- فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ
২১. কিন্তু সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল ও অমান্য করল।	٢١- فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ

৫। মানে, যখন তাদের প্রশ্নের জওয়াবে বলা হলো যে, তোমাদেরকে ঠিকই ফিরিয়ে আনা হবে, তখন ঠাট্টা করে তারা একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগলো যে, "দোস্তরা! যদি সত্যি আমাদেরকে আবার জ্যান্ত করা হয়, তাহলে তো আমাদের খুবই বিপদ হবে দেখছি।"

৬। বড় প্রমাণ বা নিদর্শন মানে হলো, মূসা (আ.)-এর লাঠির অজগর সাপে পরিণত হওয়া। একথা কুরআন পাকের অনেক আয়াতে আছে।

www.bjilibrary.com

২২. অতঃপর সে চালবাজি করার মতলবে পেছনে হটল।	٢٢– ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝
২৩-২৪. তারপর লোকদেরকে জমা করে সে তাদের সম্বোধন করে বললঃ আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।	٢٣– فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝ ٢٤– فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝
২৫. অবশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন।	٢٥– فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝
২৬. আসলে যে (আল্লাহকে) ভয় করে,[৭] তার জন্য এতে রয়েছে বিরাট উপদেশ।	٢٦– اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

রুকু ঃ ২

২৭. তোমাদের পয়দা করা বেশি কঠিন ? না যে আসমান তিনি বানিয়েছেন (সেটা বেশি কঠিন কাজ) ?	٢٧– ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ ط بَنٰهَا ۝
২৮. তিনি এর ছাদ খুব উঁচু করেছেন ও এর মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন।	٢٨– رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ۝
২৯. এর রাত ঢেকে দিয়েছেন এবং এর দিন বের করেছেন।	٢٩– وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ۝

৭। মানে, আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার যে শাস্তি ফিরআউন পেয়েছে, সে রকম পরিণামের ভয় করে।

www.bjilibrary.com

৩০. এরপর তিনি জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।	٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝
৩১. এর ভেতর থেকে এর পানি ও উদ্ভিদজাত খাদ্য বের করেছেন।	٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝
৩২. আর এতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন।	٣٢- وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۝
৩৩. তোমাদের জন্য ও তোমাদের পালিত পশুর জন্য জীবিকা হিসাবে।	٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝
৩৪. অতঃপর যখন ঐ মহা ঘটনা ঘটবে,[৮]	٣٤- فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝
৩৫. যেদিন মানুষ যা কিছু করেছে সেসব কথা মনে করবে।	٣٥- يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝
৩৬. আর যে দেখবে তার সামনে দোযখ খুলে ধরা হবে।	٣٦- وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝
৩৭. কাজেই যে বিদ্রোহ করেছিল,	٣٧- فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝
৩৮. ও দুনিয়ার জীবনকে বেশি পছন্দ করেছিল,	٣٨- وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝
৩৯. একমাত্র দোযখই হবে তার ঠিকানা।	٣٩- فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۝
৪০. আর যে (আখিরাতে) নিজের রবের সামনে খাড়া হবার ভয় করেছিল ও নফসকে* অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল,	٤٠- وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

৮। এর মানে হলো কিয়ামত।

※ নাফস মানে প্রবৃত্তি। মানুষের দেহের দাবীগুলোকে 'নাফস' বা 'হাওয়া' শব্দে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। মানবদেহ খিদে লাগলে খাবার দাবী করে, শীত লাগলে গরম দাবী করে, যা সুন্দর তা-ই দেখতে চায়, মিষ্টি আওয়াজ শুনতে চায় এবং দুনিয়ায় যা কিছু ভোগ করার আছে সবই পেতে চায়। আল্লাহপাক মানুষকে বৈরাগী হতে বলেননি। দুনিয়ার সব ভোগের জিনিসকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরিকা অনুযায়ী ব্যবহার করাই ইসলামের বিধান। এর বিপরীত ইচ্ছা ও কামনা থেকে নাফসকে যারা ফিরিয়ে রাখে, তাদেরই ঠিকানা হবে বেহেশত।

www.bjilibrary.com

৪১. জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।	٤١- فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝
৪২. এরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, সেই সময়টি কখন এসে পৌঁছবে ?	٤٢- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝
৪৩. (হে রাসূল) ঐ সময়টা বলে দেয়া আপনার কী দরকার ?	٤٣- فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۝
৪৪. এ বিষয়ের জ্ঞান তো আপনার রব পর্যন্তই শেষ।	٤٤- اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۝
৪৫. যে এর ভয় করে শুধু তার জন্যই আপনি সাবধানকারী।	٤٥- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ۝
৪৬. যেদিন তারা এটা দেখতে পাবে, তাদের মনে হবে যে তারা (দুনিয়াতে অথবা মওতের পরে) একটা বিকাল বা একটা সকালের চেয়ে বেশি সময় থাকে নি।	٤٦- كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۝

সূরা আবাসা

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটিই এর নামের ভিত্তি।

নাযিলের সময় ঃ সূরার শুরুতেই যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস ও হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগের প্রাথমিক অবস্থায় নাযিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম।

আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় রিসালাত ও আখিরাত। এখানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-কে সঠিক নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং যারা দ্বীন কবুল করতে রাযী নয় আখিরাতে তাদের কি দশা হবে তা বলা হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ঃ নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক নবী ও রাসূল সমাজের নেতাদের দ্বীন কবুল করার দাওয়াত দিয়েছেন। প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরা যা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ তা সহজেই কবুল করে বলেই তারা নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাই বিশ্বনবী (সা.) মাক্কার নেতা ও গণ্যমান্য লোকদের ইসলাম কবুল করবার জন্য বুঝাচ্ছিলেন।

একদিন রাসূল (সা.) ওতবা, শায়বা, আবু জাহ্ল, উবাই-বিন-খালফ, উমাইয়া-বিন-খালফের মতো ইসলামের চরম বিরোধী নেতাদের যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতুম নামে রাসূল (সা.)-এর এক অন্ধ আত্মীয়, সেখানে হাযির হয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিরক্ত হলেন। অবশ্য রাসূল (সা.)-এর বিরক্তির অর্থ এটা নয় যে, তিনি বড়লোকদের গুরুত্ব বেশী দিতেন বা সাধারণ লোককে অবহেলা করতেন। তিনি অত্যন্ত আশা নিয়ে মাক্কার বড় বড় নেতাদের হিদায়াত করার চেষ্টা করছিলেন। ঐ সময় অন্য কেউ এসে কথা বললে বিরক্ত হওয়া দূষণীয় নয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় কোন লোক এসে অন্য কথা বলতে শুরু করলে বিরক্ত হবারই কথা।

আল্লাহ তা'আলা এ উপলক্ষে যে কথা সূরার পয়লা দশটি আয়াতে বলেছেন, তাতে পাঠক মনে করতে পারেন যে, এখানে রাসূল (সা.)-কে ধমক দেয়া হয়েছে। আসলে পরোক্ষভাবে এখানে ঐ কাফের সর্দারদের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্ পাক রাগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, যে সর্দাররা ইসলামের দুশমন-এরা হিদায়াত চায় না। আপনি এদেরকে এত দরদ দিয়ে বুঝাচ্ছেন অথচ এরা আপনাকে মানতে মোটেই রাযী নয়। যারা আপনার কাছে হিদায়াতের উদ্দেশ্যে আসে, তারা সাধারণ লোক হলেও আল্লাহর কাছে তাদের দামই বেশী। অবিশ্বাসী নেতাদের কোন মূল্য নেই।

ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ এক সাধারণ মানুষ হলেও তিনি হিদায়াতের আগ্রহ নিয়ে আসায় আল্লাহর কাছে তার মূল্য অনেক বেশী।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-১০ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা উপরের আলোচনায় এসে গেছে। এখানে আল্লাহ পাক রাসূলকে পরোক্ষভাবে উপদেশ দিচ্ছেন যে, হিদায়াত পেতে যারা চায়, তাদের জন্য আপনি সময় ও শ্রম খরচ করুন। যে সব নেতা অহংকারী, হঠকারী ও হকের

www.bjilibrary.com

দুশমন, তাদের হিদায়াত করার ক্ষমতা আপনাকে দেয়া হয় নি। ছোট ও বড়, নেতা ও সাধারণ লোক সবাইকেই দাওয়াত দিতে থাকুন। কিন্তু এ জাতীয় নেতাদের তোষামোদ করার দরকার নেই। তাদের যদি দ্বীনের প্রতি আগ্রহ না থাকে, তাহলে তাদের জন্যও দ্বীনের কোন প্রয়োজন নেই।

(২) ১১-১৬ আয়াতে রাসূল (সা.)-কে বলা হয়েছে, "আপনি যে কুরআন পেশ করছেন, তা সবার জন্য অবশ্যই মূল্যবান উপদেশ। আল্লাহ স্বয়ং ফেরেশতাদের পবিত্র হাতে এ কিতাব লিখিয়ে রেখেছেন, যা অতি সম্মানিত ও পবিত্র। এ উপদেশ যত মহামূল্যবানই হোক, যাকে ইচ্ছা তাকেই এ উপদেশ কবুল করতে বাধ্য করার কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা আপনাকে দেয়া হয় নি। আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, যার ইচ্ছা হয় সে কবুল করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করুক, আর যার ইচ্ছা আগ্রহ্য করে লানতের ভাগী হোক"।

(৩) ১৭-২০ আয়াতে আল্লাহ পাক কাফিরদের আচরণকে নিন্দা করে বলেছেন যে, যারা কুরআনের মতো উপদেশকে কবুল করতে অস্বীকার করে, তারা আসলে নিজেদেরই ধ্বংস করে। তারা কি একটু চিন্তা করে না যে, আল্লাহ পাক সামান্য বীর্যের পানি দিয়ে তৈরি করে তাদের মধ্যে এতসব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন ? তারপর তাদের ভাল ও মন্দ পথ চিনবার ক্ষমতা দিয়ে যে পথ ইচ্ছা সে পথই কবুল করা সহজ করে দিয়েছেন। তিনি কোন এক পথে চলার জন্য বাধ্য করেন নি। ইচ্ছার এ স্বাধীনতাটুকু দিয়েছেন বলেই কি আল্লাহর অবাধ্য হওয়া উচিত ? যে অবাধ্য হলো, সে প্রকৃতপক্ষে নিজকে ধ্বংসই করলো।

(৪) ২১-২৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যেটুকু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তা মৃত্যুর সাথে সাথেই খতম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর পর কবরে থাকতে বাধ্য করবেন, আবার যখন সময় হবে তাকে জীবিত করবেন। এ ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই। মরতে অস্বীকার করা, কবরে পড়ে থাকতে রাযী না হওয়া বা আবার জীবিত হতে আপত্তি করার কোন ক্ষমতাই তার থাকবে না।

এমন অসহায় মানুষ কোন্ সাহসে আল্লাহর হুকুম পালন করে না ? যে আল্লাহর হাতে তার হায়াত, মওত ও পুনরুত্থান, সে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কি লাভ হতে পারে ?

(৫) ২৪-৩২ আয়াতে ঐ কথাই বলা হয়েছে, যা সূরা নাবার ৬-১৬ আয়াতে ও সূরা নাযিয়াতের ২৭-৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে মানুষের চিন্তাশক্তির প্রতি আপীল করা হয়েছে এবং বিবেককে জাগাবার মতো আবেগপূর্ণ কথা বলা হয়েছে।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের যতরকম খাদ্য ও পানীয় দরকার, তার কতকগুলো উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মানুষ একটু খেয়াল করে দেখুক, যে মনিব এতসব নিয়ামাতের ব্যবস্থা করেছেন, তার অবাধ্য হওয়া কি বিবেক বিরোধী নয় ? যিনি এসব দিয়েছেন তিনি কি একদিন এটুকুও জিজ্ঞেস করবেন না যে, "আমার কথামতো দুনিয়ায় কাজ করেছ কি না ?"

(৬) ৩৩-৩৭ আয়াতে আখিরাতে একেবারে বাস্তব ছবি তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে যার যেমন খুশী চলার পর মৃত্যুর পরপারে হাশরের ময়দানের অবস্থা কেমন হবে এখানে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে বিবি-বাচ্চা, বাপ-মা ও ভাই-বন্ধুরা একে

www.bjilibrary.com

অপরের মহব্বতে অন্ধ হয়ে তাদের সুখ-সুবিধার জন্য অথবা তাদের দাবী পূরণের জন্য আল্লাহর অবাধ্য হয়। কিন্তু হাশরের ময়দানে এদের পারস্পরিক মহব্বত খতম হয়ে যাবে। সেখানে এরা একে অপর থেকে পালাবে। নিজের অবস্থা নিয়েই প্রত্যেকে এমন পেরেশান থাকবে যে, আর কারো কথা চিন্তা করার হুঁশই থাকবে না। বরং বিবি-বাচ্চার মতো নিকট আত্মীয়দের কারণে বিপদ বেড়ে যাবার ভয়ে সবাই সবার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে।

(৭) ৩৮-৪২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে সবার অবস্থা একরকম হবে না। দুনিয়ায় যেমন সবার অবস্থা একরকম ছিল না, সেখানেও একরকম হতে পারে না। এক ধরনের লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তাদের মুখে হাসি-খুশী লেগেই থাকবে এবং তাদেরকে খুবই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত মনে হবে। আর এক ধরনের লোকের চেহারা মলিন, কালিমাখা ও হতাশাগ্রস্ত থাকবে। বলা বাহুল্য, দুনিয়ায় যারা কাফির ও পাপী, তারা এখানে যত মজাই করে থাকুক এবং তাদের চেহারা যত সুন্দরই থাকুক হাশরে তাদের চরম দুর্দশা অবশ্যই হবে।

বিশেষ শিক্ষা

দুনিয়ার জীবনে মানুষ বিবি-বাচ্চা, বাপ-মা ও ভাই-বন্ধুদেরকে খুশী করার জন্য এবং তাদের সুখ-সুবিধার জন্য আল্লাহর কত আদেশ-নিষেধ অমান্য করে থাকে। অনেক সময় তাদের জন্য মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাও কুরবান করে দেয়। এসব ঘনিষ্ঠ লোকের মহব্বত এমন অন্ধ বানিয়ে দেয় যে, তাদের দুনিয়া বানাবার জন্য অনেকেই নিজেদের আখিরাতকে বরবাদ করে দেয়। হাদীসে এ জাতীয় লোকদেরকে সবচেয়ে দুর্ভাগা বলা হয়েছে।

এ সূরার ৩৩-৩৭ আয়াতে সাবধান হবার জন্য জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ঐ সব ঘনিষ্ঠ মহব্বতের পাত্র-পাত্রীদের আচরণ আখিরাতে কেমন হবে। বলা হয়েছে যে, যাদের সুখ-সুবিধার জন্য দুনিয়ায় হালাল-হারামের পরওয়া না করে কামাই-রোযগারে লিপ্ত রয়েছ, তারা আখিরাতে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে। তোমার হারাম কামাই খেয়ে তারা দুনিয়ায় যত সুখ-সুবিধাই ভোগ করে থাকুক, আখিরাতে তারা কেউ তোমার পাপের ভাগী হতে রাযী হবে না।

এ সূরার পরের সূরা আল-ইনশিক্বাকের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, নেক লোক যখন তার আমলনামা ডান হাতে পাবে, তখন সে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে খুশী প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে যারা নেক, তারা আখিরাতে একে অপর থেকে পালিয়ে বেড়াবে না, বরং একে অপরকে দেখে খুশী হবে। কিন্তু যারা পাপী, তারা সবাই একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে। তারা ভয় করবে যে, না জানি তার বাপ-ভাইদের পাপের বোঝা তার মাথায়ও এসে পড়ে।

www.bjilibrary.com

সূরা আবাসা

سورة عبس

সূরা ঃ ৮০ | মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৪২ | মোট রুকু ঃ ১

رقمها : ٨٠ | مكية

ركوعها : ١ | اياتها : ٤٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (রাসূল সা.) ভ্রূ কুঁচকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন ও মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

২. এ কারণে যে, ঐ অন্ধ লোকটি তার কাছে এসে গেছে।[১]

৩. আপনি কী জানেন ? হয়ত সে শুধরে যাবে,

৪. অথবা উপদেশ কবুল করবে। ফলে উপদেশ তার জন্য উপকারী হবে।

৫. যে বেপরোয়া ভাব দেখায়,

৬. তার দিকে তো আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন।

৭. অথচ সে না শুধরালে আপনার উপর এর কী দায়িত্ব আছে ?

৮. আর যে আপনার কাছে ছুটে আসে,

৯. এবং ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে,

১০. তার প্রতি আপনি অমনোযোগী হচ্ছেন।

১১. কক্ষনো নয়,[২] নিশ্চয়ই এ (কুরআন) তো একটি উপদেশ।

١- عَبَسَ وَ تَوَلّٰى ۙ

٢- اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى ؕ

٣- وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ۙ

٤- اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ؕ

٥- اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ

٦- فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ؕ

٧- وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ؕ

٨- وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ۙ

٩- وَهُوَ يَخْشٰى ۙ

١٠- فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

١١- كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ

১। পরের কতক আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, স্বয়ং রাসূল (সা.)-ই বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এখানে যে অন্ধের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর ফুফাত ভাই হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)। সে সময় রাসূল (সা.) মাক্কায় বড় বড় সর্দারদের নিকট দ্বীন ইসলামের দাওয়াত পেশ করায় ব্যস্ত ছিলেন। এ অবস্থায় ঐ অন্ধ ব্যক্তি এসে কতক প্রশ্ন করতে চাইলেন। এভাবে রাসূলের কাজে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হলেন।

২। মানে, কক্ষনো এ ধরনের কাজ করবেন না। যারা আল্লাহকে ভুলে আছে এবং দুনিয়ার মান-মর্যাদা নিয়ে গর্বে ফুলে আছে, তাদেরকে বিনা প্রয়োজনে গুরুত্ব দিবেন না। তাদের সাথে আপনার ব্যবহারে যেন তাদের এমন ধারণা না হয় যে, এরা ইসলাম কবুল না করলে আপনার কোন স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাবে। ইসলামের শিক্ষা এমন মূল্যহীন নয় যে, যারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাদেরকে তোয়াজ করতে হবে। যারা সত্যের ধার ধারে না, সত্যও তাদের পরওয়া করে না।

সূরা ঃ ৮০ আবাসা পারা ৩০	سورة : ٨٠ عبس الجزء : ٣٠
১২. যার ইচ্ছা হয়, সে তা গ্রহণ করুক।	١٢- فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ ۝
১৩. এটা এমন সব বইতে লেখা আছে, যা সম্মানিত,	١٣- فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝
১৪. উচ্চ মর্যাদাবান পবিত্র[৩]।	١٤- مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝
১৫-১৬. এটা সম্মানিত সৎ লেখকদের হাতে থাকে।[৪]	١٥- بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝
	١٦- كِرَامٍ ۢبَرَرَةٍ ۝
১৭. লা'নত[৫] হোক মানুষের উপর, সে কত বড় সত্য অস্বীকারকারী!	١٧- قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ ۝
১৮. তাকে আল্লাহ্ কোন জিনিস থেকে পয়দা করেছেন ?	١٨- مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝
১৯. বীর্যের একটি ফোঁটা থেকে তাকে তৈরি করেছেন, তারপর তার তাকদীর* ঠিক করেছেন।	١٩- مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝
২০. এরপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন।	٢٠- ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

৩। মানে, সব রকম ভেজাল থেকে পাক। এতে বিশুদ্ধ হক পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বাতিল বা ভ্রান্ত চিন্তা, মত ও পথ এতে শামিল হতে পারেনি।

৪। এখানে ঐ সব ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর সরাসরি হিদায়াত অনুযায়ী কুরআনের হিফাযত করা ও রাসূল (সা.)-এর নিকট ঠিক মতো পৌঁছাবার দায়িত্ব পালন করেন।

৫। এখান থেকে কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা হচ্ছে। এর আগে ১৬টি আয়াতে রাসূলকে সম্বোধন করে বলা হলেও তাতে কাফিরদের প্রতি পরোক্ষ ধমক ছিল। তাতে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল, যারা সত্য তালাশ করে, তাদের দিকে মনোযোগ দিন। ঐসব সত্যের দুশমন কুরআনের মূল্য কি বুঝবে?

(*) শিশু মায়ের পেটে থাকাকালেই ঠিক করে দিয়েছেন যে, তার লিংগ কী হবে, কোন্ রং-এর হবে, কতটা লম্বা ও মোটা হবে, তার হাত, পা, চোখ, কান কতটা ঠিক মতো তৈরি করা হবে, আর কোন্ কোন্টা কি পরিমাণ বিকল বানানো হবে, এর আকৃতি কিরূপ হবে, এমনকি এর গলার আওয়াজ কেমন হবে, এর দৈহিক শক্তি ও মগযের ক্ষমতা কতটা হবে, কোন্ দেশে ও কী পরিবেশে সে পয়দা হবে এবং লালিত-পালিত হবে, দুনিয়ায় কী দায়িত্ব পালন করবে, কদ্দিন দুনিয়ায় থাকবে। যে আল্লাহর হাতে এসব কিছু করার ক্ষমতা, সে মহা শক্তিশালীকে অস্বীকার করে এবং তাঁর হুকুম অমান্য করে সে কেমন করে সফলতা লাভ করবে ?

www.bjilibrary.com

সূরা ঃ ৮০ আবাসা পারা ৩০	سورة : ٨٠ عبس الجزء : ٣٠
২১. অতঃপর তাকে মওত দিয়েছেন, তারপর কবরে পৌঁছিয়েছেন।	٢١- ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۙ○
২২. এরপর যখন তিনি চান তাকে আবার জীবিত করবেন।	٢٢- ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ؕ○
২৩. কক্ষনো নয়, আল্লাহ তাকে যে (কর্তব্য পালনের) হুকুম দিয়েছিলেন, তা সে পালন করেনি।	٢٣- كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ ؕ○
২৪. মানুষ তার খাবারের দিকে একটু চেয়ে দেখুক।	٢٤- فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ۙ○
২৫. আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি।[৬]	٢٥- اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ○
২৬. তারপর আমি অদ্ভুতভাবে মাটিকে ফাটিয়ে দিয়েছি।	٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ○
২৭-৩১. তারপর এতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আংগুর ও তরি-তরকারি এবং যায়তুন ও খেজুর, আর ঘনঘন বাগ-বাগিচা, ফলমূল ও উদ্ভিদজাত খাদ্য,	٢٧- فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ○
	٢٨- وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ○
	٢٩- وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ○
	٣٠- وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ○
	٣١- وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ○
৩২. (এসব পয়দা করেছি) তোমাদের জন্য ও তোমাদের পালিত পশুর জন্য জীবিকা হিসাবে।	٣٢- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ○

৬। এর মানে হলো বৃষ্টি।

সূরা ঃ ৮০ আবাসা পারা ৩০	سورة : ٨٠ عبس الجزء : ٣٠
৩৩-৩৬. অবশেষে যখন সেই কানে তালা লাগিয়ে দেবার মতো আওয়াজ আসবে[৭], সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে।	٣٣- فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝ ٣٤- يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝ ٣٥- وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝ ٣٦- وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝
৩৭. সেদিন তাদের এক এক জনের উপর এমন (কঠিন) সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া কারো খবর থাকবে না।	٣٧- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝
৩৮-৩৯. সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল, হাসি-খুশি ও সন্তুষ্ট-প্রফুল্ল থাকবে।	٣٨- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ٣٩- ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝
৪০. আর কতক চেহারা সেদিন ভীষণ ধূলি-মলিন থাকবে।	٤٠- وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝
৪১. থাকবে কলংক-কালিমায় ঢাকা।	٤١- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝
৪২. এরাই কাফির ও দুষ্কৃতকারী পাপী।	٤٢- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

৭। এখানে শেষ বারের মতো শিংগায় ফুঁ দেয়ার ভীষণ আওয়াজের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে সব মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তাকভীর

নাম ঃ পয়লা আয়াতের কুভ্‌ভিরাত ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্য পদ দ্বারাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরার আলোচনা ধারা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে মনে হয় যে সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম ভাগে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ প্রথম ১৪টি আয়াতে কিয়ামাত ও আখিরাত এবং বাকী অংশে রিসালাতই মূল আলোচ্য বিষয়।

নাযিলের পরিবেশ ঃ যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী তিনটি সূরা নাযিল হয়েছে এ সূরাটির পরিবেশও তা-ই।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৬ আয়াতে কিয়ামাতের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ হবে এর একটা ধারণা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে যখন কিয়ামাতের সূচনা করা হবে, তখন সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা ও পাহাড়-পর্বত নদী-নালার কী অবস্থা হবে তার একটি ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

(২) ৭-১৪ আয়াতে কিয়ামাত ও আখিরাতের দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মৃত্যুর পর আবার যখন মানুষকে জীবিত করা হবে, আমলনামা খুলে দেয়া হবে, দোযখ ও বেহেশত সবার সামনে হাযির করা হবে, তখনকার অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, সেদিন সবাই বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ার জীবনে কে কি করে এসেছে। দুনিয়ায় থাকাকালে যারা আখিরাতের ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয়নি, সেদিন তারা টের পাবে যে, কত বড় ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তখন টের পাওয়া দ্বারা কোন লাভ হবে না।

(৩) ১৫-২৫ আয়াতে রিসালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথমেই ডুবে যাওয়া তারা, বিদায় হওয়া রাত ও সকাল বেলার কসম খেয়ে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.) থেকে কুরআনের যে বাণী পেয়েছেন, তা রাতের অন্ধকারে স্বপ্নে পাওয়া নয়। তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে দিনের আলোতে সজাগ অবস্থায় স্পষ্টভাবে আকাশে দেখেছেন। আর যে ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী নিয়ে আসেন, তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর কাছেও মর্যাদার অধিকারী এবং সমস্ত ফেরেশতা তারই হুকুম মেনে চলে।

জিবরাঈল (আ.)-এর মর্যাদার উল্লেখ করার পর রাসূল (সা.)-এর প্রচারিত কুরআনের বাণীর দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে লজ্জা দিয়ে বলা হয়েছে, "রাসূল (সা.) তোমাদের নিকট আল্লাহর যে বাণী পৌঁছাচ্ছেন, তা যে কত মূল্যবান, তা বুঝবার জন্য তোমরা যদিও প্রস্তুত নও, তবু এটুকু বুদ্ধি তো তোমাদের থাকা উচিত ছিল যে, এমন উপদেশ ও জ্ঞানময় কথা কোন

www.bjilibrary.com

পাগলের প্রলাপ হতে পারে না বা শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে পারে না।” অথচ তোমরা তা-ই বলে বেড়াচ্ছ।

(৪) ২৬-২৯ আয়াতে অবিশ্বাসীদের বিবেককে চাবুক মেরে আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করছেন, “কুরআনের এমন মূল্যবান উপদেশ থেকে পালিয়ে কোথায় যাচ্ছ? গোটা বিশ্বের সবার জন্য যে উপদেশ পাঠানো হয়েছে, তা কবুল না করে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোথায় যাচ্ছ? আসলে তোমরা সত্য পথে চলতেই চাও না। তোমাদের মধ্যে যারা সরল মযবুত পথে চলতে চায়, তারা এ উপদেশ মতো চলে যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হচ্ছে তা কি দেখতে পাচ্ছ না?

এর চেয়ে আরও বড় সত্য কথা হলো, হিদায়াত যদি তোমরা পেতেও চাও, তবু তা পাবে না। যে পর্যন্ত আল্লাহ তা পছন্দ না করেন। তোমরা যে ব্যবহার রাসূলের সাথে করছ, তাতে আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত না পাওয়ার ফায়সালা করে দিতে পারেন। এখনও সময় আছে, তোমাদের নিয়্যত ও ইচ্ছাকে পবিত্র করে নাও। তাহলে হয়তো হিদায়াত পেয়ে যাবে।

তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহর ইচ্ছাই আসল। যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। তোমরা শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করতে পার। সফলতা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তোমরা কুরআনের অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখার যত ইচ্ছাই রাখ এবং এর জন্য যত চেষ্টাই কর আমি রাসূলকে কামিয়াব করার ইচ্ছা করলে তোমাদের ইচ্ছা কিছুতেই তা ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। তাই এ ব্যর্থ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছেড়ে সত্যকে কবুল করে নাও।

বিশেষ শিক্ষা

“আল্লাহর ইচ্ছার উপর কারো ক্ষমতা নেই।”

সূরাটির শেষ আয়াতে একটি বিরাট ও গভীর বিষয়কে ছোট্ট এক কথায় প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা মোটেই অবাধ নয়। মানুষ যত ইচ্ছাহ করুক, তা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া পূরণ হতে পারে না। মানুষ যে উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করুক, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার কোন চেষ্টাই সফল হতে পারে না।

মানুষ যে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং যে উদ্দেশ্যে সে চেষ্টা করে, তা আল্লাহর মরযীর বিপরীত হলেও আল্লাহ সাধারণত তাতে বাধা দেন না। কারণ, তিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ দু'দিকেই চলবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু এ স্বাধীনতা এমন নয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাতে বাধা দিতে পারেন না। মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে তিনি চলতে দেন। কিন্তু যখনই সে ঐ শেষ সীমা পার হতে চায়, তখনই তিনি বাধা দেন। আর আল্লাহ যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন আর কোন শক্তি এতে বাধা দিতে পারে না।

তাই কারো এমন ধারণা করা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয় যে, সে যত মন্দই করুক তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকেই যে ধারণা দেয়া হয়েছে এর বিপরীত পথে চলার চেষ্টা করা একেবারেই বোকামি। আল্লাহকে টেক্কা মেরে যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা যে কারোই নেই, সে কথা মনে রাখাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তাকভীর	سورة التكوير
সূরা ঃ ৮১ — মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ٨١ — مكية
মোট আয়াত ঃ ২৯ — মোট রুকু ঃ ১	ركوعها : ١ — اياتها : ٢٩
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে।[১]	١- اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○
২. যখন তারাগুলো ছড়িয়ে পড়বে।	٢- وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ○
৩. যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে।	٣- وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ○
৪. যখন দশ মাসের গাভীন উটকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে।[২]	٤- وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ○
৫. যখন সব বন্য পশুকে এক সাথে জমা করা হবে।	٥- وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ○
৬. যখন সমুদ্রগুলোয় আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।	٦- وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ○
৭. যখন রূহকে (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।[৩]	٧- وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ○
৮. যখন জ্যান্ত কবর দেয়া মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ	٨ - وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ○
৯. কোন দোষে তাকে মারা হয়েছিল?	٩ - بِاَىِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ○
১০. যখন আমলনামা খুলে দেয়া হবে।	١٠- وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ○

১। মানে, যে আলো সূর্য থেকে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, ঐ আলোকে আর ছড়াতে না দিয়ে সূর্যের উপরই গুটিয়ে ফেলা হবে।

২। আরববাসীদের নিকট ঐ উটের চেয়ে কোন মালই বেশী মূল্যবান ছিল না, যে উটের বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে। এ অবস্থায় উটের খুব বেশী যত্ন নেয়া হয় এবং এর হিফাযত করা হয়। দশ মাসের গাভীন উটের দিকে মনোযোগ না দিয়ে এভাবে "ছেড়ে দেয়া হবে" বলার মানে হলো মানুষ এমন কঠিন বিপদে পড়বে যার ফলে প্রিয়তম মালের যত্ন নেবার মত হুঁশ-জ্ঞানও তখন থাকবে না।

৩। মানে, মানুষকে নতুনভাবে তেমনি জীবিত করা হবে, যেমন দুনিয়ায় মরার আগে শরীরের সাথে রূহও যিন্দাহ ছিল।

১১. যখন আসমানের পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে।	١١- وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝
১২. যখন দোযখের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে।	١٢- وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝
১৩. যখন বেহেশতকে কাছে আনা হবে।	١٣- وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কী নিয়ে হাযির হয়েছে।	١٤- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝
১৫-১৬. না[৪], আমি কসম খাচ্ছি ফিরে আসা ও	١٥- فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝
লুকিয়ে যাওয়া তারাগুলোর।	١٦- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝
১৭. আর রাতের, যখন সে বিদায় হলো।	١٧- وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝
১৮. এবং ভোরের, যখন সে শ্বাস নিলো।	١٨- وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝
১৯. নিশ্চয়ই এটা একজন সম্মানিত বাণী বাহকের (জিবরাঈল আ.) কথা।[৫]	١٩- اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝
২০. যিনি খুব শক্তিশালী ও আরশের মালিকের নিকট বড় মর্যাদার অধিকারী।	٢٠- ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝
২১. সেখানে তার হুকুম মানা হয়[৬] এবং তিনি আস্থাভাজন।	٢١- مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝

৪। কুরআনে যা কিছু বলা হয়েছে, তা কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুপরামর্শ বলে তোমরা যে ধারণা করছ, তা কক্ষনো সঠিক নয়।

৫। এখানে সম্মানিত রাসূল অর্থ জিবরাঈল (আ.) যিনি আল্লাহর বাণী বহন করে আনেন। কুরআনকে ঐ "বাণীবাহকের কথা" বলা অর্থ এ নয় যে, এটা ঐ বাহকের বাণী। বাণীবাহক (পয়গামবার) বা রাসূল বলার মানেই হলো, কুরআন ঐ মহান সত্তার বাণী, যিনি বাহক হিসাবে জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠিয়েছেন।

৬। মানে, তিনি ফেরেশতাদের সরদার। সকল ফেরেশতা তাঁর হুকুম মতোই কাজ করে।

٢٢- وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُوْنٍ ۚ

২২. (হে মাক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সাথীটি পাগল নন,[৭]

٢٣- وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ

২৩. তিনি তাকে (জিবরাঈল আ.-কে) আলোময় আকাশে দেখেছেন।

٢٤- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ

২৪. আর তিনি গায়েবের (ঐ ইলমকে মানুষের কাছে পৌঁছাবার) ব্যাপারে কৃপণ নন।

٢٥- وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ

২৫. এটা কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।

٢٦- فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ؕ

২৬. তাহলে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?

٢٧- اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ

٢٨- لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ؕ

২৭-২৮. এই (কুরআন) তো সারা জাহানের জন্য একটা উপদেশ, (বিশেষ করে) তোমাদের মধ্যে ঐ ধরনের প্রত্যেকটি লোকের জন্য, যে সঠিক পথে চলতে চায়।

٢٩- وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

২৯. আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন না চাওয়া পর্যন্ত তোমাদের চাওয়াতে কিছুই হয় না।

৭। এখানে সাথী মানে রাসূল (সা.), যিনি মাক্কাবাসীদের একজন হিসাবে তাদেরই সঙ্গী-সাথী ছিলেন।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ইনফিতার

নাম ঃ সূরার পয়লা আয়াতের 'ইনফাতারাত' ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্য পদের শব্দ দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার ধরনের সাথে সূরা তাকভীরের খুব ঘনিষ্ঠ মিল দেখে মনে হয় যে, এ দুটো সূরা কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ এর আলোচ্য বিষয় কিয়ামাত ও আখিরাত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ কিয়ামাতের দিনের দৃশ্যকে এমনভাবে দেখতে চায় যেমন নিজের চোখে দেখা যায়, তাহলে সে সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিক্বাক পড়ুক।

নাযিলের পরিবেশ ঃ সূরা নাবা থেকে এ সূরাটি পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, প্রায় একই ধরনের পরিবেশে এ সূরাটিও নাযিল হয়েছে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে কিয়ামাতের প্রাথমিক অবস্থার অতি সংক্ষিপ্ত একটা ছবি আঁকা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, গ্রহ-উপগ্রহে সুন্দর করে সাজানো এ পৃথিবীকে ভেঙ্গে দিয়েই কিয়ামাতের সূচনা করা হবে।

(২) ৪ ও ৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আবার যখন সব মানুষকে জীবিত করে কবর থেকে উঠিয়ে আনা হবে, তখন তাদের দুনিয়ার জীবনের সব কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। তারা নিজেরা জীবিতকালে ভাল-মন্দ যা করেছে, তাও যেমন দেখানো হবে, তেমনি তাদের মৃত্যুর পর তাদের ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দুনিয়ায় যা কিছু ফলাফল হয়েছে, তাও দেখানো হবে।

(৩) ৬-৮ আয়াতে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তুলবার জন্য অতি দরদের সাথে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, "হে মানুষ! তোমাদের যে মহান দয়ালু মনিব জীবের সেরা বানিয়ে তোমাদেরকে এমন সুন্দর শারীরিক আকৃতি ও মানসিক গুণাবলী দান করেছেন, তিনি এসবের একদিন হিসাব নেবেন এবং তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সব কাজ-কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি দেবেন, সে কথা কেমন করে তোমরা ভুলে আছো। কে ঐ মনিবের কথা ভুলিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে?"

(৪) ৯-১২ আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক নিজেই এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে বলেছেন, "আখিরাতের যে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে, সে কথাকে মিথ্যা মনে করার ফলেই তোমরা ধোঁকায় পড়েছো। ঐ কথা সত্য মনে করলে কিছুতেই বিবেকের বিরুদ্ধে এভাবে কাজ করতে পারতে না।" এরপর ১০-১২ আয়াতে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "তোমরা মনে করো না যে, তোমরা যা করে বেড়াচ্ছ এর কোন রেকর্ড রাখা হচ্ছে না। আল্লাহর নিযুক্ত সম্মানিত ফেরেশতারা সব কিছুই লিখে রাখছেন।"

www.bjilibrary.com

(৫) ১৩-১৬ আয়াতে খুবই জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সৎ লোকেরা অবশ্যই চিরদিন নিয়ামতের মধ্যে থাকবে এবং বদ লোকেরা আযাবই পেতে থাকবে। শেষ বিচারের পর থেকে এরা চিরকাল এমন দোযখে থাকতে বাধ্য হবে, যেখান থেকে কোথাও পালিয়ে যাবার কারো সাধ্য থাকবে না।

(৬) ১৭-১৯ আয়াতে বিচার দিনের ভয়াবহ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। দুনিয়ায় যে যত দাপটই দেখাক এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যে যত চালাকীই করুক, আখিরাতের আদালতে কাউকে বাঁচাবার শক্তি কারো থাকবে না। সেদিন সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই থাকবে। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই থাকবে।

বিশেষ শিক্ষা

"মানুষের কর্মজীবন কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী।"

৫নং আয়াতে এক বিরাট বিষয়কে একটি ছোট্ট আয়াতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষ আগে কী করেছে ও পরে কী করেছে তা কিয়ামাতে জানতে পারবে। আমলনামা যখন হাতে দেয়া হবে, তখন সবাই বিস্মিত হয়ে বলবে যে, আমার হিসাবে এত আমল কোথা থেকে এলো ? যারা নেক আমল করেছে, তারাও যেমন আশ্চর্য হবে, তেমনি অপরাধীরাও পেরেশান হয়ে বলবে যে, হায় আল্লাহ! এত পাপ তো করিনি ? এতগুলো কেন আমাদের নামে লেখা হলো ?

আল্লাহর পক্ষ থেকে নেক ও বদ সবাইকে জানানো হবে যে, তোমরা নিজেরা এত কিছু করনি এ কথা ঠিকই। কিন্তু তোমাদের চেষ্টায় অন্যরা যা করেছে, তোমাদেরকে যারা অনুকরণ করেছে এমনকি তোমাদের মত ও পথ পছন্দ করে যারা সে অনুযায়ী চলেছে, তাদের সবাই যে-সব আমল করেছে, সে-সবও তোমাদের আমলনামায় জমা হয়েছে। তোমাদের কাজের জের কিয়ামাত পর্যন্ত যতদিন চলেছে, তা তোমাদের হিসাবে লেখা হয়েছে।

এ থেকে বুঝা গেল যে, মানুষ মরে গেলেই তার আমলের হিসাব শেষ হয়ে যায় না। কিয়ামাত না আসা পর্যন্ত মানুষের কাজের হিসাব চূড়ান্ত হয় না (Account Close হয় না)। কারণ, মানুষের কাজের জের চলতেই থাকে। হিটলারের মতো লোকের অপকর্মের জের শত শত বছর পর্যন্ত চলাই স্বাভাবিক। ফিরআউন ও নমরূদের দুষ্কৃতির জের এখনও চলছে।

তাই মানুষ জীবিত থাকাকালে যা করে শুধু এর ভিত্তিতে তার বিচার হওয়া যথেষ্ট নয়। ইনসাফের দাবী এটাই যে, সে যা করেছে তার জের যতদিন চলবে, ততদিনই তার আমল জারী আছে বলে গণ্য হবে। অবশ্য আমলে জারিয়া ভাল ও মন্দ দু'রকমই হতে পারে। রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম যে নেক আমল করেছেন, তার জের এখনও চলছে এবং আরও চলবে। তাই তাঁদের আমলনামায় নেক আমলের হিসাব বেড়েই চলছে।

ঐ আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, আখিরাতেই মানুষ জানতে পারবে যে, সে দুনিয়ায় থাকাকালে কী কী কাজ করেছে এবং তার মৃত্যুর পর তার কাজের জের হিসাবে আরও কী কী কাজ করেছে বলে হিসাবে ধরা হয়েছে। তাই প্রত্যেক কাজ করার সময় এ বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকাই যুক্তি ও বুদ্ধির দাবী।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ইনফিতার

সূরা ঃ ৮২ | মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ১৯ | মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. যখন আসমান ফেটে যাবে।

২. যখন তারাগুলো ছড়িয়ে পড়বে।

৩. যখন সমুদ্র ফাটিয়ে দেয়া হবে।

৪. যখন কবরগুলো খুলে দেয়া হবে।[১]

৫. তখন প্রত্যেক মানুষ আগে ও পরে যা কিছু করেছে, তা জানতে পারবে।

৬. হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমার ঐ মহান মর্যাদাশালী রবের ব্যাপারে তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে?

৭. যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন, তোমাকে ভালভাবে গঠন করেছেন ও তোমাকে সুষম করেছেন।

৮ তোমার রব যে আকারে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন।

৯. কক্ষনো নয়[২], বরং (আসল কথা হলো) তোমরা শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা বলছ।[৩]

سورة الانفطار

مكية | رقمها : ٨٢

اياتها : ١٩ | ركوعها : ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ

٢- وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ

٣- وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ

٤- وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ

٥- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۗ

٦- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ

٧- الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۙ

٨- فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۗ

٩- كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ

১। কবর খুলে দেবার মানে হলো মানুষকে আবার জীবিত করে উঠানো।

২। অর্থাৎ এমন ধোঁকায় পড়ার কোন যুক্তি নেই।

৩। মানে, যে কারণে তোমরা ধোঁকায় পড়েছ, তা কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নয়। বরং দুনিয়ার পর এর বদলা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই বলে তোমরা এক নিছক আহাম্মকী ধারণায় রয়েছ। এ ভুল ও ভিত্তিহীন অনুমানই তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে, তাঁর বিচার থেকে নির্ভয় করে দিয়েছে এবং নৈতিক আচরণে দায়িত্ববোধহীন করে ছেড়েছে।

www.bjilibrary.com

১০. অথচ তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত আছে।	١٠- وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ
১১. এমন সব সম্মানিত লেখক,	١١- كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ
১২. যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জানে।	١٢- يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ
১৩. নিশ্চয়ই সৎ লোকেরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকবে।	١٣- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۚ
১৪. আর অবশ্যই বদ লোকেরা দোযখে যাবে।	١٤- وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۚ ۖ
১৫. প্রতিদান (বদলা) দেবার❖ দিন তারা তাতে ঢুকবে।	١٥- يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ
১৬. সেখান থেকে তারা মোটেই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।	١٦- وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ؕ
১৭. আর প্রতিদান দেবার দিনটি সম্বন্ধে তুমি কী জান ?	١٧- وَمَاۤاَدْرٰكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ ۙ
১৮. আবার বলছি, প্রতিদান দেবার দিনটি সম্পর্কে তুমি কী জান ?	١٨- ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ
১৯. এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফায়সালার❖ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে।	١٩- يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۗ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۚ

❖ আরবি 'দীন' শব্দের ঐ অর্থই এখানে হবে, যে অর্থে সূরা ফাতিহায় 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' বলা হয়েছে। 'ইয়াওম' শব্দের বাংলা হলো দিন। ইয়াওমুদ্দীন অর্থ বিচার দিবস। ঐ দিন ভাল-মন্দ সব কাজেরই বদলা দেয়া হবে। তাই ঐ দিনটিকে বদলা দেবার দিনও বলা হয়।

❖ 'আমর' মানে বিষয় এবং হুকুম। অর্থাৎ ঐ দিন সব বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে থাকবে এবং একমাত্র আল্লাহর হুকুমই সেখানে চলবে।

সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন

নাম ঃ পয়লা আয়াতের মুতাফ্‌ফিফীন শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরার শেষাংশের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের ঐ সময় এ সূরাটি নাযিল হয়, যখন হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে ও বৈঠকাদিতে ঈমানদারদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ চলছিল এবং তাদেরকে দেখলেই নানারকম মন্তব্য করে মুসলিমদেরকে সমাজে হাসির পাত্রে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয় ঃ এর আলোচ্য বিষয়ও আখিরাত।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে ঐ সময়কার ব্যবসায়ী সমাজে প্রচলিত বেঈমানীর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। যারা দেবার সময় মাপে কম দেয়, আর নেবার সময় বেশী নেবার চেষ্টা করে, তাদেরকে এখানে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। কারণ, সমাজ বিরোধী কাজের দীর্ঘ তালিকায় মাপে কম-বেশী করাটা একটা বড় রকমের জঘন্য কাজ।

(২) ৪-৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মাপে কম-বেশী করা এবং অন্যান্য সমাজ বিরোধী কাজের আসল কারণ হলো আখিরাতে অবিশ্বাস। মরার পর কোথাও হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস থাকলে এ জাতীয় কাজ করা অসম্ভব। অবশ্য ব্যবসার উন্নতির খাতিরে পলিসি বা নীতি হিসাবে অনেকে সততার পরিচয় দেয়। কিন্তু যদি দুর্নীতি করে সারা যাবে বলে মনে করে, তাহলে আর সততার ধার ধারে না। সত্যিকার সততা এবং স্থায়ী সততা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মনে আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় থাকে।

(৩) ৭-১৭ আয়াতে অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ৪-৬ আয়াতে আখিরাতের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে মানুষের চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জোর দিয়ে বলার পর এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, চরিত্রহীন লোকদের আমলনামা সৎলোকদের আমলনামার সাথে রাখা হবে না। অসৎ লোকদের রেজিষ্টারেই (Black-List) তাদের নাম থাকবে এবং তাদের রেকর্ডপত্রের দফতর আলাদাই হবে।

সততা ও অসততা সম্পর্কে আল্লাহ পাক যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন, যারা ঐ বিধি-নিষেধের ধার ধারে না, সেই পাপীদের সম্পর্কে ১১ ও ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, একমাত্র আখিরাতে বিশ্বাস না থাকার কারণেই এদের চরিত্র এমন হয়েছে। ১৩ ও ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআনের আয়াতকে যে ওরা পুরনো কাহিনী বলে উড়িয়ে দিচ্ছে এর আসল কারণও ঐ পাপী মন। আল্লাহর এক একটি নাফরমানী তাদের মনে যে কালিমা পয়দা করে তার ফলে তাদের দিলে মরিচা ধরে গেছে। আখিরাতে এর কী পরিণাম হবে, তা ১৫-১৭ আয়াতে বলা হয়েছে।

(৪) ১৮-২৮ আয়াতে সৎ ও নেক লোকদের সাথে আখিরাতে কেমন ব্যবহার করা হবে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১৮-২১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা সম্মানিতদের

www.bjilibrary.com

রেজিষ্টারভুক্ত থাকবে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতারা এর পাহারাদার থাকবে। এরপর ২২-২৮ আয়াতে তাদের উপর আল্লাহর অগণিত নিয়ামাতের কয়েকটি উল্লেখ করে মানুষকে ২৬ আয়াতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উচিত এ সব নিয়ামাতের জন্য প্রতিযোগিতা করা। মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হাসিল করার জন্য একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যেতে ব্যস্ত হয়। অথচ পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের নিয়ামাত লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা করাই তাদের উচিত।

(৫) ২৯-৩৩ আয়াতে দেখানো হয়েছে, অনৈসলামী সমাজে আল্লাহর দুশমনরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করে থাকে। এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রূপ করে এবং ঈমানদারকে খুব অতিষ্ঠ করে ফিরে যাবার সময় খুব মজা ও তৃপ্তি বোধ করে। আর যখনই কোন মুসলিমের দেখা পায়, তখনই মন্তব্য করে যে, এরা একেবারেই ভুল পথে আছে। ৩৩ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঠাট্টা করে বলেছেন যে, আমি তো এদেরকে ঈমানদারদের ওপর ইন্সপেক্টার বানিয়ে পাঠাই নি। ইসলামী আন্দোলনের পথ ভুল কি না, সে বিষয়ে ফতোয়া দেবার কোন দায়িত্ব এদেরকে আমি দেই নি।

(৬) ৩৪-৩৬ আয়াতে কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে বিরক্ত, আহত ও মযলুম মুসলিমদেরকে শক্তি, সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিদ্রূপের প্রতিশোধ নেবার সময় আসবে আখিরাতে। তখন ঈমানদাররা কাফিরদের অবস্থা দেখে হাসবেন। তারা বেহেশতের নিয়ামাতের মধ্যে থেকে দোযখে কাফিরদের অবস্থা দেখে মনে মনে বলবেন, 'দুনিয়ায় কাফিররা আমাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে আজ তারা এর কি বদলাই না পেলো।' এভাবে ঈমানদাররা দুনিয়ায় কাফিরদের কারণে মনে যে ব্যথা পেয়েছিল, তা দূর হবে।

বিশেষ শিক্ষা

দুনিয়ার জীবনকে যারা চিরস্থায়ী মনে করে এবং আখিরাতের অনন্ত অসীম জীবনের কথা যারা বিশ্বাস করে না, তারা নিজেদের মনগড়া মত ও পথে দুনিয়ার সুখ-সুবিধা নিয়েই মত্ত। তারা আল্লাহর বিধানের ধার ধারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআন ও হাদীসের আইন-কানুন তাদের ভোগের পথে বাধা দেয় বলে তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ করে রাখা নিরাপদ মনে করে। তাদের হাতেই দেশের ক্ষমতা। তাদের মরযী মতোই শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজের গোটা কাঠামো নিয়ন্ত্রিত।

এ অবস্থায় যখন সমাজে আল্লাহর আইন জারী করার জন্য কোন আন্দোলন শুরু হয়, তখন তাদের গায়ে জ্বালা ধরে। তারা প্রথমে ঠাট্টা করেই এ আন্দোলনকে উড়িয়ে দিতে চায়। মাক্কায় রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে কুরাইশ নেতারা এ ব্যবহারই করেছিলো।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহর বান্দাদের সাথে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের এ বিদ্রূপের প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা আখিরাতে যে অবশ্যই হবে, সে কথাই সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে। আর যদি ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হয়, তাহলে বিদ্রূপকারীরা দুনিয়াতেও পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে বাধ্য হয়, যেমন মাক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ নেতাদের যে দশা হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

# সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন	# سورة المطففين
সূরা ঃ ৮৩ মাক্কী যুগে নাযিল	مكية رقمها : ٨٣
মোট আয়াত ঃ ৩৬ মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٣٦ ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য ধ্বংস।❖	١- وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ
২. তারা যখন মানুষের কাছ থেকে নেয়, তখন পুরোপুরি নেয়,	٢- الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কমিয়ে দেয়।	٣- وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ
৪-৫. তারা কি মনে করে না যে, এক মহাদিনে তাদের উঠিয়ে আনা হবে ?[১]	٤- اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ٥- لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ
৬. যে দিন সব মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে ?	٦- يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
৭. কক্ষনো নয়[২], নিশ্চয়ই বদলোকদের আমলনামা জেলখানার দফতরে আছে।	٧- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ
৮. জেলখানার দফতর সম্বন্ধে তুমি কী জান ?	٨- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ
৯. একটা লিখিত কিতাব।	٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ

❖ আরবি 'ওয়াইলুন' মানে হায়-আফসোস, দুঃখ, অনিষ্ট, ধ্বংস ইত্যাদি।

১। কিয়ামাতের দিনকে এক বড় দিন বলার কারণ হলো, ঐদিন সব মানুষ ও জিনের হিসাব আল্লাহর আদালতে এক সাথে নেয়া হবে এবং পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণা দেয়া হবে।

২। মানে, তাদের এই ধারণা একেবারেই ভুল যে, দুনিয়াতে এত সব অন্যায় করার পর এরা এমনিই ছাড়া পেয়ে যাবে।

১০. যারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস।

১১. যারা প্রতিদান দেবার দিনটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়।

১২. আর সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া আর কেউ সে দিনটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় না।

১৩. যখন তার কাছে আমার আয়াত পড়ে শুনানো হয়, তখন বলে, এটা তো পুরানো কালের কাহিনী।[৩]

১৪. কক্ষনো নয়, বরং আসলে ওদের দিলে ওদেরই বদ কাজের (দরুন) মরিচা ধরে গেছে।[৪]

১৫. কক্ষনো নয়, অবশ্যই ওদেরকে ঐ দিন ওদের রবের দীদার থেকে মাহরূম রাখা হবে।❖

১৬. এরপর ওরা অবশ্যই দোযখে গিয়ে পড়বে।

১৭. তখন তাদেরকে বলা হবে এটা ঐ জিনিস যাকে তোমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝ۙ

١٠- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ؕ

١١- وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖۤ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
اَثِيْمٍ ۝ۙ
١٢-
اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ؕ
١٣-
كَلَّا بَلْ ٚ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ ١٤-
كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝ؕ
١٥-
ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝ؕ

١٦- ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ
تُكَذِّبُوْنَ ۝ؕ

৩। অর্থাৎ ঐসব আয়াত যার মধ্যে কিয়ামাতের দিনের খবর দেয়া হয়েছে।

৪। পুরস্কার ও শাস্তিকে মনগড়া কাহিনী মনে করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু এজন্য এরা এরূপ মনে করে যে, এদের গুনাহ ও অন্যায়ের ফলে এদের মনে মরিচা ধরে গেছে। তাই যে কথা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ, সে কথাও এদের কাছে বাজে গল্প মনে হয়।

❖ ঐ দিন নেক লোকেরা আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিন্তু বদ লোকেরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

www.bjilibrary.com

১৮. কক্ষনো না[৫], নিশ্চয়ই নেক লোকদের আমলনামা উঁচুদরের লোকদের দফতরে আছে।

১৯. আর ঐ উঁচুদরের লোকদের দফতর সম্বন্ধে তোমরা কী জান ?

২০. একটা লিখিত কিতাব।

২১. (আল্লাহর) নিকটবর্তী ফেরেশতারা এর দেখাশুনা করে।

২২. নিশ্চয়ই নেক লোকেরা বড়ই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকবে।

২৩. উঁচু আসনে বসে দৃশ্যাবলি দেখতে থাকবে।

২৪. তুমি তাদের চেহারায় নিয়ামাত উপভোগজনিত সজীবতার পরিচয় পাবে।

২৫. সীলমোহর করা খাঁটি শরাব তাদের পান করানো হবে।

২৬. এর উপর কস্তুরীর মোহর❖ লাগানো থাকবে। যারা পাল্লা দিয়ে জিততে চায়, তারা যেন এ জিনিস লাভ করার জন্য বাজি রেখে জিততে চেষ্টা করে।

২৭. ঐ শরাবে তাসনীমের[৬] আমেজ থাকবে।

١٧- كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ

١٨- عِلِّيِّيْنَ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝

١٩- كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

٢٠- يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

٢١- اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝

٢٢- عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

٢٣- تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ

٢٤- النَّعِيْمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

٢٥- خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ

٢٦- فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝

৫। মানে, পুরস্কার ও শাস্তি হবে না বলে এরা যে ধারণা করছে, তা সম্পূর্ণ ভুল।

❖ 'মিসক' মানে মৃগনাভি। এক রকম হরিণের নাভিতে খুব সুগন্ধি জিনিস পয়দা হয়। এরই এক নাম কস্তুরী।

৬। 'তাসনীম' মানে উচ্চতা। কোন ঝরনাকে তাসনীম বলার অর্থ হলো, এ ঝরনা উঁচু জায়গা থেকে বয়ে নীচে আসছে। বেহেশতের এক ঝরনার নাম 'তাসনীম'।

www.bjilibrary.com

٢٨- عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝ط

২৮. এটা একটা ঝরনা, যার পানি দিয়ে (আল্লাহর) নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকেরা শরাব পান করবে।

٢٩- اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝زصلے

২৯. অপরাধীরা দুনিয়ায় ঈমানদারদেরকে ঠাট্টা করতো।

٣٠- وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝زصلے

৩০. যখন তাদের পাশ দিয়ে যেতো, তখন চোখ মেরে তাদের দিকে ইশারা করতো।

٣١- وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ
انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝زصلے

৩১. আর যখন ওরা নিজেদের বাড়ীর দিকে ফিরে আসতো, তখন হাসি-তামাশা করতে করতে ফিরতো।

٣٢- وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ
هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝لا

৩২. আর যখন ওরা তাদের দিকে দেখতো, তখন বলতো, "এরা ভুল পথে আছে।"

٣٣- وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝ط

৩৩. অথচ ওদেরকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠানো হয়নি।

٣٤- فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ
الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝لا

৩৪. তাই আজ ঈমানদাররা কাফিরদেরকে দেখে হাসছে।

٣٥- عَلَى الْاَرَآئِكِ لا يَنْظُرُوْنَ ۝ط

৩৫. উঁচু আসনে বসে (তাদের অবস্থা) দেখছে।

٣٦- هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ۝ع

৩৬. কাফিররা যা করতো, তার বদলা তারা পেয়ে গেলো তো ?[৭]

৭। একথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ আছে। কাফিররা মু'মিনদেরকে জ্বালাতন করাকে একটা সুখকর কাজ মনে করতো। তাই বলা হচ্ছে যে, মু'মিনরা বেহেশতে আরামে বসে বসে দোযখে কাফিরদের অবস্থা দেখতে থাকবে এবং মনে মনে বলতে থাকবে যে, তাদের কাজের কি পুরস্কারই না তারা পেলো।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ইনশিক্বাক

নাম ঃ পয়লা আয়াতের ইনশাক্বাক ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল বিশেষ্য পদ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে ইনশিক্বাক।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ এ সূরাটিও মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের সূরা। সূরার আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, তখনও ইসলামী আন্দোলনের উপর যুলুম ও নির্যাতন শুরু হয় নি। তবে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সাথে সাথে তখন কুরআনকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছিল এবং আখিরাতে আল্লাহর আদালতে হিসাব দেবার কথা লোকেরা স্বীকার করতে রাযী হচ্ছিল না।

আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরার আলোচ্য বিষয়ও কিয়ামাত এবং আখিরাত।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৫ আয়াতে কিয়ামাতের সূচনায় আসমান ফেটে যাবার কথা এবং আখিরাতের সূচনায় মাটির ভেতরের সব কিছু বের হয়ে আসার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের ঐ অবস্থা আপনা-আপনিই হবে না। আজ যার হুকুমে এরা মানুষের খেদমতে লেগে আছে, সেই মনিবের হুকুমেই তাদের অবস্থা ঐ রকম হবে। হে মানুষ! তোমরা তো অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল সৃষ্টি। তোমরা কোন্ সাহসে আল্লাহর হুকুম অমান্য কর ? সারা সৃষ্টি যার হুকুমে চলে, তার হুকুম মানা তোমাদেরও উচিত। না মানলে মনিবের কিছুই আসবে-যাবে না, তোমাদেরই ক্ষতি হবে।

(২) ৬-১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ ও আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার মজা লুটবার জন্য রাত-দিন যতোই পরিশ্রম করুক আসলে মানুষ বাধ্য হয়ে ঐ গন্তব্যস্থলের দিকেই প্রতিদিন এগিয়ে চলছে, যেখানে একদিন তাকে মনিবের সামনে হাযির হতেই হবে। সেখানে হাযির হবার পর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে এবং তাদের হিসাব হালকাভাবে নিয়ে তাদেরকে বেহেশতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আর একদল বাম হাতে এবং পেছনের দিক দিয়ে তাদের আমলনামা পাবে। তারা মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু তাদেরকে মওত না দিয়ে দোযখে নিয়ে ফেলা হবে।

(৩) ১৩-১৫ আয়াতে তাদের এ দুর্দশার কারণ বলা হয়েছে, দুনিয়ায় এরা এ ভুল ধারণা 'খাও দাও আর মজা কর' নীতিতে জীবন কাটিয়েছে। তারা মনে করেছে কোন দিন তাদেরকে এ লাগামহীন জীবনের হিসাব দিতে হবে না। অথচ তাদের মনিব তাদের সব অবস্থা ও কাজ-কর্মই দেখছিলেন। তাই হিসাব দেয়ার বিপদ থেকে তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

(৪) ১৬-১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন থেকে আখিরাতের শেষ মনযিল পর্যন্ত মানুষকে ধাপে ধাপে অবশ্যই পৌঁছতে হবে। এটা তেমনি সত্য, যেমন রাতের পর দিন হওয়া, মানুষ ও পশুর সন্ধ্যায় আপন আপন বাসস্থানে ফিরে আসা এবং চাঁদের এক অবস্থা থেকে ক্রমে পূর্ণতায় পৌঁছা স্বাভাবিক সত্য।

(৫) ২০-২৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের কী হলো ? এতোকিছু বুঝাবার পরও তোমরা কেন ঈমান আনতে রাযী হচ্ছ না ? এমন আকর্ষণীয় কুরআনের বাণী শুনেও আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাথা নত করছ না কী কারণে ? তোমরা কুরআনের প্রতি শুধু অবিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হচ্ছ না, বরং কুরআন ও রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করছ। এ আচরণ দ্বারা তোমরা নিজেদের জন্য কোন মঙ্গল যোগাড় করছ, তা আল্লাহর জানা আছে।

হে রাসূল! এদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দিন। অবশ্য যারা এদের মতো সত্যের দুশমন নয়, বরং ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনও শেষ হবার নয়।

www.bjilibrary.com

# সূরা আল-ইনশিক্বাক	# سورة الانشقاق
সূরা ঃ ৮৪ — মাক্কী যুগে নাযিল	مكية — رقمها : ٨٤
মোট আয়াত ঃ ২৫ — মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٢٥ — ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. যখন আসমান ফেটে যাবে।	١- اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ
২. এবং তার রবের হুকুম পালন করবে। আর এরূপ করাই তার উচিত।	٢- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ
৩. যখন জমিনকে ছড়িয়ে দেয়া হবে।[১]	٣- وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ
৪. এবং যা কিছু এর ভিতরে আছে, তা বাইরে ফেলে দিয়ে সে খালি হয়ে যাবে।[২]	٤- وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ
৫. সে নিজের রবের হুকুম পালন করবে এবং এরূপ করাই তার উচিত।	٥- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ؕ
৬. হে মানুষ! তুমি চেষ্টা করতে করতে তোমার রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ। এরপর তার সাথেই তুমি সাক্ষাৎ করবে।[*]	٦- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ
৭-৮. অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে হালকা হিসাব[৩] নেয়া হবে।	٧- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ
	٨- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ

১। যমীনকে ছড়িয়ে দেবার মানে হলো, সমুদ্র ও নদী-নালা বন্ধ করে দেয়া হবে। পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার করে ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং যমীনের সমস্ত উঁচু-নীচু জায়গা সমান করে এক সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে।

২। মানে, যত মরা মানুষ যমীনের ভেতর পড়েছিল সবাইকে বের করে বাইরে ফেলে দেবে এবং সব মানুষের কার্যকলাপের যত চিহ্ন যমীনে পড়েছিল সবই বের হয়ে আসবে, কোন কিছুই আর মাটির ভেতর থাকবে না।

* দুনিয়ায় পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি করে যা কিছু পাওয়া যায়, তার মধ্যেই তুমি ডুবে আছ। কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাতের কথা যতই ভুলে থাক, তুমি প্রতিদিন তোমার রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ, যার সামনে মরণের পর তোমাকে অবশ্যই হাজির হতে হবে।

৩। মানে, তার কাছ থেকে কড়াকড়ি হিসাব নেয়া হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, অমুক অমুক কাজ কেন করেছ ? তার ভাল কাজের সাথে সাথে কিছু মন্দ কাজের হিসাব নিশ্চয়ই আমলনামায় থাকবে। কিন্তু ভাল কাজের পাল্লা ভারী হওয়ায় মন্দ কাজের দোষ ধরা হবে না এবং সে সবই মাফ করে দেয়া হবে।

৯. এবং সে তার আপনজনের দিকে হাসি-খুশি অবস্থায়[4] ফিরে যাবে।

১০-১২. আর যার আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে[5] সে মরণকে ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে।

১৩. সে আপনজনের মধ্যে আনন্দে মগ্ন ছিল।

১৪. সে মনে করেছিল, তাকে কখনও ফিরে যেতে হবে না।

১৫. কিভাবে না ফিরে পারতো ? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন।

১৬-১৮. সুতরাং তা নয়, আমি কসম খাচ্ছি আসমানের লালিমার, রাতের এবং যা কিছু সে গুটিয়ে আনে তার, আর চাঁদের যখন সে পূর্ণ হয়।

٧- وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○ۜ

٨- وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ

٩- ظَهْرِهٖ ○ۙ

١٠- فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ○ۙ

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ○ۜ

١١- اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ○ۜ

١٢- اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ○ۚ

١٣- بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ○ۜ

١٤- فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ○ۙ

١٥- وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ○ۙ

١٦- وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ○ۙ

৪। আপনজন মানে ঐসব পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, যাদেরকে হয়তো এভাবেই মাফ করে দেয়া হয়েছে।

৫। সূরা "হাক্কা"তে বলা হয়েছে, "যাদের আমলনামা তাদের বাঁ হাতে দেয়া হবে।" আর এ সূরায় বলা হয়েছে, "তাদের পেছন দিক থেকে দেয়া হবে।" বোধ হয় ব্যাপারটা এমন হবে যে, এত লোকের সামনে তাদের খারাপ আমলনামা হাতে নিতে লজ্জাবোধ হবে। তাই হাত পেছনে লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে তুলেই দেয়া হবে।

١٧- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

١٨- فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

١٩- وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۝ السجدة

٢٠- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۝

٢١- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۝

٢٢- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

٢٣- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

১৯. অবশ্যই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে চলে যেতে হবে।[৬]

২০. তাহলে এদের কী হয়েছে যে, এরা ঈমান আনে না ?

২১. আর যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তারা সিজদা করে না।

(এ আয়াত পড়লে সিজদা দিতে হবে)

২২. বরং এই অস্বীকারকারীরা তো উল্টা (এটাকেই) মিথ্যা মনে করছে।

২৩. অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন, যা কিছু এরা (নিজেদের আমলনামায়) জমা করছে।[৭]

২৪. অতএব এদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দিন।

২৫. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

৬। মানে, তোমাদেরকে একই অবস্থায় থাকতে দেয়া হবে না। যুবক বয়স থেকে বুড়ো বয়স, এরপর মরণ, মরণের পর বারযাখ, আবার জীবিত হওয়া, হাশরের ময়দানে যাওয়া, হিসাব দেয়া, পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়া ইত্যাদি অগণিত মনযিল পার হতে হবে।

এ কথা বলার আগে তিনটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে ঃ (১) সূর্য ডুববার পর আসমানের লালিমা। (২) দিনের পর রাতের অন্ধকার এবং দিনে মানুষ ও পশুর যমীনে ছড়িয়ে পড়া, আবার রাতে তাদের সবাইকে গুটিয়ে নিয়ে আসা। (৩) চাঁদের প্রথম অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণিমায় পরিণত হওয়া। এ কয়টি জিনিস যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষ যে দুনিয়ায় বাস করে তার মধ্যে কোথাও স্থবিরতা ও গতিহীনতা নেই। একের পর এক পরিবর্তন হচ্ছে ও অবস্থা বদলে যাচ্ছে। তাই কাফিরদের এই ধারণা ঠিক নয় যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই সব শেষ হয়ে যাবে এবং আর কোন অবস্থার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হবে না।

৭। আর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, কাফিররা অবাধ্যতা, হিংসা, সত্যের দুশমনী, মন্দ ইচ্ছা ও বদ নিয়তের যে আবর্জনা তাদের মনে জমা করে রেখেছে, তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।

সূরা আল-বুরূজ

নাম ঃ পয়লা আয়াতের 'বুরূজ' শব্দ দিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরাটির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাক্কী যুগের শেষ ভাগে যখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর চরম অত্যাচার চলছিল, তখন এ সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ তাওহীদকে অস্বীকার করা এবং ঈমানদারদের উপর কাফিরদের যুলুম ও নির্যাতনের করুণ পরিণাম এবং মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দান।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ পয়লা তিন আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশেষ উদ্দেশ্যে দুটো বিষয়ের কসম খেয়েছেন। বুরূজ বা গ্রহ–উপগ্রহের কসম খেয়ে বলতে চাচ্ছেন যে, এসব শক্তিমান সৃষ্টি যার হুকুমে চলে, তিনি যালিমদেরকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন। কিয়ামাত এর ভয়াবহ দৃশ্য ও কিয়ামাতে উপস্থিত সব সৃষ্টির কসম খেয়ে বলছেন যে, দুনিয়ায় যারা যুলুম করছে, তাদেরকে কিয়ামাতে পাকড়াও করা হবে এবং সেদিন ঈমানদাররা কাফিরদের দোযখে কঠিন আযাব ভোগ করতে দেখবে, যেমন আজ কাফিররা মুমিনদেরকে আগুনে পোড়াবার তামাশা দেখছে।

(২) ৪-৭ আয়াতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অতীতে বিভিন্ন সময় আগুনে জ্বালিয়ে নির্যাতন করার কথা উল্লেখ করে মাক্কাবাসী কাফির ও রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদেরকে দুটো কথা বুঝানো হয়েছে।

(ক) পয়লা কথা, অতীতে আগুনের গর্তে মুমিনদেরকে পুড়িয়ে যারা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়েছে, আজ মাক্কার সর্দাররাও মুসলিমদের উপর যুলুম করে সেই গযবেরই হকদার হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় কথা, আগুনের গর্তে পোড়ানো সত্ত্বেও অতীতে যেমন মুমিনরা ঈমান ছেড়ে দেয় নি, আজকের মুসলমানদেরকেও কঠোর অত্যাচার সহ্য করে ঈমানের উপর মযবুত থাকা উচিত।

(৩) ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাই এসব যুলুমের একমাত্র কারণ। কিন্তু কাফিরদের জানা উচিত যে, আল্লাহ মহাশক্তিশালী, নিজের গুণেই প্রশংসিত, আসমান ও যমীনের উপর ক্ষমতাবান এবং সবকিছুই দেখছেন। একদিন এ যুলুমের শাস্তি তাদের পেতে হবে। এ দ্বারা মুমিনদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, দ্বীনকে কায়েম করার জন্য বাতিল শক্তির হাতে তোমাদেরকে যে অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে, তা আল্লাহ দেখছেন। তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার এ কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তোমাদের আছে কি না।

(৪) ১০-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপর যারা যুলুম করেছে, তারা যদি এখনও তাওবা করে ঈমানের পথে না আসে, তাহলে দোযখই তাদের বাসস্থান

www.bjilibrary.com

হবে। আর যারা ঈমান এনে নেক আমল করবে, তারা বেহেশতে যাবে এবং এটাই সত্যিকার সফলতা। সবারই জানা উচিত যে, আল্লাহ খুব শক্ত হাতেই পাকড়াও করেন। কিন্তু আল্লাহর পথে ফিরে এলে সব দোষ মাফ করে তিনি তাঁর বান্দাহকে স্নেহ করেন। তিনি আরশের মালিক এবং যা তিনি করতে চান, তা থেকে কেউ তাঁকে ফিরাতে পারে না।

(৫) ১৭-২০ আয়াতে ইসলামের দুশমনদেরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা কি ফিরআউন ও সামূদের সেনবাহিনীর কথা শুননি? তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের বিরোধিতা করার ফলেই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, আল্লাহ সবাইকে ঘেরাও করে আছেন। তিনি মানুষকে দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে চলবার জন্য সামান্য কিছু সুযোগ দিয়েছেন মাত্র। পাকড়াও করার সময় এলেই মযবুত হাতে গ্রেফতার করবেন।

(৬) ২১ ও ২২ আয়াতে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, তোমরা কুরআনের ডাকে সাড়া না দিলে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না। এ কুরআন চিরস্থায়ীভাবে 'লাওহে মাহফুজে' খোদাই করা আছে। তোমরা অমান্য করলেও কুরআন বদলে যাবে না। তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর, কুরআনকে পরাজিত করার কুচিন্তা বাদ দাও।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরাতে একদিকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়েছে, অপরদিকে বিরোধী যালিম শক্তিকে এক সময়ে পাকড়াও করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর দুনিয়াটা কোন হবুচন্দ্রের খামখেয়ালী রাজ্য নয়। এখানে যার যেমন খুশী যুলুম করতেই থাকবে এবং কোন সময় যালিমকে ধরার কেউ নেই মনে করা মোটেই ঠিক নয়।

মানুষকে দুনিয়ার জীবনের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আপন খেয়ালখুশী মতো চলার স্বাধীনতা অবশ্যই দেয়া হয়েছে। যে কোন অন্যায় করার সাথে সাথেই যদি পাকড়াও করা হতো, তাহলে কোন মানুষ অন্যায় করার সাহস করতো না। এমন অবস্থা হলে মানুষকে দুনিয়ায় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার স্বাধীনতা দিয়ে যে পরীক্ষা করছেন, সে কারণেই একটা সীমা পর্যন্ত মানুষকে আপন মরযী মতো চলার সুযোগ দিয়েছেন।

এ সুযোগটাকে যারা অন্যায় করার লাইসেন্স মনে করছে, তারাই পরীক্ষায় ফেল করছে। আখিরাতে যখন এ পরীক্ষার ফল বের হবে, তখনি তারা টের পাবে যে, তারা কী বোকামি-ই না করেছে। তাই রাসূল (সা.) বলেছেন, "ঐ লোকই বুদ্ধিমান, যে নিজের হিসাব নিজেই নেয় এবং যা কিছু করে তার ফল মৃত্যুর পর কী হবে, সে হিসাব করে তা করে।"

যালিমারা কোন সময়ই ইতিহাস থেকে কোন উপদেশ নেয় না। ফিরআউন ও নমরূদদের আচরণ যুগে যুগে একই রকম দেখা যায়। তাদের সাথে আল্লাহ পাক কী ব্যবহার করেছেন, সে কথা মনে করে বর্তমানের ফিরআউন-নমরূদরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করতে রাযী না হয়, তাহলে তাদের সাথেও আল্লাহ একই ব্যবহার করবেন। ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত, তাদেরকে সবর করতে হবে এবং চরম যুলুম চলছে বলেই ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-বুরূজ

সূরা ঃ ৮৫ মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ২২ মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. কসম মযবুত দুর্গ বিশিষ্ট আসমানের[১],

২. কসম ঐ দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে,

৩. কসম যারা দেখছে তাদের, আর যা দেখা যাচ্ছে তার।[২]

৪-৭. গর্তের মালিকরা ধ্বংস হয়েছে, (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা জ্বালানির আগুন ছিল। যখন ওরা ঐ গর্তের কিনারে বসা ছিল, আর ওরা ঈমানদারদের সাথে যা কিছু করছিল, তা দেখছিল।[৩]

৮. ঐ ঈমানদারদের সাথে ওদের দুশমনীর এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে, তারা এমন আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহা শক্তিমান ও যিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।

৯. যিনি আসমান ও যমীনের রাজত্বের মালিক এবং ঐ আল্লাহ সবকিছুই দেখছেন।

سورة البروج

مكية رقمها : ٨٥

اياتها : ٢٢ ركوعها : ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝

٢- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝

٣- وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝

٤- قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝

٥- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا

٦- قُعُوْدٌ ۝ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ

٧- بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝

٨- وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

٩- الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

১। মানে, আসমানের বিরাট বিরাট তারা ও গ্রহ-উপগ্রহ। বুরূজ মানে দুর্গও হয়। তাহলে অর্থ হবে দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত তারা।

২। যারা দেখছে তারা হলো ঐ সব লোক, যারা কিয়ামাতের দিন হাযির থাকবে। আর যা দেখা যাচ্ছে তার মানে হলো ঐ কিয়ামাত, যার ভয়ানক অবস্থা সবাই দেখতে পাবে।

৩। গর্তওয়ালা বা গর্তের মালিক মানে ঐ সব লোক, যারা বড় বড় গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে সেখানে ফেলেছে এবং তারা নিজ চোখে, ঈমানদারদের জ্বলবার তামাশা দেখেছে। ধ্বংস হয়েছে মানে, তদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে এবং তারা আযাবের ভাগী হয়েছে।

১০. যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের উপর যুলুম করেছে, এরপর এ জন্যে তাওবা করেনি, তাদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে, আর রয়েছে আগুনে জ্বলবার শাস্তি।	٢٤- اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ ٢٥- وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا ١٠- فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝
১১. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এটা বিরাট সফলতা।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ ١١- مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝
১২. নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত।	اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝
১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন।	١٢- اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝
১৪-১৫. আর তিনি অতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল, আরশের মালিক ও মহান।	وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝ ١٣- ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝
১৬. তিনি যা চান, তাই করে ছাড়েন।	١٤- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝
১৭-১৮. তোমার কাছে কি ফিরআউন ও সামূদ জাতির সৈন্যদের খবর পৌঁছেছে?	١٥- هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝ ١٦- فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝
১৯. কিন্তু যারা কুফরী করেছে, ওরা তো মিথ্যা বলেই চলছে।	١٧- بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝ ١٨-

www.bjilibrary.com

২০. অথচ আল্লাহ তাদের ঘেরাও করেই আছেন। (তাদের মিথ্যাচারে এই কুরআনের কোন ক্ষতি নেই)।	١٩- وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝
২১-২২. বরং এই কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, যা সুরক্ষিত ফলকে (খোদাই করা) আছে।[৪]	٢٠- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

৪। অর্থাৎ কুরআনের লেখা অটল ও অপরিবর্তনীয় এবং যা লওহে মাহফূযে খোদাই করা আছে। এ কুরআনে কোন রদবদল করার কারো ক্ষমতা নেই।

সূরা আত-তারিক

নাম ঃ পয়লা আয়াতে 'তারিক' শব্দ দিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ মাক্কী যুগের প্রথম স্তরের ঐ সময় এ সূরাটি নাযিল হয়, যখন মাক্কার কাফিররা কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর ইসলামী আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য সব রকম চালবাজি করছিল।

আলোচ্য বিষয় ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত-তিনটিই মূল আলোচ্য। মওতের পর মানুষের আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া সম্পর্কে এবং কুরআন যে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী বাণী, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) পয়লা তিন আয়াতে আসমান ও আলোময় তারার কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলছেন যে, এসব বিরাট সৃষ্টির অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, কোন এক মহাশক্তি এ সবকে হিফাযত ও পরিচালনা করছেন।

(২) ৪-১০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শুধু আসমান-যমীনের মতো বড়ো সৃষ্টিই নয়, প্রতিটি জীবকে তিনিই বাঁচিয়ে রেখেছেন। মানুষ নিজের জন্মের দিকে একটু খেয়াল করে দেখুক যে, কে তাকে এক ফোঁটা পানি থেকে এমন সুন্দর ও এত যোগ্য মানুষ রূপে পয়দা করেছেন। তাদের বুঝা উচিত যে, মরার পর আবার তাদেরকে জীবিত করাটা তার জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

যেদিন আবার মানুষকে জীবিত করা হবে, সেদিনের অবস্থা কী হবে, তা ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের গোপন কথা, কাজ ও নিয়্যত সেদিন প্রকাশ করে দেয়া হবে। সেদিন আর কারো কোন শক্তি থাকবে না এবং কেউ কারো সাহায্য করতে পারবে না।

(৩) ১১-১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আসমানের বৃষ্টি, যমীনের ফসল যেমন অকাট্য সত্য, কুরআনের বাণীও তেমনি অটল এবং সঠিক। এটাকে হাসি-ঠাট্টার বিষয় মনে করো না। কাফিররা যত রকম চালবাজিই করুক, আল্লাহ সবই বানচাল করার ক্ষমতা রাখেন। কাফিররা রাসূলের আন্দোলনকে ঠেকাবার জন্য যত চেষ্টাই করুক, কুরআনের চূড়ান্ত বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। কারণ মানব জীবনের সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার জন্যই কুরআন এসেছে, কুরআনের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা।

শেষ আয়াতে রাসূল (সা.)কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এদের চালবাজিতে আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনার দুশমনদেরকে আর কিছুদিন এ শয়তানীতে লিপ্ত থাকতে দিন। শিগগিরই এদের সব চাল ব্যর্থ করে আপনাকে বিজয়ী করা হবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তারিক

سورة الطارق

সূরা ঃ ৮৬ — মাক্কী যুগে নাযিল

رقمها : ٨٦ — مكية

মোট আয়াত ঃ ১৭ — মোট রুকু ঃ ১

ركوعها : ١ — اياتها : ١٧

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

١ —وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ○
٢ —وَمَا أَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ○
٣ —النَّجْمُ الثَّاقِبُ ○
٤ —اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○
٥ — فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○
٦ — خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ○
٧ — يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ○
٨ — اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ○

১. কসম আসমানের ও রাতে আত্মপ্রকাশকারীর।

২-৩. আর রাতে আত্মপ্রকাশকারী সম্বন্ধে তুমি কী জান? এটা হলো আলো ঝলমল তারকা।

৪. এমন কোন প্রাণ নেই, যার উপর কোন হিফাযতকারী নেই।[১]

৫. অতএব মানুষ এটুকুই দেখুক না যে, তাকে কী জিনিস থেকে পয়দা করা হয়েছে?

৬. লাফিয়ে পড়া পানি থেকে পয়দা করা হয়েছে।

৭. (যে পানি) পিঠ ও বুকের হাড্ডিগুলোর মাঝখান থেকে বের হয়ে আসে।[২]

৮. নিশ্চয়ই তিনি একে আবার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন।

১। হিফাযতকারী মানে স্বয়ং আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনের ছোট-বড় সৃষ্টির দেখাশুনা ও হিফাযত করছেন। এর মানে হলো, রাতে আসমানে যে অগণিত গ্রহ-তারা চমকাতে দেখা যায়, এদের অস্তিত্ব এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কেউ আছেন, যিনি এসব তৈরি করেছেন, আলোময় বানিয়েছেন এবং মহাশূন্যে এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আর এমনভাবে এ সবের দেখাশুনা ও হিফাযত করছেন যে, কোনটি নিজ জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে না। অগণিত তারা ঘুরে বেড়াবার সময় একটার সাথে আর একটার টক্কর লাগছে না। এভাবে আল্লাহ পাক সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

ছোট-বড় সব সৃষ্টির বেলায়ই একথা সত্য। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নন। আর যে মানুষের জন্য গোটা দুনিয়া পয়দা করেছেন, সে মানুষের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে সচেতন। মানুষের একথা ভুলা উচিত নয় যে, আল্লাহ তাদের যেমন হিফাযত করছেন, তেমনি তাদের কার্যকলাপের হিসাবও নেবেন।

২। পুরুষ ও নারী দেহের যে জিনিস দিয়ে মানব-দেহ গঠিত হয়, তা শরীরের ঐ অংশ থেকে বের হয়, যা বুক ও পিঠের মাঝখানে আছে। তাই বলা হয়েছে যে, মানুষ ঐ পানি দিয়ে তৈরি, যে পানি পিঠ ও বুকের মাঝখান থেকে বের হয়।

www.bjilibrary.com

সূরা ঃ ৮৬ তারিক পারা ঃ ৩০	سورة : ٨٦ الطارق الجزء : ٣٠
৯-১০. যে দিন সব গোপন রহস্য যাচাই করা হবে।[৩] তখন মানুষের নিজেরও কোন শক্তি থাকবে না, আর কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।	٩- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۙ ١٠- فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۗ
১১-১২. কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আসমানের, কসম (গাছ জন্মাবার সময়) ফেটে যাওয়া জমিনের।	١١- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۙ ١٢- وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۙ
১৩-১৪. এটা (কুরআন) যাচাই করা চূড়ান্ত পরীক্ষিত বাণী, এটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়।[৪]	١٣- اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۙ ١٤- وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۗ
১৫. এরা (মক্কার কাফিররা) কিছু চাল চালছে।	١٥- اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۙ
১৬. আমিও একটি চাল চালছি।	١٦- وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۚ
১৭. তাই (হে রাসূল!) এ কাফিরদেরকে সামান্য কিছু সময় তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।	١٧- فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۧ

৩। গোপন রহস্য মানে মানুষের ঐ কাজও যা দুনিয়ায় গোপন রহস্য হয়ে আছে এবং ঐ সব কাজ-কারবার যার বাহ্যিক রূপ দুনিয়ার সামনে প্রকাশ পেলেও এর পেছনে যে নিয়্যত, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা ছিল, তা গোপনই রয়ে গেছে। সেদিন এসবই যাচাই করা হবে।

৪। মানে, যেমন আসমান থেকে বৃষ্টি পড়া ও যমীন ফেটে গাছপালা গজানো কোন হাসি-ঠাট্টা বা খেল-তামাশার বিষয় নয়, বরং এসব অত্যন্ত বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনি আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে বলে যে খবর কুরআন দিচ্ছে, তাও হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়, বরং তা খাঁটি সত্য।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আ'লা

নাম ঃ পয়লা আয়াতের আ'লা শব্দ দ্বারাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, মাক্কী যুগের প্রথম ভাগেই সূরাটি নাযিল হয়। বিশেষ করে ৬ নম্বর আয়াতে "আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব, তাহলে আপনি ভুলে যাবেন না" এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্তও রাসূল (সা.)-এর ওহী গ্রহণ করার অভ্যাস ভালভাবে হয় নি। প্রথম অবস্থায় ওহী নাযিলের সময় যত আয়াত একসাথে নাযিল হতো, তা মুখস্থ রাখার জন্য রাসূল (সা.) অস্থির হতেন এবং কোন অংশ ভুলে যাওয়ার ভয়ে পেরেশান হতেন। তাই এ সূরাতে রাসূল (সা.)-কে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, আপনাকে মুখস্থ করার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

আলোচ্য বিষয় ঃ তাওহীদ, আখিরাত ও রাসূল (সা.)-কে হিদায়াত।

আলোচনার ধারা ঃ (১) পয়লা আয়াতেই তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যখনই তোমরা আল্লাহকে ডাক বা আল্লাহর নামে তাসবীহ পড়, তখন আল্লাহর এমন সব গুণবাচক নাম ব্যবহার কর, যা তাওহীদের বিরোধী না হয়। আল্লাহ সমস্ত গুণের অধিকারী। তাঁর মধ্যে কোনরকম ত্রুটি নেই। তাঁর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে 'আ'লা' একটি। কুরআনে আরও বহু গুণবাচক নাম শেখানো হয়েছে। এসব নামেই তাসবীহ পড়তে হবে। এমন সব নামেই তাঁকে ডাকা উচিত, যা তাওহীদের সাথে মিল খায়।

(২) ২ ও ৩ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাকে যে মহান রবের নামে তাসবীহ পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, তিনিই সব কিছু পয়দা করেছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই সমতা কায়েম করেছেন। তারপর তাদের তাকদীর ঠিক করেছেন এবং যে কাজের জন্য যাকে পয়দা করেছেন, সে কাজের হিদায়াত দিয়েছেন বা সে কাজের উপযোগী বানিয়েছেন।

(৩) ৪ ও ৫ আয়াতে আল্লাহর ক্ষমতা সবার সামনে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্য বলা হয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তিনিই তৃণ-লতা পয়দা করেন, আবার তিনিই এ সবকে খড়-কুটায় পরিণত করেন। বসন্তকাল আনার সাধ্য যেমন আর কারো নেই, তেমনি হেমন্তকাল আসা বন্ধ করার ক্ষমতাও আর কারো নেই।

(৪) ৬ ও ৭ আয়াতে রাসূল (সা.)-কে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, আমি যে কুরআন আপনার উপর নাযিল করছি, তা মুখস্থ করাবার দায়িত্বও আমারই। এর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। কুরআনকে ঠিকমতো মুখস্থ রাখা আমার ইচ্ছা ও দয়ার ফল, এতে আপনার কোন বাহাদুরী নেই। আমি ইচ্ছা করলে ভুলিয়েও দিতে পারি।

(৫) ৮ ও ১৩ আয়াতে তাবলীগ করা ও মানুষকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেবার ব্যাপারে

www.bjilibrary.com

রাসূল (সা.)-কে বলা হয়েছে যে, সবাইকে আল্লাহর পথে টেনে আনবার অসম্ভব দায়িত্ব আপনার উপর চাপানো হয়নি। মানুষকে হিদায়াত করার কঠিন কাজ আপনাকে দেয়া হয়নি। আমার বাণী সবাইকে শুধু পৌঁছিয়ে দেয়াই আপনার কাজ। এ সহজ নিয়ম হলো এই যে, আপনি মানুষকে বুঝাতে থাকুন। যারা উপদেশ কবুল করে উপকৃত হতে রাযী, তাদেরকে নসীহত করুন। যারা রাযী নয়, তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন দরকার নেই। যাদের দিলে পথহারা হবার পরিণামের ভয় আছে তারা আপনার নসীহত কবুল করবে। আর যারা দুর্ভাগা, তারা আপনার কথা অমান্য করে দোযখের ভাগী হবে।

(৬) ১৪ ও ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে, যারা ঈমান, চরিত্র ও আমলের দিক দিয়ে নিজেদেরকে পবিত্র রাখে এবং আল্লাহর যিকির করে ও নামায আদায় করে, একমাত্র তারাই সত্যিকার সফলতা ও কামিয়াবী লাভ করবে।

(৭) ১৬ ও ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাধারণত মানুষ ঐ চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করার দিকে মনোযোগ দেয় না। নাফসের তাড়না ও শয়তানের কু-পরামর্শে মানুষ শুধু দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী মজা ও লাভ এবং দেহের আরাম-আয়েশের চিন্তায়ই মশগুল থাকে। অথচ আখিরাতের চিন্তাই তাদের প্রধান ধান্দা হওয়া উচিত। কারণ দুনিয়া অস্থায়ী ও আখিরাত চিরস্থায়ী এবং দুনিয়ার মজা থেকে আখিরাতের নিয়ামাত অনেক বেশী ভালো।

(৮) ১৮ ও ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, উপরের ক'টি আয়াতে যে মহাসত্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা শুধু এ কুরআনেই বলা হয় নি, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে পাঠানো কিতাবেও এ সত্যবাণী প্রচার করা হয়েছে। কুরআনের এ শিক্ষা কোন নতুন সত্য নয়। এ চিরন্তন সত্য সব রাসূলের মারফতেই মানব জাতিকে জানানো হয়েছে।

বিশেষ শিক্ষা

১৬ ও ১৭ আয়াতে মানুষের এক সহজাত দুর্বলতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। "তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখিরাতই বেশী ভাল ও স্থায়ী।"

'দুনিয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো যা নিকটে আছে। আর আখিরাত অর্থ হলো যা শেষে আসবে। এটাই মানুষের স্বভাব যে, নগদ যা পাওয়া যায়, যত সামান্যই হোক, তা নিয়েই সে খুশী হয়। অথচ এর পরিণামে পরে যে বিরাট ক্ষতি হবে, তা খুব কমই বিবেচনা করা হয়।

'দুনিয়ার জীবনে সবারই এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। ছাত্র-জীবনে অধিকাংশ লোককেই দেখা যায় যে, আমোদ-ফুর্তি, খেলাধুলা, নাচ-গান, আড্ডাবাজি ইত্যাদিতে অমূল্য সময় নষ্ট করে।' এর পরিণামে পরীক্ষায় খারাপ ফল করে বাকী দীর্ঘ জীবন দুঃখ ভোগ করে। তখন শুধু আফসোসই সার হয়। জীবিত অবস্থায়ও মনমরা হয়ে জীবন কাটাতে হয়। যারা 'দুনিয়া' নিয়ে ব্যস্ত, তারা দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনের শেষে মওতের পর এ ধরনের দশায়ই পতিত হবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আ'লা

সূরা ঃ ৮৭ মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ১৯ মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. (হে রাসূল) আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ পড়ুন।

২. যিনি পয়দা করেছেন, অতঃপর সুষম করেছেন।[১]

৩. যিনি তাকদীর ঠিক করেছেন,[২] তারপর পথ দেখিয়েছেন।[৩]

৪. যিনি গাছ-গাছড়া উৎপাদন করেছেন।

৫. এরপর এ সবকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।

৬.-৭. আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব। এরপর আল্লাহ যা চান,[৪] তা ছাড়া কিছুই আপনি ভুলে যাবেন না।[৫] যা প্রকাশ্য, তা তিনি জানেন এবং যা গোপন, তা-ও (জানেন)।

৮. আর আমি আপনাকে সহজ পথের সুবিধা দিচ্ছি।

سـورة الاعلى

مكية رقمها : ٨٧

اياتها : ٧ ركوعها : ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١– سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝

٢– الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝

٣– وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝

٤– وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝

٥– فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰى ۝

٦– سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ۝

٧– اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝

٨– وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝

১। মানে, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি জিনিস পয়দা করেছেন। যাই-ই পয়দা করেছেন, তা ঠিক ঠিকভাবে বানিয়েছেন। এর ভারসাম্য ও সমতা যথাযথভাবে কায়েম করেছেন। তাকে এমন আকারে তৈরি করেছেন যে, ঐ জিনিসের জন্য এরচেয়ে ভাল আকৃতি কল্পনাও করা যায় না।

২। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস পয়দা করার আগেই ঠিক করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় এর কি কাজ হবে, সে কাজের জন্য এ জিনিস কত পরিমাণ দরকার হবে, এর আকৃতি কেমন হবে, এর কি কি গুণ থাকবে, কোন্ সময় এর পয়দা হওয়া উচিত, কোন্ সময় পর্যন্ত এর দরকার থাকবে এবং কখন কিভাবে একে খতম হতে হবে- এ সবের পূর্ণ পরিকল্পনার নামই হলো ঐ জিনিসের "তাকদীর"।

৩। মানে, কোন জিনিসকে পয়দা করেই এমনি ছেড়ে দেয়া হয় নি, বরং যে জিনিস যে কাজের জন্য পয়দা করেছেন, তাকে ঐ কাজ ঠিকভাবে করার নিয়মও শিখিয়ে দিয়েছেন।

৪। মানে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ আপনার মনে থাকা আপনার শক্তির বাহাদুরী নয়, বরং এটা আল্লাহর মেহেরবানী ও তারই দেয়া তাওফীকের ফল। তা না হলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভুলিয়ে দিতে পারেন।

৫। ওহী নাযিলের প্রথম অবস্থায় কোন কোন সময় এমন হতো যে, জিব্রাঈল (আ.) ওহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই রাসূল (সা.) কুরআনের আয়াতগুলো ভুলে যাবার ভয়ে সেইটুকুই নিজে পড়তে শুরু করতেন। তাই আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে এ সান্ত্বনা দিলেন যে, ওহী নাযিলের সময় আপনি চুপ করে শুনতে থাকুন, আমি আপনাকে তা পড়িয়ে দেব এবং চিরদিন আপনার মনে থাকবে। যাতে আপনি ভুলে না যান, সে ব্যবস্থা আমিই করব। এ বিষয়ে আপনি পেরেশান হবেন না।

www.bjilibrary.com

সূরা ঃ ৮৭ আ'লা পারা ঃ ৩০	سورة : ۸۷ الأعلى الجزء : ۳۰
৯. কাজেই আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ লাভজনক হয়।[৬]	۹ – فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝
১০. যে ভয় করে, সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে।	۱۰ – سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝
১১-১২. আর চরম হতভাগাই একে পাশ কাটিয়ে চলবে, সে বিরাট আগুনে প্রবেশ করবে।	۱۱ – وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝ ۱۲ – الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝
১৩. এরপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।❖	۱۳ – ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝
১৪-১৫. সেই সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা লাভ করেছে* ও আপন রবের নাম স্মরণ করেছে, তারপর নামায পড়েছে।	۱٤ – قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ ۱۵ – وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝
১৬. কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ।	۱٦ – بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝
১৭. অথচ আখিরাত অনেক ভাল ও চিরস্থায়ী।	۱۷ – وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝
১৮-১৯. আগের কিতাবগুলোতেও এ কথাই বলা হয়েছিল, ইব্রাহীম ও মূসার (কাছে পাঠানো) কিতাবে।	۱۸ – اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ ۱۹ – صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

৬। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চাই না। যে শুনতে রাযী নয়, তাকে শুনাতেই হবে বা যে এমন অন্ধ যে, দেখতেই চায় না, তাকে পথ দেখাতেই হবে– এমন কঠিন ও অসম্ভব কাজের কোন দায়িত্ব আপনার উপর দেয়া হয়নি। আপনার দায়িত্ব হলো মানুষকে নসিহত করা ও উপদেশ দেয়া। যারা এ থেকে উপকৃত হতে চায়, তারা উপদেশ নেবে। আর যাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা হয় যে, তারা নসিহত কবুল করতেই চায় না, তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন দরকার নেই।

❖ অর্থাৎ কঠিন আযাবের ফলে যদি দোযখে মানুষ মরে যায়, তাহলে শাস্তি জারী থাকতে পারে না। কিন্তু যে দুরবস্থার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে বাধ্য হবে, তা মরণের চেয়েও খারাপ। তাই তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা যেন জীবিতও নয়, মৃতও নয়।

* মানে, শিরক, কুফর, মন্দ কাজ, অসৎ চরিত্র ইত্যাদি থেকে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

সূরা আল-গাশিয়াহ্

নাম ঃ পয়লা আয়াতের গাশিয়াহ্ শব্দ থেকেই সূরাটির এ নাম দেয়া হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরাটির গোটা আলোচনাই প্রমাণ দেয় যে, এ সূরা মাক্কী যুগের প্রথম ভাগেই নাযিল হয়। অবশ্য মাক্কী যুগের ঐ সময়ই সূরাটি নাযিল হয়, যখন রাসূল (সা.) প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছেন এবং লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবুল করতে রাযী হচ্ছিল না।

আলোচনার বিষয় ঃ তাওহীদ ও আখিরাত।

(১) পয়লা আয়াতে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে অমনোযোগী জনগণকে চমকিয়ে দিয়ে তাদের সামনে হঠাৎ এ প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়েছে যে, "ঐ ভয়াবহ সময়টার কথা কি তোমরা জান, যখন এক মহাবিপদ সারাটা দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলবে ?" এ আয়াতের পরপরই ঐ ভয়ানক দিনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, যখন সব মানুষ দু'দলে ভাগ হয়ে যাবে এবং দু'রকম পরিণাম দেখতে পাবে।

(২) ২-৭ আয়াতে ঐ দলের বিবরণ রয়েছে, যারা দোযখে যাবে। তারা কেমন কঠিন আযাব ভোগ করবে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা এসব আয়াতে দেয়া হয়েছে।

(৩) ৮-১৬ আয়াতে ঐ দলের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা উন্নত মানের বেহেশতে যাবে। সেখানে তাদের জন্য কেমন নিয়ামাতের ব্যবস্থা করা হবে, তার বিবরণ এসব আয়াতে দেয়া হয়েছে।

(৪) এভাবে দোযখ ও বেহেশতের বিবরণ দেবার পর হঠাৎ আলোচনার বিষয় বদলিয়ে ১৭-২০ আয়াতে কতক প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের শিক্ষা ও আখিরাতের বিবরণ শুনে নাক সিটকায়, তারা কি ঐসব জিনিসের দিকে খেয়াল করে না, যা তারা সব সময় দেখছে ? তারা কি অবুঝ জানোয়ারের মতো শুধু চোখ দিয়েই দেখছে, মগয খাটিয়ে একটু চিন্তা করছে না ? আরবের মরুভূমিতে যে উটের উপর তাদের জীবন নির্ভর করে, সে উট কিভাবে মরু-জীবনের উপযোগী হয়ে পয়দা হলো, সে কথা কি তারা চিন্তা করে দেখেছে ? তারা কি একটুও ভেবে দেখে না যে, তাদের উপর বিরাট আসমান কোথা থেকে এলো ? তাদের সামনে এসব পাহাড় কেমন করে খাড়া হয়ে গেলো ? যে যমীনে তারা বাস করছে, তা কিভাবে মানুষের বাস করার যোগ্য বিছানায় পরিণত হলো ? তারা কি মনে করে যে, এসব কোন মহাশক্তিমান, মহাকৌশলী কারিগর ছাড়া এমনিই হয়ে গেছে ?

আল্লাহ্ পাক এ প্রশ্নগুলোর কোন জওয়াব দেয়ার দরকার মনে করেন নি। কারণ, মানুষের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি এটুকু যুক্তি মেনে নিতে বাধ্য যে, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত,

www.bjilibrary.com

গাছ-পালা, নদী-নালা, জীব-জানোয়ারে এত সুন্দর করে সাজানো এ দুনিয়া আপনা-আপনি হয়ে যায় নি। এক মহাকৌশলী স্রষ্টা ছাড়া এসব পয়দা হতে পারে না এবং এ মহাকারিগরী একই মহাপরিকল্পনার ফল। আর কোন শক্তি এ ব্যাপারে তাঁর শরীক নেই। একাধিক পরিকল্পনাকারী থাকলে গোটা সৃষ্টি এমন শৃঙ্খলার সাথে চলতে পারতো না।

যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক এসব কথা মানতে বাধ্য হয়ে থাকলে ঐ মহাপ্রকৌশলীকে একমাত্র রব ও মুনীব মানতে আপত্তি কেন? যদি একথা বাধ্য হয়েও স্বীকার করতে হয় যে, তিনিই সবকিছু পয়দা করেছেন, তাহলে কিয়ামাতের পর আবার একটি জগত পয়দা করার শক্তি তাঁর আছে বলে স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

(৫) এভাবে কাফিরদের বিবেক-বুদ্ধিতে খোঁচা দিয়ে অতি সহজ যুক্তি দ্বারা তাওহীদ ও আখিরাতের সত্যতা বুঝিয়ে দেবার পর ২১ ও ২২ আয়াতে রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হে রাসূল, এরা আপনার কথা মানুক বা না মানুক তাতে আপনার কিছুই আসে-যায় না। আপনাকে তাদের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠানো হয় নি যে, তাদেরকে মানতে বাধ্য করেই ছাড়বেন। তাদেরকে শুধু বুঝাবার চেষ্টা করাই আপনার দায়িত্ব। আপনি তাদেরকে বুঝাতে থাকুন। উপদেশ কবুল করা না করা তাদের দায়িত্ব।

(৬) ২৩-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা এরপরও তাওহীদ ও আখিরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে, তাদেরকে কঠোর আযাব দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন তাদের চুলচেরা হিসাব নেবার দায়িত্ব আমার। তাদেরকে আমার হাতেই ছেড়ে দিন। আপনার কথা না মানার কারণে আপনি পেরেশান হবেন না। না মানার ফল তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তারা আসুক আমার কাছে। আমি তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেবো না।

বিশেষ শিক্ষা

২১ ও ২২ আয়াতে আল্লাহ পাক এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোন মানুষকে হিদায়াত দান করার দায়িত্ব রাসূলকে দেয়া হয়নি। রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করা। রাসূলের উপদেশ কবুল করা বা না করা তাদের দায়িত্ব, যাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করা হয়।

আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষকেই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সর্ববিষয়ে নিজেদের খুশীমতো সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দিয়েছেন। ভাল ও মন্দ বাছাই করার যোগ্যতা সত্ত্বেও মানুষ নাফসের তাড়নায় ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বা অন্য মানুষের কুবুদ্ধি নিয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। তাই আল্লাহ মানুষকে এখানে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার তাকিদ দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-গাশিয়াহ্

سورة الغاشية

সূরা ঃ ৮৮	মাক্কী যুগে নাযিল
মোট আয়াত ঃ ২৬	মোট রুকূ ঃ ১

مكية	رقمها : ٨٨
اياتها : ٢٦	ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. তোমার কাছে কি ঐ বিপদের খবর পৌঁছেছে, যা সব কিছু ঢেকে ফেলবে?

২-৩-৪. কতক চেহারা সেদিন ভয়ে কাতর হবে,[১] কঠোর পরিশ্রমে রত হবে, দারুণ কাহিল হয়ে পড়বে। ভয়ানক আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে।

৫. ফুটন্ত গরম পানির ঝরনা থেকে তাদের পান করতে দেয়া হবে।

৬-৭. কাঁটাওয়ালা শুকনা ঘাস ছাড়া আর কোন খাবার তাদের জন্য থাকবে না। (যে খাবার) তাদের পুষ্টও করবে না, ক্ষিধেও মেটাবে না।

৮. কতক চেহারা সেদিন উজ্জ্বল থাকবে।

৯. নিজেদের চেষ্টা-সাধনার (সুফল দেখে) তারা খুশি হবে।

১০. তারা উঁচুদরের বেহেশতে থাকবে।

১১. সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না।

১২. সেখানে বহমান ঝরনা থাকবে।

১৩. সেখানে উঁচু আসন থাকবে।

١ – هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۗ
٢ – وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ
٣ – عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ
٤ – تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ
٥ – تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۗ
٦ – لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ
٧ – لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۗ
٨ – وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ
٩ – لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ
١٠ – فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ
١١ – لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۗ
١٢ – فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۘ
١٣ – فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ

১। এখানে চেহারা মানে মানুষ। চেহারাই মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিস বলে 'কতক লোক' না বলে 'কতক চেহারা' বলা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

১৪. পানপাত্র সাজানো থাকবে।	١٤- وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ
১৫-১৬. ঠেস দেবার বালিশগুলো সারি বাঁধা থাকবে এবং দামী নরম শয্যা বিছানো থাকবে।	١٥- وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ١٦- وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ
১৭. (এরা যে আল্লাহকে মানে না) তবে কি এরা উটকে দেখে না কিভাবে তাকে তৈরি করা হয়েছে ?	١٧- اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
১৮. আর আসমানকে (দেখে না) কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে ?	١٨- وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
১৯. আর পাহাড়কে (দেখে না) কেমন শক্তভাবে দাঁড় করানো হয়েছে ?	١٩- وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
২০. আর জমিনকে (দেখে না) কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে ?[২]	٢٠- وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
২১. তাহলে (হে রাসূল!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো শুধু উপদেশ দাতাই।	٢١- فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ
২২. আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন।	٢٢- لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ
২৩-২৪. অবশ্য যে মুখ ফিরিয়ে রাখবে ও কুফরী করবে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন।	٢٣- اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ٢٤- فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ
২৫. এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে।	٢٥- اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ
২৬. এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব।	٢٦- ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

২। মানে, আখিরাত সম্ভব নয় বলে এরা কিকরে মনে করে ? চারপাশের দুনিয়ার দিকে খেয়াল করে কি এরা কখনো দেখে না যে, উট কেমন করে পয়দা হয়ে গেল ? আসমান কিকরে হলো ? পাহাড় কিভাবে কায়েম হলো ? যমীন কিকরে বিছানো হলো ? এসব জিনিস যদি তৈরি হতে পারে এবং তৈরি অবস্থায় এদের সামনে হাজির থাকতে পারে, তাহলে কিয়ামাত কেন আসতে পারবে না ? আখিরাতে আর একটি জগত কেন পয়দা হতে পারবে না ? দোযখ ও বেহেশত কেন হতে পারবে না ?

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফাজর

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটি দিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরাটিতে যা বলা হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, মাক্কী যুগের মধ্যভাগের ঐ সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে, যখন ইসলামী আন্দোলনে যোগদানকারীদের উপর কাফির ও মুশরিকদের যুলুম ও নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। মাক্কাবাসীরা আখিরাতের যে পুরস্কার ও শাস্তির কথা মানতে রাযী হচ্ছিল না, তারই প্রমাণ কতক মযবুত যুক্তি দ্বারা এ সূরায় দেয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) প্রথম পাঁচ আয়াতে ফজর, দশ রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম খেয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথা মানতে রাযী হচ্ছো না, তার প্রমাণের জন্য কি এ কয়টা জিনিসই যথেষ্ট নয় ? এরপর কি আরও কোন কিছুর কসম খাওয়ার দরকার আছে ? কথার ধরন থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সা.) মাক্কাবাসীদেরকে কোন কথা বুঝাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা সে কথা মানতে রাযী হচ্ছিল না।

আল্লাহ পাক চারটি বিষয়ের কসম খেয়ে ঐ কথার পক্ষে যুক্তি পেশ করেছেন। ঐ কথাটি কী তা সূরার পরবর্তী আয়াতগুলো থেকেই বুঝা যায়। মানুষ দুনিয়ায় ভাল ও মন্দ যত কাজ করে এর পুরস্কার ও শাস্তি যে পরকালে অবশ্যই পাবে, সে কথা নিয়েই রাসূল (সা.) এর সাথে মাক্কাবাসীদের বিতর্ক চলছিলো। যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বহুরকম অর্থ করেছেন। কিন্তু যে কথাটির পক্ষে যুক্তি হিসাবে এ কসম খাওয়া হয়েছে, তার সাথে যে অর্থের মিল স্পষ্ট, সে অর্থটাই সহজে বুঝে আসে ও বেশী ঠিক বলে মনে হয়। সে অর্থই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

ফজর মানে সকাল। দশ রাত মানে চাঁদের হিসাবে মাসের তিন ভাগ-প্রথম দশ রাতে চাঁদ ধীরে ধীরে বড় হয়, মধ্যের দশ রাত সবচেয়ে বেশী বড় থাকে এবং শেষ দশ রাতে ধীরে ধীরে আবার ছোট হতে থাকে। জোড় ও বেজোড় মানে সংখ্যার হিসাব। ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি জোড় যা দু'দিয়ে ভাগ করা যায়। আর ১, ৩, ৫, ৭, ৯ হলো বেজোড়। মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছর গুনতে হলে এ সংখ্যাগুলোর সাহায্যেই এগুতে হয়। রাত যখন চলে যায়, তখন অন্ধকারের পর আবার আলো হয়।

এ সবের কসম খেয়ে যে কথাটা বুঝানো হচ্ছে তা হলো এই যে, রাসূল (সা.) আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির যে খবর দিচ্ছেন, তা অতি সত্যি। এ চারটি জিনিস ঐ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ চারটি জিনিস প্রমাণ দিচ্ছে যে, কোন এক শক্তিশালী পরিকল্পনাকারী পরম শৃঙ্খলা ও মযবুত নিয়মের দ্বারা দিন-রাতের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন, নির্দিষ্ট নিয়মে চাঁদ ছোট-বড় হচ্ছে, এ সব পরিবর্তনের কারণে মানুষ দিন, তারিখ, মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারছে।

আল্লাহ পাক যে বিশেষ নিয়মে এ সবকে চালাচ্ছেন এর মধ্যে রদবদল করার ক্ষমতা কারো নেই। কেউ ইচ্ছা করলেই দিন-দুপুরে চাঁদের আলো দেখাতে পারবে না, রাত শেষ হবার আগেই ফজরকে হাযির করতে পারবে না এবং বেজোড় তারিখ পার হবার আগেই জোড় তারিখ আনতে পারবে না। এসব ব্যাপারে যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা, তিনি যদি আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির

ব্যবস্থা করতে চান, তাহলে এটাকে অসম্ভব মনে করার কী কারণ থাকতে পারে ? তাঁর ঐসব ক্ষমতাকে স্বীকার করা যদি যুক্তিপূর্ণ হয়, তাহলে পরকালের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতাকে কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করা যায় ?

এরপরও যারা পরকালের পুরস্কার ও শাস্তিকে সত্যি বলে মনে করে না, তারা একেবারেই আহাম্মক। তারা নিশ্চয়ই দু'রকম বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। হয় তারা ধারণা করছে যে, আল্লাহ পাক এতবড় জগত শৃঙ্খলা ও নিয়মমত চালাবার যোগ্য হলেও মানুষকে আবার জীবিত করে পুরস্কার বা শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন না। আর না হয় তারা মনে করে যে, দিন-রাত ও চাঁদ-সুরুজ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হলেও মানুষকে ভাল ও মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দেবার পেছনে পুরস্কার ও শাস্তি দেবার কোন উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ দুনিয়ার কোন কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয় নি, শুধু মানুষকেই অনর্থক বিবেক ও ভাল-মন্দ বিচারবোধ দেয়া হয়েছে। এসব লোক আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা নিয়ে আছে যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কখনও তাদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন না। আর যখন হিসাবই নেবেন না, তখন পুরস্কার ও শাস্তি দেবার প্রশ্নই ওঠে না। গোটা সৃষ্টিজগত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যারা এ জাতীয় ধারণা রাখে, তারা চরম আহাম্মক।

(২) ৬-১৪ আয়াতে মানব জাতির ইতিহাস থেকে আ'দ ও সামূদ জাতি এবং ফিরআউনের করুণ পরিণামের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যখন তারা আল্লাহর চরম অবাধ্য হয়ে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলো, তখন আল্লাহর আযাবের চাবুক মেরে তাদেরকে শায়েস্তা করা হলো। এসব উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াটা কোন "হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর" হাতে স্থায়ীভাবে দিয়ে দেয়া হয় নি। যার হাতে গোটা সৃষ্টিজগত পরিচালনার ক্ষমতা, তিনি মানব সমাজের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন। কোন জাতির উত্থান-পতন আল্লাহর তৈরি নিয়মেই হয়। কোন দেশের উপর আল্লাহ অনর্থক গযব নাযিল করেন না। একটা সীমা পর্যন্ত তিনি অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন। আল্লাহর অবাধ্যতা যখন ঐ সীমা পার হয়ে যায়, তখন শক্ত হাতে তিনি পাকড়াও করেন, যেমন আ'দ ও সামূদ জাতি ও ফিরআউনের বেলায় করেছেন।

এভাবে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ পাক মানুষকে বুদ্ধি-জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা ও নীতিবোধ দিয়ে ভাল মন্দ কাজ করার ক্ষমতাসহ দুনিয়ায় একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেন নি। তাই দেখা যায় যে, একটা সীমা পর্যন্ত সহ্য করার পর তিনি যালিম, দুষ্কৃতকারী জাতি, দল ও ব্যক্তির উপর গযব নাযিল করেন এবং আর কোন অন্যায় করার সুযোগ দেন না। যিনি দুনিয়াতেই এভাবে পাকড়াও করেন, তিনি পরকালে এমনি ছেড়ে দেবেন বলে মনে করার পক্ষে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না।

(৩) ১৫ ও ১৬ আয়াতে দুনিয়াদার লোকদের একটা মস্তবড় ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির ধার ধারে না, তারা দুনিয়ার জীবনটাকেই সব কিছু মনে করে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আল্লাহর দেয়া উপদেশকে ভুলে গিয়ে নিজেদের মনগড়া ধারণা নিয়ে জীবন কাটায়। দুনিয়ার বস্তুগত সুখ-শান্তিই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। টাকা-পয়সা বেশী থাকলেই তারা মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। আর সামান্য অভাব হলেই মনে করে তাদেরকে অপমান করা হয়েছে।

মান-সম্মানটা তাদের মতে টাকা-পয়সার সাথে জড়িত। এটাই দুনিয়াদারদের মনোভাব।

www.bjilibrary.com

তাই দেখা যায় যে, চরিত্রের দিক দিয়ে পশুর চেয়ে অধম লোকও টাকা-পয়সার কারণে দুনিয়াদারদের কাছে সম্মান পায়। উন্নত চরিত্রের লোক গরীব হলে তাদের কাছে সামান্য সম্মানও পায় না।

"আমার রব আমাকে সম্মান দিয়েছেন বা অপমান করেছেন" বলে দুনিয়াদারদের যে কথা এ দুটো আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে। কিন্তু দুনিয়ায় ধনী ও গরীব হবার ব্যাপারে আল্লাহর ধারণাকে ঠিক মনে করে না। এ দ্বারা আরও একটা কথা বুঝা যায় যে, তারা গরীব হলে আল্লাহকে দোষ দেয় এবং বলে যে, "না জানি কি দোষ করেছি।" ভাবখানা এমন যে, দোষ তো করিই নি, করেছি বলে জানিও না অর্থাৎ দুনিয়াদাররা নিজেদের দোষ-ত্রুটি দেখে না। অভাব বা বিপদ হলে এর জন্য তারা আল্লাহকেই দোষী সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ পাক এ দুটো আয়াতে দুনিয়াদারদের ঐ ভুল ধারণা দূর করে বলেছেন যে, দুনিয়াতে কোন সময় মানুষের খুব ভাল অবস্থা থাকে, আবার কোন সময় অভাব দেখা দেয়। দুনিয়ায় আল্লাহর বেশী নিয়ামাত পাওয়াটা কোন পুরস্কার নয় এবং রিযিকের অভাবটাও কোন শাস্তি নয়। টাকা-পয়সা বেশী থাকাটা সম্মানের লক্ষণ নয়। আর কম থাকাটাও অপমানের ব্যাপার নয়। আসলে এ দুটো অবস্থাই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। ধন দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে, সে শোকর করে কি না এবং এ ধন আল্লাহর মরযী মতো খরচ করে কি না। অভাব দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে, অভাবের মধ্যে সে সবর করে কি না, অভাবের কারণে তার স্বভাব নষ্ট হয় কি না, সে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে কি না এবং আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহী হয় কি না। আল্লাহ যখন পরীক্ষা করেন, তখন এর ফলও নিশ্চয়ই দেবেন। ফল না দিলে পরীক্ষার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু পরীক্ষার ঐ ফল এ দুনিয়ার জীবনে দেবার জিনিস নয়। আখিরাত এ জন্যই জরুরী। পরীক্ষায় যারা পাস করলো, তারা সেখানে পুরস্কার পাবে, আর যারা ফেল করলো, তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে।

(৪) ১৭-২০ আয়াতে দুনিয়াদারদের আরও একটা বড় দোষের বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা সুযোগ পেলেই ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে দখল করে বসে। গরীব-মিসকীনদের জন্য তাদের কোন দরদ নেই। দুর্বল পাওনাদারকে এরা তাড়িয়ে দেয়। মালের মহব্বতে এরা এমন পাগল যে, যত ধন-দৌলতই থাকুক, এদের টাকা-পয়সার পিপাসা কখনও মেটে না। এ জাতীয় নির্দয় লোকদের কার্যকলাপের হিসাব কেন নেয়া হবে না ? তাদের শাস্তির জন্য পরকাল অবশ্যই জরুরী।

(৫) ২১-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ অবশ্যই নেয়া হবে এবং সে কারণেই কিয়ামাত দরকার। সেখানে আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। আজ যারা পুরস্কার ও শাস্তিকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে না, সেদিন তারা এর সত্যতা ঠিকই টের পাবে। কিন্তু তখন বুঝলেও কোন লাভ হবে না। তারা তখন আফসোস করে বলবে, "হায়, যদি পরকালের এ জীবনের জন্য দুনিয়ায় থাকাকালে কিছু ব্যবস্থা করতাম।" কিন্তু এ অনুতাপ তাদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

(৬) ২৭-৩০ আয়াতে আল্লাহর ঐ নেক বান্দাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা উপরে বর্ণিত দুনিয়াদারদের মতো নয়। তারা মনে-প্রাণে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতে বিশ্বাসী। মনে পূর্ণ আবেগ ও তৃপ্তিবোধ নিয়ে তারা আল্লাহর পথে চলে। আল্লাহ পাক আদালতে আখিরাতে তাদেরকে মহব্বতের সাথে ডেকে বলবেন, "হে প্রশান্ত আত্মা, তোমাদের রবের কাছে এসো। আজ আমি তোমাদেরকে পুরস্কার দিয়ে আনন্দিত, তোমরা খুশী হয়ে পুরস্কার নাও। তোমরা আমার প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং বেহেশতে যেয়ে সুখে-শান্তিতে চিরদিন থাক।"

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফাজর

সূরা ঃ ৮৯ — মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৩০ — মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سورة الفجر

رقمها : ٨٩ — مكية

ركوعها : ١ — اياتها : ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

১-২-৩-৪. কসম ফজরের। কসম দশ রাতের। কসম জোড় ও বেজোড়ের। কসম রাতের, যখন সে বিদায় নেয়।

৫. এ সবের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি কোন কসম আছে ?[১]

৬-৭. (হে রাসূল) আপনি কি দেখেন নি আপনার রব কী ব্যবহার করেছেন উঁচু থামওয়ালা ইরাম বংশীয় আদ জাতির সাথে ?

৮. যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ায় পয়দা করা হয় নি ?

৯. আর (কী ব্যবহার করেছেন) সামুদ জাতির সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর খোদাই করেছিল ?

১০. আর কীলকধারী❖ ফিরআউনের সাথে (কী ব্যবহার করেছেন) ?

১১. এরা ঐ সব লাক, যারা দেশে দেশে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছিল।

১২. এবং সেখানে ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল।

১৩. শেষে আপনার রব তাদের উপর আযাবের চাবুক মেরেছিলেন।

١ـ٢ – وَالْفَجْرِ ۙ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ

٣ـ٤ – وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ

٥ – هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ؕ

٦ – اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ

٧ – اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۙ

٨ – الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۙ

٩ – وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۙ

١٠ – وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۙ

١١ – الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۙ

١٢ – فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۙ

١٣ – فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۚ

১। সামনের আয়াতগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় নিয়ে রাসূল (সা.) ও কাফিরদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল এবং রাসূল (সা.)-এর প্রমাণ দিচ্ছিলেন, আর কাফিররা তা মানতে অস্বীকার করছিল। এ বিষয়ে চারটি জিনিসের কসম খেয়ে বলা হয়েছে যে, এ মহাসত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য এরপর আরও সাক্ষীর কি দরকার আছে ?

❖ ফিরআউনের সেনাবাহিনী তাকে এমন শক্তিশালী করেছিল যেমন খুঁটি, পেরেক বা কীলক দিয়ে কোন জিনিসকে মজবুত করে রাখা হয়।

www.bjilibrary.com

১৪. আসলে আপনার রব ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে আছেন।[২]	١٤- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞
১৫. কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে ইযযত ও নিয়ামাত দেন, তখন সে বলে আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।	١٥- فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۞
১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন ও তার রিযক কমিয়ে দেন, তখন সে বলে আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।[৩]	١٦- وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۞
১৭. কক্ষনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না।	١٧- كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۞
১৮. এবং মিসকীনকে খানা খাওয়াবার জন্যে একে অপরকে উৎসাহিত কর না।	١٨- وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞
১৯. আর তোমরা মীরাসের সমস্ত ধন-সম্পদ জমা করে খেয়ে ফেল।	١٩- وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۞
২০. আর তোমরা ধন-সম্পদের মোহে কাতর হয়ে পড়েছ।	٢٠- وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞

২। ঘাঁটি ঐ জায়গাকে বলে, যেখানে কোন লোক এজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, দুশমন আসলেই যেন হামলা করতে পারে অথচ দুশমন জানে না যে, তার উপর আক্রমণ করার জন্য কেউ ওঁৎ পেতে আছে। যারা যুলুম ও ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের জন্যও আল্লাহ পাক এভাবেই ওঁৎ পেতে আছেন। এরা একটুও অনুভব করে না যে, আল্লাহ তাদের সব কীর্তি দেখছেন। এরা নির্ভয়ে একের পর এক শয়তানী করে চলে। শেষ পর্যন্ত এরা যখন অন্যায়ের এমন সীমায় এসে পৌঁছে, যার পর আল্লাহ এদেরকে আর সহ্য করতে চান না, তখন হঠাৎ আল্লাহর আযাবের বেত তাদের উপর মারা হয়।

৩। মানে, এটাই মানুষের জড়বাদী খেয়াল। দুনিয়ার ধন-দৌলত, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি পাওয়াকেই এরা ইযযত ও মান-সম্মান মনে করে আর এইগুলো না পাওয়াকে এরা অপমান বলে ধারণা করে। অথচ আসল সত্য যা এরা জানে না তা হলো এই যে, আল্লাহ পাক টাকা-পয়সা ও ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, মানুষ টাকা ও ক্ষমতা আল্লাহর মরযী মত ব্যবহার করে কি না। আর যখন আল্লাহ কাকেও গরীব করেন, তখনও পরীক্ষা করেন যে, এ অবস্থায় আল্লাহর বিধান সে মেনে চলে কি না।

২১-২৩. কক্ষনো নয়,[৪] যখন জমিনকে ভেঙ্গে রেণু রেণু করে দেয়া হবে এবং আপনার রব আগমন করবেন এমন অবস্থায়, যখন ফেরেশতারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ঐ দিন দোযখকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে। কিন্তু তখন বুঝলেও আর কী (লাভ) হবে?

٢١- كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ

٢٢- وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ

٢٣- وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۗ

২৪. সে (তখন) বলবে ঃ "হায়! যদি আমি আমার এ জীবনের জন্য আগে কিছু ব্যবস্থা করতাম।"

٢٤- يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۚ

২৫. ঐদিন আল্লাহ যে আযাব দেবেন, তেমন আযাব আর কেউ দিতে পারবে না।

٢٥- فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ

২৬. আর আল্লাহ যেমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবেন, তেমন আর কেউ বাঁধবে না।

٢٦- وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۗ

২৭-২৮. (অপরদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা![৫] চল তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি (নিজের ভাল পরিণামের জন্য) সন্তুষ্ট, (আর তোমার রবের নিকট) পছন্দনীয়।

٢٧- يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ

٢٨- ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ

২৯-৩০. তুমি আমার (প্রিয়) বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

٢٩- فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۙ

٣٠- وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۧ

৪। মানে, তোমাদের এই ধারণা ভুল যে, তোমরা দুনিয়ায় এসব কিছু করে বেড়াবে আর কখনও এ বিষয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

৫। "নাফসে মুতমাইন্নাহ" মানে এমন মানুষ, যে কোন প্রকার সন্দেহ বা খটকা বোধ না করে মনের পুরো তৃপ্তি ও শান্তির সাথে আল্লাহ পাককে একমাত্র ইলাহ এবং রাসূলের আনীত দ্বীনকে একমাত্র হক দ্বীন হিসাবে মেনে নিয়েছে। [নাফস মানে দেহের দাবী। দেহ বস্তুর তৈরি বলে দুনিয়ার বস্তু ভোগ করার জন্য দেহের দাবী প্রবল। রূহ আল্লাহর দিকে মানুষকে টানে। বিবেক রূহেরই অপর নাম। নাফস মন্দের দিকে নিতে চাইলে রূহ বা বিবেক আপত্তি জানায়। নাফস ও রূহের এ লড়াই সব মানুষের জীবনেই দেখা যায়। এ লড়াইতে কোন সময় নাফসই জয়ী হয়, আবার কোন সময় রূহও জয়ী হয়। যদি নাফস সব সময়ই জয়ী হয়, তাহলে তাকে কুরআনে নাফসে আম্মারা বলা হয়েছে। (সূরা ইউসুফ, ৫৩ আয়াত)। যদি এক সময় নাফস ও আর এক সময় রূহ জয়ী হয়, তাহলে তাকে নাফসে লাওয়ামা (সূরা কিয়ামাহ, ২ আয়াত) বলা হয়েছে। আর যদি সব সময় রূহ-ই জয়ী হয়, তাহলে তাকে এ সূরায় নাফসে মুতমাইন্নাহ বলা হয়েছে। -অনুবাদক]

সূরা আল-বালাদ

নাম ঃ পয়লা আয়াতের 'বালাদ' শব্দ দিয়েই এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরার বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, এ সূরাটিও মাক্কী যুগের প্রথম ভাগের সূরা। কিন্তু একটি কথা থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় এ সূরাটি নাযিল হয়, যখন বিরোধীরা রাসূল (সা.)-এর উপর যুলুম চালাচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয় ঃ কুরআন পাকের এটা একটা মু'জিযা যে, একটা বিরাট বিষয় এ সূরায় ছোট ছোট কতক আয়াতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায়, মানুষের কাছে দুনিয়ারই বা স্থান কী, তা এখানে বুঝানো হয়েছে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) সূরাটি 'লা উকসিমু' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সূরা কিয়ামাহও (৭৫নং সূরা) একইভাবে শুরু হয়েছে। 'লা' অর্থ না। উকসিমু মানে, আমি কসম করে বলছি। এভাবে বললে বুঝা যায় যে, কোন কথাবার্তা চলছিলো, যার প্রতিবাদে কসম করে বলা হচ্ছে যে, "তোমরা যা বলছ, তা কখনো ঠিক নয়, বরং আমি অমুক জিনিসের কসম করে বলছি যে, আসল কথা এই।"

এখন প্রশ্ন হলো যে, কাফিরদের কোন্ কথাটির প্রতিবাদ এখানে করা হয়েছে? পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, তারা বলতো যে, "আমরা যেভাবে জীবন কাটাচ্ছি এবং বাপ-দাদারাও যেভাবে কাটিয়ে গেছে, তাতে ভুল কোথায়?" দুনিয়ায় যদ্দিন আছি খাব-দাব মজা করব, যতটা সম্ভব আরামে থাকার চেষ্টা করব। মওত আসলে মরে শেষ হয়ে যাব। পরকালের ধান্দায় জীবনটা নষ্ট করব কেন? এ কথার প্রতিবাদে পয়লা বলা হচ্ছে যে, তোমাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল। এরপর এ আয়াতে এই শহরের কসম করছি বলে মাক্কা শহরের নামে কসম খাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এ শহরেই রাসূল (সা.)-এর প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, সে কথা উল্লেখ করে তৃতীয় আয়াতে পিতা ও সন্তানের কসম করা হয়েছে। পিতা ও সন্তান মানে আদম (আ.) ও তাঁর সন্তান অর্থাৎ মানব জাতি। এসব কসম খেয়ে যে মহাসত্যকে তুলে ধরা হয়েছে, তা চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনটা মানুষের ভোগ ও আরামের উদ্দেশ্যে দেয়া হয় নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অগণিত দুঃখ ও কষ্ট, দেহ ও মনের শ্রম, ক্লান্তি ও শান্তি এবং বহু উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে মানুষকে জীবন কাটাতে বাধ্য করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনটা ফুলের বিছানা নয়, কাঁটায় ভরা।

আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার মজায় লিপ্ত থাকাটা অতি বড় বোকামি। এ দ্বারা দু'রকম বিরাট ক্ষতি হবে। একদিকে সে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পরওয়া না করে দুনিয়ার জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট পেল তার জন্য আখিরাতে কোন বদলা পাবে না। অথচ আল্লাহ্ পাক দুঃখ-কষ্টে ভরা দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য যেটুকু আরাম ও সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন, সেটুকু যদি আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে ভোগ করা হয়, তাহলে সে দু'ভাবে পরকালে লাভবান হবে। আল্লাহর মরযী মতো দুনিয়া ভোগ করার জন্যও পরকালে সে পুরস্কার পাবে, আর দুনিয়ার ছোট-বড় সব দুঃখ-কষ্টের বদলায় সেখানে অফুরন্ত নিয়ামাত পাবে।

www.bjilibrary.com

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফিরদের যে কথার প্রতিবাদ সূরার শুরুতে করা হয়েছে, তার সাথে মাক্কা শহর ও আদম সন্তানের কসম খাওয়ার সম্পর্ক কী? এ কসমের দ্বারা আল্লাহ পাক মাক্কাবাসীদেরকে বুঝাতে চান যে, সবাই যদি 'খাও-দাও মজা কর' নীতিতেই জীবন কাটাতো, তাহলে মানব জাতির মধ্যে কোন ভাল কাজই হতো না। তোমাদের এত শান্তির স্থান মাক্কা শহর কী তোমাদের মতো নাফসের গোলামদের দ্বারা কায়েম হতে পারতো ? তোমরা তো ভালভাবেই জান যে, আল্লাহর এক নেক বান্দার বিরাট কুরবানী ও দুঃখ-কষ্টের ফলে এ মাক্কা সারা আরবে একমাত্র নিরাপদ ও শান্তির স্থানে পরিণত হয়েছে। আরবের সব জায়গায় তোমরা মারামারি-কাটাকাটি দেখতে পাচ্ছ। মাক্কা শহরে মানুষের উপর অন্যায় ও যুলুম করা দূরের কথা, জীব-জানোয়ার পর্যন্ত এখানে নিরাপদ। মাক্কার এ মর্যাদা কি এমনি হয়েছে ? এর জন্যে ইবরাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর মা'র কত বড় বড় ত্যাগ রয়েছে, তা কি তোমরা জানো না ?

তেমনিভাবে তোমাদের বাপ আদমকেও বহু কষ্ট করে দুনিয়ায় আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপনের শিক্ষা নিতে হয়েছে। আদম সন্তানদের মধ্যে যারা এভাবে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার যোগ্য, তারাই দুনিয়ায় মানুষের কল্যাণ করে যায়। তোমাদের মতো প্রবৃত্তির দাসদের চরিত্র এমন যে, মাক্কার নিরাপদ শহরে পর্যন্ত নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হয়ে আল্লাহর রাসূলের উপর অত্যাচার করা জায়েয মনে করছো। অথচ তোমরা জানো যে, মুহাম্মদ (সা.) ঐ ইবরাহীম ও ইসমাঈলেরই বংশধর এবং তিনিও তাঁদের মতো একই মহান কাজে নিযুক্ত।

(২) ৫-৭ আয়াতে নাফসের গোলামদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এরা কি মনে করে যে, এদের উপর আর কোন শক্তি নেই ? এরা যা ইচ্ছা তাই করতে থাকবে, আর এদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই বলেই তাদের ধারণা ? এরা দুনিয়ায় নিজেদের বড়ত্ব প্রমাণ করার জন্য বাজে কাজে বহু টাকা-পয়সা খরচ করে এবং গর্ব করে বলে যে, "আমাদের সাথে কার তুলনা হয় ? আমরা অমুক অমুক কাজে কত সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছি।" দুনিয়ায় এটুকু বাহাদুরী দেখাবার জন্যই এরা অন্যায়ভাবে মাল জমায় এবং খারাপ পথে তা উড়ায়।

৭ম আয়াতে আবার আল্লাহ প্রশ্ন তুলে বলেন, "এরা কি মনে করে যে, এদের অন্যায় কামাই ও শয়তানী খরচের খবর আল্লাহর জানা নেই? এরা কিভাবে মাল জমা করেছে এবং কোন্ কোন্ কুপথে খরচ করেছে, তা কি দেখবার ও ধরবার কেউ নেই? সাথে সাথে পাকড়াও করা হচ্ছে না বলে কি একথা মনে করা ঠিক যে, কোন দিন ধরা হবেই না?"

(৩) ৮-১১ আয়াতে আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেছেন, "আমি কি মানুষকে সঠিক জ্ঞানের উপায় হিসাবে চোখ-মুখ দেই নি এবং এ সবের মারফতে বুঝবার শক্তি দেই নি, যার ফলে কোন্টা ভাল আর কোন্টা মন্দ, তা সে জেনে নিতে পারে ? বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তার সামনে সুপথ আমি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছি।

এক পথ মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। এ পথে যেতে নাফসের কোন বেগ পেতে হয় না, বরং নাফস খুব মজা পায়। আর এক পথ উন্নত চরিত্রের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পথ কঠিন। এ পথে চলতে হলে নাফসকে জোর করে দমিয়ে রাখতে হয়। এটাই মানুষের দুর্বলতা যে, সে সুপথকে কঠিন দেখে কুপথে চলাই সহজ মনে করে।

www.bjilibrary.com

(৪) ১২-১৬ আয়াতে একটি উদাহরণ দিয়ে সুপথে চলার বাধা কোথায়, তা বুঝানো হয়েছে। এ বাধাকে 'আকাবা' বলা হয়েছে। আকাবা ঐ কঠিন পথকে বলা হয়, যা পাহাড় ডিংগিয়ে যেতে হয়। আল্লাহর দেখানো সুপথকে এখানে পাহাড়ী পথের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, ঐ উন্নতির পথে যেতে হলে লোক-দেখানো খরচ (রিয়া), গর্বের উদ্দেশ্যে খরচ ও বাহাদুরী দেখাবার জন্য খরচ না করে নিজের মাল ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য খরচ করতে হবে।

কিন্তু যারা নাফসের খাহেশ মিটাবার উদ্দেশ্যে দেদার টাকা-পয়সা খরচ করে, তারা বিপদগ্রস্ত ও দুঃখী মানুষের উপকারে খরচ করতে চায় না। এখানেও তারা নাফস ও শয়তানের বাধা ডিংগাতে পারে না।

(৫) ১৭-২০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা নাফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তারা ঐ বাধা ডিংগিয়ে ইয়াতীম, মিসকীন ও দুঃস্থদের সাহায্য করে এবং ঈমানদারদের সাথে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়। তারা সুসংগঠিত উপায়ে সমাজকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একে অপরকে ধৈর্যের সাথে আন্দোলনে অগ্রসর হবার জন্য এবং জনগণের প্রতি দরদ নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ দেয়। যারা এ পথে চলে, তারাই আল্লাহর রহমত লাভ করে। আর যারা বিপরীত পথ ধরে, দোযখের আগুনই তাদের পরিণাম। তারা সে আগুনেই ঘেরাও হয়ে থাকবে, তা থেকে পালাতে পারবে না।

বিশেষ শিক্ষা

"মানব-জীবন ত্যাগের মাধ্যমেই সার্থক হয়, ভোগের মাধ্যমে নয়"।

ভোগের মধ্যে যে মজা, তা স্থায়ী তৃপ্তি দেয় না। ত্যাগের পথ কঠিন হলেও তাতেই স্থায়ী তৃপ্তি রয়েছে। ভোগের দ্বারা যোগ্যতা কমে, আর ত্যাগের দ্বারাই যোগ্যতা বাড়ে। যে কোন সাধনাই ত্যাগ দাবী করে। ভোগে মত্ত থাকলে কোন সাধনা করারই যোগ্যতা থাকে না।

উচ্চ ডিগ্রী এবং উজ্জ্বল সাফল্য তাদের ভাগ্যেই জুটে, যারা রাত-দিন পরিশ্রম করে আরামকে ত্যাগ করতে পেরেছে। সন্তানদেরকে সত্যিকার মানুষ করা ও যোগ্য বানাবার গৌরব সে-ই লাভ করতে পারে, যে তাদের প্রয়োজনে নিজের অনেক আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করে প্রয়োজনীয় খরচ যোগায়। দেশের কল্যাণ তাদের দ্বারাই সম্ভব হয়, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

ইতিহাসে তাদেরই গৌরব গাঁথা লেখা হয়, যারা ত্যাগের পথে মানব জাতির খিদমত করে। ত্যাগই হলো মনুষ্যত্বের পথ। ভোগ অবশ্যই পশুত্বের পরিচয় বহন করে।

দুনিয়ায় কাজের যোগ্য থাকার জন্য যতটুকু ভোগের দরকার, আল্লাহ ততটুকু ভোগকে 'ইবাদাত' বলে গণ্য করেছেন। আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করে ভোগ করাই হলো পশুত্ব।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-বালাদ

سورة البلد

সূরা ঃ ৯০ — মাক্কী যুগে নাযিল
মোট আয়াত ঃ ২০ — মোট রুকু ঃ ১

رقمها : ٩٠ — مكية
ركوعها : ١ — اياتها : ٢٠

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. না,[১] আমি এ শহরের কসম খাচ্ছি,	١- لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ
২. আর (অবস্থা এই যে, হে রাসূল!) আপনাকে এ শহরে (মাক্কায়) হালাল করে নেয়া হয়েছে।[২]	٢- وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ
৩. (আরও কসম খাচ্ছি) পিতার (আদম আ.-এর) ও সেই সন্তানের, যা তার ঔরসে জন্ম নিয়েছে।	٣- وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ
৪. আসলে আমি মানুষকে কঠিন কষ্ট ও পরিশ্রম করার জন্য পয়দা করেছি।[৩]	٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۗ
৫. সে কি মনে করে যে তার উপর কারো ক্ষমতা খাটবে না ?	٥- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ
৬. সে বলে, আমি ঢের মাল উড়িয়ে দিয়েছি।	٦- يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۗ
৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে নি ?[৪]	٧- اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۗ
৮-৯. আমি কি তাকে দুটো চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দিই নি ?[৫]	٨- اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ ٩- وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ

১। মানে, তোমরা যা মনে করে বসে আছ, আসল সত্য তা নয়।

২। হে রাসূল, যে মাক্কা শহরে জীব-জন্তুর জন্য পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে, সেখানে আপনার উপর যুল্‌ম করাকে জায়িয করে নেয়া হয়েছে।

৩। মানে, এ দুনিয়া মানুষের জন্য মজা করা ও সুখের বাঁশী বাজাবার জায়গা নয়, বরং পরিশ্রম, কষ্ট ও বিপদ-আপদ সহ্য করার জায়গা। সব মানুষই কোন না কোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য, কেউ এ থেকে মুক্ত নয়।

৪। অর্থাৎ এ সব অহংকারী লোকেরা কি বুঝে না যে, কোন মহাশক্তিমান আল্লাহ আছেন, যিনি দেখছেন যে, এরা কিভাবে ধন-সম্পদ কামাই করেছে, আর কোন পথে এসব খরচ করেছে ?

৫। মানে, আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি হাসিল করার উপায়-উপকরণ দান করিনি ?

www.bjilibrary.com

১০. আর তাকে কি আমি (ভাল ও মন্দ) দুটো সুস্পষ্ট পথ দেখাই নি ?

১১. কিন্তু সে কঠিন দুর্গম পাহাড়ি পথ পার হতে সাহস করে নি।

১২. আর তুমি সেই কঠিন দুর্গম গিরিপথটা সম্পর্কে কী জান ?

১৩. এটা হলো কোন ঘাড় (দাস)কে গোলামী থেকে মুক্ত করা।

১৪-১৬. অথবা ভুখা থাকার দিন কোন নিকটবর্তী ইয়াতীমকে বা কোন ধূলিমলিন-মিসকীনকে খানা খাওয়ানো।

১৭. এরপর ঐ লোকদের মধ্যে শামিল হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং একে অপরকে সবর করার ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) দয়া করার উপদেশ দিয়েছে।

১৮-১৯. এরাই হচ্ছে ডান দিকের লোক। আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছে, তারাই হচ্ছে বামদিকের লোক।[৬]

২০. তাদের উপরই আগুন ছেয়ে থাকবে।

١٠- وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

١١- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۖ

١٢- وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۗ

١٣- فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ

١٤- اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۙ

١٥- يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ

١٦- اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ

١٧- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۗ

١٨- اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۗ

١٩- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۗ

٢٠- عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۧ

৬। ডানদিক ও বামদিক মানে, ডান হাতের দিক ও বাম হাতের দিক। হাশরের ময়দানে নেক লোকদেরকে আল্লাহর দরবারের ডান দিকে এবং বদ লোকদেরকে বাম দিকে রাখা হবে। আরবি পরিভাষায় ডান দিকের লোক মানে, সম্মানিত, বিশ্বস্ত ও ভাগ্যবান লোক। আর বাম দিকের লোক মানে হেয়, দুর্ভাগা, অশুভ ইত্যাদি। "সে আমার ডানহাত" বললে প্রশংসা বুঝায় এবং "এ কাজটা তো আমার বাম হাতের লেখা" বললে অবহেলা বুঝায়। আরবিতেও এ জাতীয় অর্থে ডান ও বাম শব্দ ব্যবহার করা হয়।

www.bjilibrary.com

সূরা আশ-শামস

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটিই এ সূরার নাম।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ মাক্কী যুগের যে সময় ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা বেশ জোরে-শোরে চলছিলো, সে সময় সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। নেকী ও বদীর (সৎকাজ ও অসৎ কাজের) পার্থক্য এবং যারা এ পার্থক্য না বুঝে অসৎ পথে চলে, তাদের পরিণাম।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৭ আয়াতে আল্লাহ পাক সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, আসমান ও যমীন এবং মানুষের নাফস ও তার স্রষ্টার কসম খেয়ে বলতে চাচ্ছেন যে, এ সবের প্রত্যেকটারই নিজস্ব স্বভাব রয়েছে। আকারে ও প্রকারে যেমন এরা একরকম নয়, কাজ-কর্মে এবং পরিণামেও এরা এক নয়।

(২) ৮-১০ আয়াতে ঐ কথাটি বলা হয়েছে, যে কথার জন্য এতগুলো বিষয়ের কসম খাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে পয়দা করে অন্ধকারে ছেড়ে দেয়া হয় নি। মানুষের ফিতরাত বা প্রকৃতির মধ্যেই ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝবার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত এবং আসমান ও যমীন যেমন একটা আর একটার বিপরীত, তেমনি 'ফুজুর' ও 'তাকওয়া' বা বদী ও নেকী, কুপথ ও সুপথ, পাপ ও পুণ্য কখনো এক হতে পারে না এবং এর পরিণাম ও ফলাফল কিছুতেই এক হবে না।

এ অবস্থায় মানুষের সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ, শান্তি ও অশান্তি একই ধরনের কাজের ফল নয়। তারাই সফলতা লাভ করবে, যারা নাফসকে পবিত্র করেছে এবং বিবেকের কথামতো তাকওয়ার পথে চলেছে। আর যারা বিবেককে দাবিয়ে রেখে কুপ্রবৃত্তির তাকিদে পাপ পথে চলেছে, তারা অবশ্যই বিফলতা ও অশান্তি ভোগ করবে।

(৩) ১১-১৫ আয়াতে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। তাকওয়ার পথে চলা শেখাবার জন্য তিনি রাসূলও পাঠিয়েছেন। কিন্তু যারা নাফসকে পবিত্র করে না, বরং বিবেককে দমন করে রাখে, তারা রাসূলকেও অমান্য করে।

এ প্রসঙ্গে সামূদ জাতির উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, হযরত সালিহ (আ.) সামূদ জাতিকে তাকওয়ার পথে চলার জন্য যখন উপদেশ দিলেন, তখন তারা তাঁকে রাসূল বলেই মানতে রাযী হলো না। তারা তাঁর নিকট রাসূল হবার প্রমাণ দাবী করলো। হযরত সালিহ (আ.) একটি উটনীকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করলেন এবং সাবধান করে দিলেন যে, ঐ উটনীর কোন ক্ষতি করলে তাদের উপর আল্লাহর গযব পড়বে। এ সত্ত্বেও তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেললো এবং এর পরিণামে সামূদ জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন।

সামূদের এই কাহিনীর মাধ্যমে মাক্কাবাসী ইসলাম বিরোধীদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তোমরা ঐ ব্যবহারই করছো, যা হযরত সালিহ (আ.)-এর সাথে সামূদ জাতি করেছিলো। তোমরা কি তাহলে ও ভাবেই ধ্বংস হতে চাও ? এখনও সময় আছে, বাঁচতে হলে ঈমান আন।

www.bjilibrary.com

সূরা আশ-শামস	سورة الشمس
সূরা ঃ ৯১ — মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ٩١ — مكية
মোট আয়াত ঃ ১৫ — মোট রুকু ঃ ১	ركوعها : ١ — اياتها : ١٥
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কসম সূর্য ও এর রোদের।	١- وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ○
২. কসম চাঁদের, যখন সে এর (সূর্যের) পেছনে পেছনে আসে।	٢- وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ○
৩. কসম দিনের, যখন সে তাকে (সূর্যকে) উজ্জ্বল করে।	٣- وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ○
৪. কসম রাতের, যখন সে তাকে (সূর্যকে) ঢেকে দেয়।	٤- وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ○
৫. কসম আসমানের এবং যিনি একে কায়েম করেছেন, তাঁর।	٥- وَالسَّمَاۤءِ وَمَا بَنٰهَا ○
৬. কসম জমিনের এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন, তাঁর।	٦- وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ○
৭. কসম (মানুষের) নাফসের এবং যিনি তাকে ঠিকঠাক ভাবে তৈরি করেছেন, তাঁর।[১]	٧- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ○
৮. তারপর তিনি তার গুনাহ ও তাকওয়া তার উপর ইলহাম করেছেন।[২]	٨- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ○
৯. অবশ্যই সে সফলকাম হয়েছে, যে তার (নাফসকে) পরিশুদ্ধ করেছে।	٩- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○

১। মানে, তাকে এমন শরীর , মগয ও জ্ঞান-বুদ্ধি এবং এমন সব শক্তি ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, যার ফলে সে দুনিয়ায় ঐ সব কাজ করার উপযুক্ত হয়েছে, যা মানুষের করণীয়।

২। এখানে ইলহাম করার দু'রকম অর্থ হতে পারে। এক অর্থ স্রষ্টা মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ এবং এ দু'রকম ইচ্ছা, আগ্রহ ও মনোভাব পয়দা করেছেন। আর এক অর্থ প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে চরিত্র ও নৈতিকতার ব্যাপারে ধারণা দান করেছেন যে, কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ।

ভাল চরিত্র ও ভাল আমল এবং মন্দ চরিত্র ও মন্দ আমল এক রকম হতে পারে না। কুকর্ম (ফুজুর) অবশ্যই খারাপ এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকা (তাকওয়া) নিশ্চয়ই ভাল। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা মানুষের নিকট অজানা নয়। বরং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির নিকট তা অতি পরিচিত। আল্লাহ পাক জন্মগতভাবেই মানুষকে ভাল ও মন্দের স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

১০. আর সে বিফল হয়েছে, যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে।[৩]	١٠- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝
১১. সামূদ (জাতি) নিজেদের বিদ্রোহের দরুন (নাবীকে) মিথ্যা বলে অমান্য করেছে।	١١- كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ۝
১২-১৩. যখন ঐ জাতির সবচেয়ে হতভাগা দুষ্ট লোকটা ক্ষেপে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন ঃ আল্লাহর উটনীর উপর হাত তুল না এবং তাকে পানি খেতে (বাধা দিও না)।	١٢- اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝ ١٣- فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝
১৪. কিন্তু তারা তাঁর কথাকে মিথ্যা গণ্য করলো এবং উটনীকে মেরে ফেললো, অবশেষে তাদের পাপের ফলে তাদের রব তাদের উপর মহাবিপদ চাপিয়ে দিলেন এবং তাদের সবাইকে এক সাথে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।[৪]	١٤- فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۥ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۝
১৫. আর (আল্লাহ তাঁর এ কাজের) কোন খারাপ পরিণতির ভয় করেন না।❖	١٥- وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

৩। নাফসকে পবিত্র করার অর্থ হলো একে সকল মন্দ থেকে পাক করা এবং যা ভাল তা এর মধ্যে বাড়িয়ে দেয়া। আর নাফসকে চাপা দেয়া অর্থ হলো, কুপ্রবৃত্তি বা কুমতিকে আরও উস্কিয়ে দেয়া এবং সুমতিকে চাপা দিয়ে রাখা।

৪। ঐ ঝগড়াটে লোকটি জনগণের ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে মেরে ফেলেছিল বলে গোটা দেশবাসীর উপরই আযাব নাযিল হয়েছিল। সূরা কামারের ২৯ আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে।

❖ এ আয়াতের আর একটি অর্থ হতে পারে, আল্লাহ তাদের পেছনে লেগে থাকতে ভয় পান না। অর্থাৎ গোটা সামূদ জাতিকে শাস্তি দিতে গিয়ে দুনিয়ার বাদশাহদের মতো তিনি ঘাবড়ান না বা এর কোন কুফলেরও ভয় করেন না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-লাইল

নাম ঃ পয়লা শব্দটি দিয়েই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ সূরা আশ-শামসের সাথে এ সূরার এত মিল যে, মনে হয় এ দুটো সূরা কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়েছে। একই কথাকে দু'রকম ভাবে এ দু'টি সূরাতে বুঝানো হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ মূল আলোচ্য বিষয় আখিরাত। মানব জীবনের দু'রকম পথের পার্থক্য এবং এর পরিণাম ও ফলাফলের পার্থক্য।

আলোচনার ধারা ঃ আলোচনার বিষয়ে সূরাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১-১১ আয়াত এক ভাগ, আর ১২-২১ আয়াত আর এক ভাগ। প্রথম ভাগে নৈতিকতা ও চরিত্রগত দিক দিয়ে মানুষের বাস্তব কাজ-কর্মের পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

(১) ১-৪ আয়াতে রাত ও দিন এবং নর ও নারীর কসম খেয়ে বলা হয়েছে যে, রাত ও দিন এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোক যেমন এক নয়, তেমনি সব মানুষের চরিত্রও এক রকম নয়।

(২) ৫-৭ আয়াতে অতি অল্প কথায় মাত্র তিনটি কাজের উল্লেখ করে এক ধরনের চরিত্রের পরিচয় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, "যারা সুপথে মাল খরচ করে, আমাকে ভয় করে চলে এবং যা কিছু ভাল, তাকে সঠিক বলে মেনে নেয়, তারা যেহেতু নিজেরা ইচ্ছা করেই এ কঠিন পথে চলতে চেষ্টা করেছে, সেহেতু এ পথকে আমি তাদের জন্য সহজ করে দেব।"

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, সৎ পথে চলা আসলে কঠিন নয়। এ পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়াটাই কঠিন। যা ভাল, তাকে সবাই ভাল বলতে বাধ্য। কিন্তু ভালকে মেনে চলাটা সহজ নয়। কারণ, যে সমাজ ইসলামী নয়, সে সমাজে কুপথে চলাই সহজ। পরিবেশই মানুষকে কুপথে নিয়ে যায়। কিন্তু ঐ পরিবেশেও যে ঈমানের পথে চলার ফায়সালা করে, তার জন্য আল্লাহ পাক এ পথকে সহজ করে দেন।

(৩) ৮-১০ আয়াতে অন্য তিনটি কাজের উল্লেখ করে আর এক ধরনের চরিত্রের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, "যারা ভাল কাজে খরচ করার বেলায় কৃপণ, আর যারা আমার কোন ধারই ধারে না এবং যা ভাল, তাকে অগ্রাহ্য করে, তারা নিজেরাই যেহেতু এ পথ বেছে নিয়েছে, সেহেতু এ পথে চলাও তাদের জন্য সহজ করে দেব।"

এখানে বুঝানো হয়েছে, মানুষকে ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা দেবার ফলে তাদের বিবেক তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার তাকিদ দেয়। তাই বিবেককে অগ্রাহ্য করে কুপথে চলা সহজ নয়। কিন্তু যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে না, তাদের বিবেক ধীরে ধীরে মরেই যায় এবং তখন তাদের স্বভাব এমন হয়ে যায় যে, সৎ গুণকে সৎ বলে মনে করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। কুপথে চলাই তাদের কাছে সহজ মনে হয়। তখন বিবেকও আর দংশন করে না।

(৪) ১১ নম্বর আয়াতে অত্যন্ত দরদের সাথে একটা মহাসত্য বুঝানো হয়েছে। দুনিয়ার লোভই মানুষকে এমন বিবেকহীন ও বোকা বানিয়ে দেয় যে, সে এ সামান্য কথাটুকুও খেয়াল

www.bjilibrary.com

করে না।

যে মালের পেছনে সে এমন পাগল হয়ে কুপথে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে, সে মাল মরার পর তার কোন্ কাজে আসবে ? এ সত্যটুকু যদি মানুষ ঠিকমতো বুঝে, তাহলে তাকওয়ার পথে চলা তার জন্য কঠিন মনে হবে না।

(৫) ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "মানুষকে হিদায়াত করা বা সঠিক পথ দেখানো আমারই দায়িত্ব।" কিতাব ও রাসূল পাঠিয়ে আমি সে দায়িত্ব পালন করেছি। মানুষকে আমি শুধু ভাল ও মন্দ পথ চিনবার মতো বিবেক দিয়েই ক্ষান্ত হই নি। কিতাব ও রাসূল পাঠানোও দরকার মনে করেছি।

(৬) ১৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আখিরাত ও দুনিয়ার মালিক আমিই। মানুষ যদি আমার কাছে শুধু দুনিয়াই চায়, তা-ও আমারই হাতে রয়েছে। আর যদি আখিরাত চায়, তাহলে আমার দেয়া পথেই তা পাবে। এখন মানুষ কোন্টা আমার কাছে চায়, তা বাছাই করা তাদেরই দায়িত্ব।

(৭) ১৪-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে, "হে মাক্কাবাসী, তোমরা দোযখের আগুনে জ্বলতে থাক, এটা আমার পছন্দ নয় বলেই রাসূলের মারফতে আমি সাবধান করে দিয়েছি। এত কিছু করার পরও যারা রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা সত্যিই হতভাগা। আর এ হতভাগারাই আগুনে জ্বলবে।

(৮) ১৭-২১ আয়াতে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা মুত্তাকী এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে, তাদেরকে আগুন থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তাদেরকে এত পুরস্কার দেবেন যার ফলে তারাও সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

বিশেষ শিক্ষা

মানুষের হিদায়াতের পূর্ণ ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করেছেন। এ দায়িত্ব যে একমাত্র তাঁরই, সে কথা ১২নং আয়াতে মাত্র কয়েকটি শব্দেই প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ অত্যন্ত সুবিচারক। তিনি আখিরাতে মানুষের যে বিচার করবেন তাতে ইনসাফের যাবতীয় শর্ত পূরণ করবেন। এ ইনসাফেরই দাবী পূরণের জন্য তিনি দুনিয়াতে মানুষের জন্য হিদায়াতের যথেষ্ট বন্দোবস্ত করেছেন। এ ব্যবস্থা না করে আখিরাতে শাস্তি দিলে ইনসাফের দাবী পূরণ হতে পারে না।

মানুষের হিদায়াতের প্রয়োজনেই রাসূল ও কিতাব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোন কারণে যদি কোন লোকের নিকট রাসূলের শিক্ষা ও আল্লাহর কিতাবের বাণী না পৌঁছে, তাহলে যাতে মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করতে বাধ্য না হয়, সে জন্যই মানুষকে বিবেক দান করা হয়েছে। কোনটা ভাল ও কোন্টা মন্দ, তা বুঝবার যোগ্যতা দেবার ফলেই মানুষ কোন খারাপ পথে না বুঝেই চলে না। মন্দকে মন্দ বলে জানা সত্ত্বেও সে পথেই চলার সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য সে-ই দায়ী। তাই এর জন্য তাকে শাস্তি দিলে তা মোটেই অবিচার হবে না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-লাইল

সূরা ঃ ৯২ মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ২১ মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. কসম রাতের, যখন সে ঢেকে ফেলে।

২. কসম দিনের, যখন সে আলোকিত হয়।

৩. কসম তাঁর, যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

৪. আসলে তোমাদের চেষ্টা নানা রকমের।[১]

৫-৭. তবে যে (আল্লাহর পথে) দান করেছে ও (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) দূরে থেকেছে এবং যা ভাল, তাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে, তার জন্য আমি সহজ পথে চলার সুযোগ করে দেব।[২]

৮-১০. আর যে কৃপণতা করেছে ও (আল্লাহর প্রতি) বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে এবং যা ভাল তাকে মিথ্যা গণ্য করেছে তার জন্য আমি কঠিন পথে চলার সহজ সুযোগ করে দেব।[৩]

سورة الليل

مكية رقمها : ٩٢

اياتها : ٢١ ركوعها : ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١ – وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ

٢ – وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ

٣ – وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ

٤ – اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۗ

٥ – فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۙ

٦ – وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ

٧ – فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۗ

٨ – وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ

٩ – وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ

١٠ – فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۗ

১। মানে, যেমন দিন ও রাত এবং নর ও নারী একে অপর থেকে আলাদা ধরনের, তেমনি তোমরা যেসব পথে ও যে ধরনের উদ্দেশ্যে কাজ করছ, তাও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন এবং এর পরিণামও এক হতে পারে না।

২। অর্থাৎ যে পথ মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাবের সাথে খাপ খায়, সে পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেব এবং এর ফল হিসাবে বেহেশতে যাওয়াও আসান করে দেব।

৩। মানে ফিৎরাতের বিরুদ্ধে চলা তার জন্য সহজ করে দেব, যার পরিণামে সে বিনা বাধায় দোযখে যেয়ে পড়বে।

১১. আর ধন-সম্পদ তার কী কাজে আসবে, যখন সে একদিন ধ্বংসই হয়ে যাবে।	١١- وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ؕ
১২. নিশ্চয়ই পথ দেখানো আমারই দায়িত্ব।	١٢- اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۖ
১৩. আসলে আখিরাত ও দুনিয়ার মালিক আমিই।	١٣- وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى
১৪. তাই আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত আগুন থেকে সাবধান করে দিয়েছি।	١٤- فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ
১৫-১৬. যে মানতে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সে হতভাগা ছাড়া (ঐ আগুনে) আর কেউ জ্বলবে না।	١٥- لَايَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ ١٦- الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ
১৭-১৮. আর যে পবিত্র হবার উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, সেই অতীব পরহেযগার লোককে (ঐ আগুন) থেকে দূরে রাখা হবে।	١٧- وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ ١٨- اَلَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ
১৯. তার উপর কারো এমন কোন মেহেরবানী নেই, যার বদলা তাকে দিতে হবে।❖	١٩- وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ
২০. সে তো শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে।	٢٠- اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ
২১. অবশ্যই তিনি (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন।	٢١- وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۚ

❖ অর্থাৎ সে এ জন্য দান করে না যে, কেউ তার উপর দয়া করেছে এবং দয়ার বদলে তাকে দান করতে হচ্ছে। বরং সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়ই দান করে।

www.bjilibrary.com

সূরা আদ-দোহা

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটিকে নিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটি মাক্কী যুগের একেবারে প্রথম দিকের সূরা বলেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

আলোচ্য বিষয় ঃ মূল বিষয় রিসালাত ঃ রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দান ও ওহী বন্ধ থাকার দরুন তিনি যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন, তা দূর করা।

নাযিলের পরিবেশ ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কয়েক মাস ওহী আসা বন্ধ থাকায় রাসূল (সা.) খুব পেরেশান হন। তাঁর মনে এ চিন্তা ঢুকলো যে, না জানি আমার এমন কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে, যার কারণে আমার রব আমার উপর নারায হয়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন। এ সূরায় আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, "আপনার রব আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার উপর নারাযও হন নি।" সূরা মুয্‌যাম্মিল ও সূরা মুদ্দাসসির যে পরিবেশে নাযিল হয়, তাতে জানা যায় যে, ওহী নাযিল হবার ফলে রাসূল (সা.)-এর দেহ ও মনে খুব বেশী চাপ পড়তো। এসব সূরাই প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। তখনও ওহী গ্রহণের অভ্যাস ভালভাবে হয় নি। তাই প্রথম দিকে ঘন ঘন ওহী নাযিল হতো না। একবার ওহী আসার পর কিছু দিন বন্ধ রাখা হতো। এভাবে কয়েক বার ফাঁক দিয়ে দিয়ে ওহী নাযিলের পর যখন তিনি ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত হন, তখন ঘন ঘন ওহী নাযিল হয়।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে দিনের আলো এবং রাতের শান্তিময় নীরবতার কসম খেয়ে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, "আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওহী বন্ধ রাখা হয়নি।" দিন ও রাতের কসম খেয়ে একথা বুঝানো হয়েছে যে, দিনের আলোতে পরিশ্রম করার পর বিশ্রামের জন্য রাতের অন্ধকার দরকার। তেমনি ওহী আসার কারণে আপনার উপর এমন কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ে, যার ফলে আপনি শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যান। আপনার মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম দরকার। ওহী দিনের আলোর মতোই আপনাকে কাজে ব্যস্ত রাখে বলে মাঝে মাঝে রাতের মতো বিশ্রাম দেবার উদ্দেশ্যে ওহী বন্ধ রাখা হয়।

(২) ৪ নং আয়াতে রাসূল (সা.)-কে আরও উৎসাহ দেবার জন্য এক বড় সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় আপনাকে যেসব বাধা ও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না। আপনার আন্দোলনের পয়লা অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা ক্রমেই উন্নত হতে থাকবে। আপনার রব শিগগির আপনাকে এত কিছু দেবেন, যার ফলে আপনি খুশী হয়ে যাবেন। মাক্কা থেকে রাসূল (সা.)-এর মাদীনায় পৌঁছার পর থেকেই এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হতে শুরু হয়। মাক্কা বিজয়ের পর গোটা আরবে ইসলামের মহাবিজয়ের মাধ্যমে এ সুসংবাদ পূর্ণতা লাভ করে।

(৩) ৫-৮ আয়াতে পরম স্নেহের সুরে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় রাসূলকে অনুযোগ দিয়ে বলেছেন, "আপনার মনে এ চিন্তা ঢুকলো কি করে যে, আমি আপনাকে ত্যাগ করেছি বা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছি? আমি তো আপনার জন্ম থেকেই আপনার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে

www.bjilibrary.com

এসেছি। আপনি পয়দা হবার সময়ই ইয়াতীম ছিলেন। আমি আপনাকে লালন-পালনের সুবন্দোবস্ত করেছি। আপনি আমার পছন্দনীয় পথ চিনতেন না। আমি আপনাকে সে পথ দেখিয়েছি। আপনি গরীব ছিলেন, আমি আপনাকে ধনী বানিয়েছি। এসব থেকে প্রমাণ হয় যে, আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং কোন সময়ই আমার মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। বর্তমানে মাঝে মাঝে যে ওহী বন্ধ রাখি, তাও আপনার উপর দয়া করার কারণেই। সুতরাং ভবিষ্যতেও আমার মেহেরবানী জারী থাকবে। এ বিষয়ে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। যে কঠিন দায়িত্ব আপনার উপর দিয়েছি, তার পেছনে আমি আছি।"

(৪) ৯-১১ আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন। আসল উপদেশটি শেষ আয়াতে আছে। এতে বলা হয়েছে যে, আপনার উপর আমি যত নিয়ামাত দিয়েছি, তার বদলে আপনিও অন্যের উপর মেহেরবানী করুন। এ বিষয়ে ৯ ও ১০ আয়াতে দুটো উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, আপনি ইয়াতীম থাকাকালে যেমন আমি আপনার জন্য সুব্যবস্থা করেছি এর শুকরিয়া তখনই হবে যদি ইয়াতীমদের প্রতি আপনি দয়া করেন। আপনি গরীব থাকাকালে আমি আপনার অভাব দূর করেছি। আপনি গরীবদের খিদমাত করে এর শুকরিয়া আদায় করুন।

শেষ আয়াতে আল্লাহর নিয়ামাতের কথা প্রকাশ করার যে হুকুম করা হয়েছে, তার অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর মেহেরবানী মানুষ পাচ্ছে। গোটা দুনিয়া মানুষকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে। নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এমনকি দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক ইত্যাদিও এক প্রকার মেহেরবানী। এ দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং সংশোধন হওয়ার সুযোগ হয়। এ সবরকম অবস্থায় শুকরিয়া প্রকাশের ধরন এক রকম হতে পারে না। তবে সামগ্রিকভাবে কয়েক প্রকারে শুকরিয়া আদায় করা যায় ঃ

১। মুখে আলহামদু লিল্লাহ বলে এবং মনেও কৃতজ্ঞ ভাব নিয়ে এ কথা স্বীকার করা যে, যেটুকু সুখ-সুবিধা ভোগ করছি তা সবই আল্লাহর মেহেরবানীর ফল।

২। হিদায়াত পাওয়ার শুকরিয়া হলো পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার চেষ্টা করা।

৩। ধন-সম্পদের শুকরিয়া হলো হালাল পথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের পথে খরচ করা।

৪। স্বাস্থ্যের শুকরিয়া হলো জীবনটাকে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে লাগানো।

৫। রোগ-শোক ও বিপদে-আপদে শুকরিয়া হলো আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া এবং অপছন্দনীয় সবকিছু থেকে পাক হবার চেষ্টা করা।

সূরা আদ-দোহা

سـورة الـضحى

সূরা ঃ ৯৩ মাক্কী যুগে নাযিল

مكية رقمها : ٩٣

মোট আয়াত ঃ ১১ মোট রুকু ঃ ১

اياتها : ١١ ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১-২. উজ্জ্বল দিনের কসম, কসম রাতের, যখন সে শান্তভাবে ছেয়ে যায়।❖

৩. (হে-রাসূল) আপনার রব আপনাকে মোটেই ত্যাগ করেন নি, আর অসন্তুষ্টও হন নি।⁕

৪. নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরের অবস্থা আগের অবস্থার চেয়ে ভাল।

৫. শিগগিরই আপনার রব আপনাকে এত দান করবেন যে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন।

৬. তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নি এবং পরে আশ্রয় দেন নি?

৭. আর তিনি আপনাকে পথ না জানা অবস্থায় পেয়েছেন এবং তারপর পথ দেখিয়েছেন।

৮. তিনি আপনাকে গরীব অবস্থায় পেয়েছেন এবং পরে ধনী করে দিয়েছেন।

৯. কাজেই ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।

১০. আর যে চায়, তাকে ধমক দেবেন না।

১১. আপনার রবের নিয়ামাতের কথা প্রকাশ করুন।

١ – وَالضُّحٰى ۙ

٢ – وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ

٣ – مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ

٤ – وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ
مِنَ الْاُوْلٰى ؕ

٥ – وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ
فَتَرْضٰى ؕ

٦ – اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۖ

٧ – وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۖ

٨ – وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى ؕ

٩ – فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ؕ

١٠ – وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ؕ

١١ – وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ع

❖ سَجٰى 'সাজা' শব্দ দ্বারা রাতের অন্ধকার আসার সাথে সাথে রাতের নিঝুম নিরিবিলি অবস্থাও বুঝায়।

⁕ মানে, ওহী আসা কিছুদিন বন্ধ থাকার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করেছেন বা তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যেমন সব সময় দিনের আলো থাকলে মানুষের আরাম করা সম্ভব হতো না, তেমনি ওহীর আলোও সব সময় জারী থাকা ঠিক নয়। ওহীর কারণে রাসূল (সা.)-এর উপর দায়িত্বের যে বিরাট বোঝা পড়ে, মাঝে মাঝে ওহী বন্ধ থাকলে তাতে রাতের মতো কিছুটা বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। তাই ওহী বন্ধ থাকা দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি বুঝায় না।

www.bjilibrary.com

সূরা আলাম নাশরাহ

নাম ঃ পয়লা দুটো শব্দকেই এ সূরার নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এর আগের সূরাটির পরপরই এ সূরা নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ সূরা দোহার মতোই এ সূরার আলোচ্য বিষয় রিসালাত। এখানে রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ঃ রাসূল হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলন শুরু করতেই রাসূল (সা.)-কে যে কঠিন অবস্থায় পড়তে হলো এমন অবস্থায় নবুওয়াতের আগে তিনি কখনো পতিত হন নি। ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবার পর দেখতে দেখতেই সমাজ তাঁর দুশমনে পরিণত হলো। অথচ এর আগে ঐ সমাজে সবাই তাঁকে সম্মান করতো। আগে যেসব আত্মীয়, বন্ধু, বংশের লোক ও মহল্লাবাসীর কাছে তিনি আদরণীয় ছিলেন, তারাই তখন তাঁকে গালি দিতে লাগলো।

এখন মাক্কাবাসীরা তাঁর কথা শুনতেই চায় না। তাঁকে পথ দিয়ে যেতে দেখলে টিটকারি দেয়। পদে পদে তাঁর কাজে বাধা দেয়। আস্তে আস্তে এসব বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে আপন কাজে তিনি মযবুত হতে লাগলেন বটে, কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর মন ভেঙ্গে যাবার মতো অবস্থাই ছিলো। এ অবস্থায় রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথম সূরা আদ দোহা নাযিল হয় এবং এর পরপরই এ সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৪ আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে যে সব বড় বড় নিয়ামাত দিয়েছেন, তার মধ্যে তিনটি নিয়ামাতের উল্লেখ করে প্রশ্নের আকারে বলেছেন যে, আমি কি এসব নিয়ামাত আপনাকে দেই নি ? এসব বড় বড় মেহেরবানী পাওয়া সত্ত্বেও আপনার এমন মনমরা হবার কোন কারণ নেই।

(ক) প্রথম নিয়ামাত হলো, আমি আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছি। আপনাকে ইসলামের যে সুন্দর পথে চলার ব্যবস্থা করেছি, তা যে সত্য ও সঠিক এ ব্যাপারে আপনার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। যারা এখনও ইসলামের এ সৌন্দর্য বুঝতে পারছে না, তাদের বিরোধিতা ও দুর্ব্যবহারে আপনার মন ভেঙ্গে যাওয়া উচিত নয়। আপনি নিজে যখন ঠিক পথে আছেন, তখন অন্য লোকেরা যা-ই বলুক বা করুক, তাতে ঘাবড়াবার কী আছে ?

(খ) দ্বিতীয় নিয়ামাত হলো মানব সমাজের শান্তি ও কল্যাণের পথ না পেয়ে আপনি অনেক বছর যে রকম পেরেশান অবস্থায় কাটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত নির্জনে আমার কাছে ধরনা দিয়েছেন, সে পেরেশানী কি আমি দূর করে দেই নি ? সে পথ যখন পেয়ে গেছেন, তখন চিন্তার কোন কারণ নেই। সমাজকে সংশোধন করতে গেলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে, তারা বাধা দেবেই। আপনি এসব বাধার কারণে মন খারাপ করবেন না।

(গ) তৃতীয় নিয়ামাত হলো, আপনার সুনাম বৃদ্ধি করা এবং মানুষের মধ্যে আপনার মর্যাদা বাড়াবার ব্যবস্থা করা। আমি আপনাকে আমার রাসূল নিযুক্ত করেছি। মানুষ আপনাকে এ নামেই

www.bjilibrary.com

জানবে। আপনার নাম সারা দুনিয়ায় ছড়াবে। যারা আপনার উপর ঈমান আনবে, তারাই আপনার নাম উঁচু করবে। যারা এখনও ঈমান আনেনি, তারা আপনাকে গালি দিচ্ছে বলে আপনি মোটেই পেরেশান হবেন না। এটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র।

(২) ৫ ও ৬ আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, দুঃখের পরপরই সুখ আসে। দুনিয়ায় কোন সুখই দুঃখ ছাড়া লাভ করা যায় না। আপনি যে বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন, তার উপর মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি নির্ভর করে। এত বড় সফলতা কি বিনা বাধা ও বিনা কষ্টে সম্ভব? দুনিয়ায় আমি এ নিয়মই রেখেছি যে, উদ্দেশ্য যত মহান হবে, তার জন্য তত বেশী কষ্ট করতে হবে। আপনার সামনে এখন যত বড় কঠিন বাধা দেখা যাচ্ছে, তাতে চিন্তিত হবেন না। এসব মুশকিল বেশী দিন থাকবে না। ইসলামী আন্দোলনের পেছনে আমি রয়েছি। যথাসময়ে আসানী আসবে। আপনি আমার উপর ভরসা রেখে নিজের কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

(৩) শেষ দু' আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে এ কঠিন অবস্থার মধ্যে মনকে মযবুত করার জন্য কী করা দরকার সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ইসলামী আন্দোলনের কঠিন দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পান, তখনই আমার যিক্‌র করুন। আপনার মনকে আর সব চিন্তা-ধান্দা থেকে খালি করে আমার কথাই স্মরণ করুন। এতে আপনি মনে বল পাবেন এবং আন্দোলনের ঝামেলায় মনে যে ক্লান্তি ও পেরেশানী আসে, তা দূর হয়ে যাবে। তখন মনে শান্তি বোধ করবেন।

(সূরা রা'দ-এর ২৮ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "জেনে রাখ, একমাত্র আল্লাহর যিক্‌র দ্বারাই অন্তর শান্তি লাভ করে।")

বিশেষ শিক্ষা

আল্লাহ পাক দুনিয়ার জীবনে সুখ ও দুঃখকে এক সাথে মিলিয়ে রেখেছেন। এ দুটোকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। সুখ পেতে হলে দুঃখ সইতেই হবে। সফলতার সুখ পেতে হলে কঠোর পরিশ্রমের দুঃখকে বরণ করতেই হবে। জমি থেকে ভাল ফসল পাওয়ার মজা পেতে হলে কষ্ট করে জমিকে তৈরি করতে হবে। মা হওয়ার তৃপ্তি পেতে হলে সন্তান ধারণের যাতনা ও শিশুকে সেবা-যত্ন করার সাধনা ছাড়া উপায় নেই। এভাবেই দুনিয়ার প্রতিটি সুখকে দুঃখের সাথে মিশিয়ে রাখা হয়েছে।

কিন্তু আখিরাতে ঠিক এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হবে। ওখানে সুখ ও দুঃখকে এমনভাবে আলাদা করা হবে যে, এ দুটোকে এক সাথে মিলাবার কোন উপায় থাকবে না। বেহেশতের সুখ ও দোযখের দুঃখ একত্র হবে না। বেহেশতে শুধু সুখ, আর দোযখে শুধু দুঃখই থাকবে।

আল্লাহর বিধানকে দুনিয়ায় চালু করার মাধ্যমে জাতিকে শান্তি দেবার উদ্দেশ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনের কঠিন পথে পা দিয়েছে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সব সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতেই হবে। ইসলামী সমাজ কায়েম করার বিরাট গৌরব অর্জন করতে হলে সে অনুপাতেই বিরাট ত্যাগও স্বীকার করতে হবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আলাম নাশরাহ্

سـورة الم نـشرح

সূরা ঃ ৯৪ | মাক্কী যুগে নাযিল

رقمها : ٩٤ | مكية

মোট আয়াত ঃ ৮ | মোট রুকু ঃ ১

اياتها : ٨ | ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. (হে রাসূল) আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষকে খুলে দিই নি ?[১]

١ - اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

২-৩. আর আমি আপনার উপর থেকে আপনার ঐ ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল ।[২]

٢ - وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ

٣ - الَّذِیْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ

৪. আপনার খাতিরে আপনার (সুনামের) কথা উঁচু করে দিয়েছি।

٤ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ

৫. (আসল কথা হলো) নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে।

٥ - فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

৬. নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে।[৩]

٦ - اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ؕ

৭. তাই যখনই আপনি অবসর পান, তখনি ইবাদাত বন্দেগীর জন্য পরিশ্রমে লেগে যান।

٧ - فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ

৮. এবং নিজের রবের দিকেই গভীর মনোযোগ দিন।[৪]

٨ - وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ع

১। সিনা বা বুক খুলে দেবার কথা কুরআন শরীফে যত জায়গায় আছে, তার দিকে খেয়াল করলে মনে হয় যে, এর দু'রকম অর্থ রয়েছে ঃ

(ক) মন-মগযের সব রকম দ্বিধা ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের সত্যতার উপর নিশ্চিতভাবে পূর্ণ আস্থাবান হওয়া।

(খ) মনের উৎসাহ ও জীবনের উদ্দেশ্য হাসিলের আগ্রহ বেড়ে যাওয়া; কোন বড় রকমের অভিযান শুরু করতে বা কোন কঠিন কাজে হাত দিতে মনে দৃঢ়তা বোধ করা। বিশেষ করে নাবী হিসাবে যে কঠিন দায়িত্ব এসেছে, তা পালন করার জন্য মনে পূর্ণ সাহস ও প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া।

২। এর মানে হলো, নিজের দেশবাসীর মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধ বিরোধিতা দেখে রাসূল (সা.)-এর গভীর সংবেদনশীল মনে ব্যথা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার যে বোঝা চেপেছিল তাই। এ অবস্থায় তিনি মনে তীব্র বেদনা বোধ করছিলেন, কিন্তু জাতিকে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচাবার পথ পাচ্ছিলেন না। এ পেরেশানীর বোঝাই তাঁর পিঠকে যেন বাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আল্লাহ পাক মানুষের হিদায়াতের জন্য রাসূল (সা.)-কে ইসলামের এমন সুন্দর পথ দেখালেন, যার ফলে ঐ বেদনার বোঝা হালকা হয়ে গেল।

৩। যে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে রাসূল (সা.)-এর জীবন কাটছিল, সে অবস্থা যে বেশী দিন থাকবে না এবং অতি তাড়াতাড়ি ভাল অবস্থা যে আসবে, সে কথা জোর দিয়ে বলার উদ্দেশ্যেই এ কথাটি দু'বার বলা হয়েছে।

৪। মানে, যখনই আপনার কাজ থেকে অবসর পান, তখন সব দিক থেকে মনকে ফিরিয়ে আপনার রবের দিকে কেন্দ্রীভূত করুন এবং গভীরভাবে যিক্র ও ইবাদাতে মগ্ন হোন।

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তীন

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দ দিয়েই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ ঃ মাক্কী যুগের প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। তখনও ইসলামী আন্দোলনের দিকে প্রকাশ্য দাওয়াত দেয়া শুরু হয় নি। তাই বিরোধিতাও দেখা দেয় নি।

আলোচ্য বিষয় ঃ আখিরাতের পুরস্কার ও শাস্তির প্রমাণ।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে তীন ও যায়তুন নামক ফল, তূরে সীনা ও মাক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক যেসব জিনিসের কসম খান, তার সাথে পরবর্তী কথার সম্পর্ক থাকে। অর্থাৎ পরবর্তী কথাটির উপর জোর দেবার জন্যই কসম খাওয়া হয়।

তীন ও যায়তুন ফল ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় বেশী পরিমাণে পয়দা হয়। তূরে সীনাও ঐ এলাকার কাছাকাছি। এসব এলাকায়ই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় নবী ও রাসূল পয়দা হয়েছেন। আর মাক্কা শহরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো এক বিশ্বনবী আবাদ করেছেন। এখানেই হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কেন্দ্র ছিল। মুহাম্মদ (সা.) এ শহরেই পয়দা হয়েছেন এবং কাবা শরীফ এ শহরেই রয়েছে।

(২) ৪নং আয়াতে ঐ কথাটি বলা হয়েছে, যার সাথে উপরের কসমের সম্পর্ক রয়েছে। সে কথাটি হলো, "আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকারে পয়দা করেছি।" মানুষকে যে উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয়েছে এর উপযোগী শরীর ও মন-মগয দিয়েই পয়দা করা হয়েছে। মানুষের সাথে এ সব দিক দিয়ে কোন সৃষ্টির তুলনা নেই। এ মানুষের মধ্য থেকেই নবী ও রাসূল নিযুক্ত হন, যাঁরা ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মানুষকে এমন আকার ও প্রকৃতি দেয়া হয়েছে, যার ফলে সৃষ্টির সেরা হিসাবেই মানুষের পরিচয়। এ কথাটি বলার জন্যই ঐ সব জায়গার কসম খাওয়া হয়েছে, যেখানে নবী ও রাসূলগণের কেন্দ্র ছিল।

মানুষের যে উচ্চ মর্যাদার ইংগিত এ আয়াতটিতে আছে, এ জাতীয় কথা কুরআন পাকে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা হিসাবে পয়দা করা হয়েছে বলে বহু সূরায় আছে। যেমন বাকারা ৩০, আনআম ১৬৫, আ'রাফ ১১, হিজর ২৮, নামল ৬২। কোথাও বলা হয়েছে, মানুষকে আল্লাহর ঐ আমানতের বোঝা দেয়া হয়েছে, যা বহন করার ক্ষমতা আসমান, যমীন ও পাহাড়ের নেই (আহযাব ৭২)। কোথাও বলা হয়েছে, আমি মানুষকে ইযযত দান করেছি এবং সৃষ্টির সেরা বানিয়েছি (বনী ইসরাঈল ৭০)।

(৩) ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে এতসব মর্যাদার সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও এসব সম্মান লাভ করতে আল্লাহ পাক কোন মানুষকে বাধ্য করেন না। মানুষ যদি ইচ্ছা করে মন্দ পথে চলে, তাহলে তার নৈতিক অধঃপতন ঐ সীমাও পার হয়ে যেতে পারে, যা তাকে পশুর চেয়ে অধম বানিয়ে ছাড়ে। মানুষের মধ্যে দু'রকম সম্ভাবনাই আছে। আল্লাহর পথে সে ফেরেশতার চেয়েও উন্নত হতে পারে। আর উল্টো পথে চলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীবও হতে পারে।

www.bjilibrary.com

(৪) ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈমান ও নেক আমলই হলো ঐ পথ, যে পথে চলে অধঃপতন থেকে বাঁচা সম্ভব এবং মানুষের উচ্চ মর্যাদা লাভ করা সহজ। মানুষ হিসাবে যে দায়িত্ব দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে, তা পালন করার একমাত্র পথই এটা এবং যারা এ পথে চলবে আখিরাতের চিরস্থায়ী পুরস্কার তারাই পাবে।

(৫) শেষ দু'আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ কথা যখন সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষ এক ধরনের পথে চলে উত্তম হয়, আর অন্য ধরনের পথে চলে অধম হয়, তখন এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, এ দু'রকমের মানুষের পরিণাম দু'রকমই হতে হবে। যদি দু'রকমের লোকের পরিণাম একই হয়, তাহলে এর অর্থ হবে আল্লাহর রাজত্বে কোন বিচারই নেই, ইনসাফ তো দূরের কথা।

অথচ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও কান্ডজ্ঞান এটাই দাবী করে যে, ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি হতে হবে। তাহলে সব বিচারকের কাছ থেকে এর বিপরীত ব্যবহার কি করে হতে পারে ?

৭নং আয়াতের ইউকাযযিবুকা শব্দটির অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। ইউকাযযিবু অর্থ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, অবিশ্বাসী বানায়, মানতে অস্বীকার করায়। 'কা' অর্থ 'তুমি'। এখানে 'তুমি' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এ বিষয়েই মতভেদ হয়েছে। যদি 'তুমি' বলতে এখানে রাসূল (সা.)-কে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ এক রকম হয়। আর যদি 'তুমি' বলে মানুষকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ আর এক রকম হয়।

তাফহীমুল কুরআনে প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এর অর্থ করা হয়েছে, হে রাসূল! আখিরাতের বিচার ও কর্মফল সম্পর্কে আপনি যা বলছেন, সে বিষয়ে কে আপনার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে ? আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন ? তাহলে বিনা বিচারে মানুষকে ছেড়ে দেয়া হবে কেমন করে ?

যারা 'তুমি' শব্দ দ্বারা মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে বলে মনে করেন, তারা এ আয়াতকে ৪র্থ আয়াতের সাথে মিলিয়ে অর্থ করেন। ৪র্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর ছাঁচে পয়দা করেছেন। কিন্তু ঈমান ও নেক আমলের অভাবে মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই ঈমানদার ও নেক লোকদের পরিণাম এবং বেঈমান ও বদ লোকদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না। ৭নং আয়াতে ঐ মানুষকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, "হে মানুষ! আখিরাতে যে বিচার হবে, সে কথা তুমি কী কারণে অবিশ্বাস করছ ? কোন্ জিনিস তোমাকে ঐ বিষয়ে অবিশ্বাসী বানাচ্ছে ? কে তোমাকে আখিরাত অস্বীকার করতে বাধ্য করছে ?

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তীন

সূরা ঃ ৯৫ | মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৮ | মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১-২. তীন ও যায়তুনের[১] কসম। কসম সিনাই পর্বতের,❖

৩. কসম এই শান্তিপূর্ণ শহরের (মক্কার)।

৪. আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর কাঠামোতে পয়দা করেছি।

৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে সবচেয়ে নীচুদের চেয়েও নীচে নামিয়ে দিয়েছি।

৬. অবশ্য তাদেরকে ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনও শেষ হবে না।

৭. (হে রাসূল) অতঃপর (আখিরাতের) শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে কে আপনার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারে ?❊

৮. আল্লাহ কি সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক নন ?[২]

سـورة التين

مكية | رقمها : ٩٥

اياتها : ٨ | ركوعها : ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ
٢ - وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ
٣ - وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ
٤ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ
فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫
٥ - ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ
٦ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُوْنٍ ۗ
٧ - فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۗ
٨ - اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۧ

১। মানে, এ সব ফল যে দেশে বেশী পয়দা হয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনকেই এখানে বুঝানো হয়েছে, এ সব এলাকায় অনেক নবী পয়দা হয়েছেন।

❖ তূর এক পাহাড়ের নাম, যেখানে মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। এ পাহাড় যে এলাকায় অবস্থিত তা একটা বদ্বীপ, যা মিসরের মূল ভূখন্ড ও ফিলিস্তীনের মাঝখানে অবস্থিত। এ বদ্বীপটির নাম এ সূরায় সীনীন এবং অন্য এক আয়াতে সাইনা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত নাম সিনা বলে তরজমায় এ নামই ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় সিনাই পাহাড় নামেই বিখ্যাত।

❊ এ আয়াতের অনুবাদ এ রকমও হতে পারেঃ "(হে মানুষ) অতঃপর (আখিরাতের) কর্মফলের ব্যাপারে কোন্ জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী বানায়?

২। অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট বিচারকদের কাছ থেকেও যখন তোমরা ইনসাফ ও সুবিচার আশা কর, আর দাবী কর যে, দোষীকে শাস্তি দেয়া হোক এবং ভাল কাজের পুরস্কার দেয়া হোক, তখন আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কী ধারণা রাখ? তোমরা কি মনে কর যে, সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক ইনসাফ করবেন না? তোমরা কি মনে কর, ভাল ও মন্দ সবাইকে তিনি একভাবে দেখবেন? সবচেয়ে ভাল ও সবচেয়ে খারাপ মানুষকে মরার পর সমানভাবে মাটিতে পরিণত করবেন? কারো ভাল কাজের কোন পুরস্কার দেবেন না? আল্লাহ সম্বন্ধে এমন বাজে ধারণা তোমরা কিভাবে কর?

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আলাক

নাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতের আলাক শব্দ থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ নাযিলের সময়ের দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। পয়লা ৫ আয়াত হেরা গুহায় নাযিল হয়। এটাই রাসূল (সা.)-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী। সূরার বাকী ১৪টি আয়াত আরও পরে ঐ সময় নাযিল হয়, যখন রাসূল (সা.) কাবা শরীফে নামায আদায় শুরু করেন এবং আবু জাহল তাঁকে ধমক দিয়ে নামাযে বাধা দেবার চেষ্টা করে।

প্রথম ওহী ঃ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে জানা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর উপর সত্য স্বপ্ন দ্বারা ওহী আসা শুরু হয়। স্বপ্ন দেখার সময় তাঁর মনে হতো যেন দিনের আলোতে তিনি স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি নির্জনে থাকা পছন্দ করতে লাগলেন এবং হেরা গুহায় রাতের পর রাত ইবাদাতে কাটাতে থাকলেন।

একদিন হেরা গুহায় থাকাকালে হঠাৎ জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, 'পড়ুন'। হযরত আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিজের কথায় এর যে বিবরণ দেন, তা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

"ফেরেশতার কথার জওয়াবে আমি বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। তখন ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চাপ দিলেন যে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসল। তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'পড়ুন'। আবার আমি বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। তিনি আবার আমাকে চেপে ধরলেন। আমার দম বন্ধ হয়ে আসল। আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'পড়ুন'। আমি তখনও বললাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। ফেরেশতা তখন তৃতীয়বার আমাকে ঐ ভাবে চেপে ধরলেন, যার ফলে আমার সহ্য করা কঠিন হয়ে গেল। তখন তিনি ছেড়ে দিয়ে 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা' থেকে 'মা লাম ইয়া'লাম' পর্যন্ত পড়ে শুনালেন।"

এর পরের ঘটনা হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে এসে হযরত খাদীজা (রা.)-কে বললেন, "আমাকে কম্বল দিয়ে ঢাক"। কিছুক্ষণ কম্বল জড়িয়ে থাকার পর যখন ভয় দূর হলো, তখন তিনি বললেন, 'খাদীজা, আমার কী হলো'? তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বলার পর বললেন, "আমার জীবনের ভয় ধরে গেছে"। হযরত খাদীজা বললেন, কক্ষনো নয়। আপনার খুশী হওয়া উচিত। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে কখনও অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, আমানতের হিফাযত করেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব বহন করেন, গরীবদের অভাব দূর করেন, মেহমানদারী করেন এবং নেক কাজে হামেশা সাহায্য করেন।

এরপর হযরত খাদীজা (রা.) রাসূল (সা.)-কে ওয়ারাকা বিন নাওফালের কাছে নিয়ে যান। ওয়ারাকা হযরত খাদীজা (রা.)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। ওয়ারাকা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী ছিলেন এবং ইনজীলের বড় আলিম ছিলেন। সে সময় ওয়ারাকা খুব বৃদ্ধ ছিলেন, অন্ধও

www.bjilibrary.com

হয়ে গিয়েছিলেন। ওয়ারাকা সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, "আরে! এতো ঐ ফেরেশতা, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। হায় আফসোস! আপনার নবুওয়াতের সময় আমি যদি জওয়ান হতাম। হায় আফসোস! আপনার দেশবাসী যখন আপনাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম"। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "এরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে"? ওয়ারাকা বললেন, "হাঁ, যে জিনিস আপনি এনেছেন, এ জিনিস নিয়ে এমন কোন লোক আসে নি, যার দুশমনী করা হয় নি। যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে সকল শক্তি দিয়ে আমি আপনার সাহায্য করব।"

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফেরেশতা আসার আগে কখনো রাসূল (সা.)-এর খেয়াল হয়নি যে, তিনি রাসূল নিযুক্ত হবেন। হঠাৎ করে ওহী নাযিল হওয়া ও এভাবে ফেরেশতার সাথে দেখা হওয়ার ফলে রাসূল (সা.)-এর যে অবস্থা হলো, তাতে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মাক্কাবাসীরা যতরকম আপত্তিই তুলুক, একথা কেউ বলতে পারে নি যে, "এ লোক যে একটা কিছু দাবী করে বসবে, তা আমরা অনুমান করছিলাম"।

এ ঘটনা থেকে একথাও বুঝা যায় যে, নবুওয়াত লাভ করার আগে রাসূল (সা.)-এর জীবন কত পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র কত উন্নত ছিল। হযরত খাদীজা (রা.) তখন ৫৫ বছরের অভিজ্ঞ মহিলা। এর আগে ১৫ বছর রাসূল (সা.)-এর বিবি হিসাবে তাঁকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দোষই গোপন থাকতে পারে না। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তিনি রাসূল (সা.)-কে এত মহৎ মানুষ হিসাবে পেয়েছেন, যার ফলে হেরা গুহার ঘটনা শুনামাত্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মতো নেক লোকের কাছে আল্লাহর ফেরেশতাই এসে থাকবে।

এমনিভাবে ওয়ারাকার মতো অভিজ্ঞ, ধার্মিক ও বয়স্ক লোক রাসূল (সা.)-কে ছোট সময় থেকেই দেখে আসছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবেও তিনি তাঁকে গভীরভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। হেরা গুহার ঘটনা শুনবার সাথে সাথেই তিনি বিনা দ্বিধায় ঐ মন্তব্য করলেন। রাসূল (সা.)-কে তিনি অতি উন্নত মানের মহাপুরুষ মনে করতেন বলেই তাঁর মনে কোন সন্দেহের উদয় হয় নি।

সূরার দ্বিতীয় অংশ নাযিলের পরিবেশ ঃ তখনও প্রকাশ্যে ইসলামের দিকে জনগণকে দাওয়াত দেয়া শুরু হয় নি। কিন্তু রাসূল (সা.)-কে কাবা শরীফে নামায আদায় করতে দেখে কুরাইশ সরদাররা পয়লা টের পেল যে, তিনি হয়তো নতুন কোন ধর্ম পালন করছেন। অন্য লোকেরা তো নামায দেখে খুবই বিস্মিত হলো। কিন্তু আবূ জাহেলের জাহেলী মন সহ্য করতে পারল না। সে ধমক দিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে বলল যে, হারাম শরীফে এভাবে ইবাদাত করা চলবে না।

আবূ জাহ্ল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করল, "মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনেই মাটিতে মুখ ঠেকাচ্ছে"? সবাই বলল, 'হাঁ, সে তখন বলল, "লাত ও ওযযার কসম, যদি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি, তাহলে তার ঘাড়ের উপর আমি পা তুলে দেব এবং যমীনে তার মুখ ঘষে দেব"।

www.bjilibrary.com

তারপর দেখা গেল যে, সে রাসূল (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল যে, সে পেছনে হটে আসছে এবং হাত দিয়ে এমনভাবে তার মুখ ঢেকে নিচ্ছে যেন কোন কিছু থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হলো"? সে বলল, "আমার ও তার মাঝখানে আগুনের এক গর্ত ও ভয়ানক একটা জিনিস দেখলাম"। পরে রাসূল (সা.) বললেন, "যদি সে আমার কাছে পৌঁছত, তাহলে ফেরেশতারা তাকে টুকরা টুকরা করে উড়িয়ে দিত"।

আলোচনার ধারা ঃ (১) পয়লা আয়াতে প্রথম ওহী হিসাবে এটুকু জানানো হয়েছে যে, ইলম বা জ্ঞানের উৎস হলো আল্লাহ, যিনি সব কিছু পয়দা করেছেন। সৃষ্টিজগতে কার কী দরকার, কোন্‌টা কার জন্য ভাল এবং কিভাবে চললে সবার শান্তি হবে, এসব একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাই তাঁর নাম নিয়েই ইলম হাসিল করতে হবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই সহীহ ইলম পাওয়া সম্ভব। যে বিদ্যা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের সাথে খাপ খায় না, তা আসলেই কুশিক্ষা।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে জানানো হয়েছে যে, মানুষকে কত নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ সুন্দর দেহবিশিষ্ট বানানো হয়েছে। তার মন-মগয তিনিই পয়দা করেছেন। মানুষ যেন ভুলে না যায় যে, বুদ্ধি ও জ্ঞান তিনিই দেন। তাই একটু বুদ্ধি হলেই শয়তান ও নাফসের ধোঁকায় পড়ে সে যেন নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে না করে এবং আল্লাহর দেয়া জ্ঞানকে অবহেলা করে যেন ধ্বংস ডেকে না আনে।

(৩) ৩-৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান দয়াবান মনিব মানুষকে সামান্য রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করে ক্রমে সৃষ্টির সেরা মর্যাদা দিয়েছেন। সে মর্যাদা বহাল রাখতে হলে তাঁরই কাছ থেকে জ্ঞান নিতে হবে। ওহীর মারফতে তিনি যে জ্ঞান দান করেন একমাত্র ঐ জ্ঞানের মারফতেই মানুষ সত্যিকার মর্যাদার অধিকারী হতে পারে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর এটা একটা বিরাট মেহেরবানী যে, কলমের মাধ্যমে লেখার বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মানুষের জ্ঞানকে পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য হিফাযত করার ব্যবস্থা করেছেন। লেখার বিদ্যা না জানলে অতীতের জ্ঞান হারিয়ে যেতো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ মানুষ যে উন্নতি করেছে, তা সম্ভব হতো না। ভবিষ্যতে আরও উন্নতি এ কলমের কারণেই সম্ভব হবে। কলমের চর্চা না থাকলে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানকেও সঠিকভাবে হিফাযত করা সম্ভব হতো না।

৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ওহী দ্বারা আল্লাহ পাক ঐ ইলম দান করেছেন, যা চেষ্টা ও সাধনা করে পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই রাসূল (সা.) যে ইলম পেয়েছেন, তা তাঁর গবেষণার ফল নয়, নিছক আল্লাহর দান। যে বিদ্যা মানুষ সাধনা ও গবেষণা করে পেতে পারে, তার জন্য নবী পাঠাবার দরকার হয় না। নবীর কাছে ঐ জ্ঞানই আসে, যা ওহী ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই।

সূরার শুরুতে 'ইকরা' বা 'পড়ুন' বলা হয়েছে। এতে মনে হয় যে, জিবরাঈল (আ.) লিখিতভাবে একটি আয়াত রাসূল (সা.)-এর সামনে পেশ করেছিলেন। কিন্তু পড়তে না জানার ফলে পরে মুখে শুনিয়ে দিলেন। এরপর ওহী সব সময় তিলাওয়াত করেই রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছান হয়েছে। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে কয়েকজন সাহাবা লেখার কাজ সমাধা করতেন। যখন যতটুকু নাযিল হতো, তখন ততটুকুই লিখে রাখা হতো, যাতে কোন অংশ হারিয়ে না যায়। এ দ্বারাও কলমের গুরুত্ব বুঝা যায়।

www.bjilibrary.com

(৪) ৬-৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় আল্লাহ পাক মানুষকে ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে যেটুকু ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার ফলে মানুষ বেপরওয়া হয়ে চলে। আল্লাহ যে একদিন তাকে পাকড়াও করবেন, সে কথা সে ভুলে যায়। তাই সে বিদ্রোহী হতে সাহস পায়। কিন্তু সে যে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছে, সে কথা সে খেয়াল করে না। আল্লাহ বিদ্রোহীদের কথা এখানে সাধারণভাবে বলার পর পরবর্তী আয়াতে বিশেষ করে আবূ জাহ্‌লের নাম উল্লেখ না করেই তার ধৃষ্টতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(৫) ৯-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আবূ জাহ্‌ল আল্লাহর রাসূলকে নামাযে বাধা দিচ্ছে অথচ রাসূলই ঠিক পথে আছেন এবং মানুষকে তাকওয়ার পথে চলার শিক্ষা দেন। আবূ জাহ্‌ল কি জানে না যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন এবং সময় মতো গ্রেফতার করবেন?

(৬) ১৫-১৮ আয়াতে আল্লাহ পাক আবূ জাহ্‌লকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, যদি সে রাসূল (সা.)-কে নামায আদায়ে বাধা দেয়া থেকে বিরত না হয়, তাহলে তার মাথার চুল ধরে তাকে ফিরাব। তার সমর্থকরা তাকে রক্ষা করতে পারবে না। হলোও তাই। আযাবের ফেরেশতা তার সামনে দোযখের আগুন দেখিয়ে তাকে ঐ ধৃষ্টতা থেকে বিরত করল।

(৭) শেষ আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে অভয় দিয়ে বলেছেন যে, আবূ জাহ্‌লের পরওয়া না করে আপনি যেভাবে নামায আদায় করছিলেন, সেভাবেই করতে থাকুন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করুন। আল্লাহ আপনার সাথেই আছেন।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আলাক	سورة العلق
সূরা ঃ ৯৬ মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ٩٦ مكية
মোট আয়াত ঃ ১৯ মোট রুকু ঃ ১	ركوعها : ١ اياتها : ١٩
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. পড়ুন (হে রাসূল) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি পয়দা করেছেন।	١ - اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ
২. তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড থেকে মানুষ পয়দা করেছেন।	٢ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ
৩. আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু।	٣ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ
৪. যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।	٤ - الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ
৫. মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানতো না।[১]	٥ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ
৬-৭. কক্ষনো নয়। মানুষ বিদ্রোহ করে। কারণ সে দেখে যে, সে অন্যের মুখাপেক্ষী নয়।	٦ - كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۙ ٧ - اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۗ
৮. অথচ আপনার রবের নিকট অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।	٨ - اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۗ
৯-১০. তুমি কি ঐ লোকটাকে দেখেছ, যে এক বান্দাহকে নামায পড়ার সময় নিষেধ করে ?[২]	٩ - اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۙ ١٠ - عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۗ
১১-১২. তুমি কী মনে কর, যদি (ঐ বান্দাহ) ঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার আদেশ দেয় ?	١١ - اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىٓ ۙ ١٢ - اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۗ

১। এ কয়টি আয়াত কুরআন পাকের পয়লা আয়াত, যা রাসূলের উপর হেরা গুহায় নাযিল হয়েছিল।

২। এ আয়াতগুলো তখন নাযিল হয় যখন রাসূল (সা.) নবুওত লাভ করার পর কাবা শরীফে নামায পড়া শুরু করেছিলেন এবং আবূ জাহ্ল তাঁকে নামায পড়ায় বাধা দিতে চেষ্টা করছিল।

www.bjilibrary.com

সূরা ঃ ৯৬ আলাক পারা ঃ ৩০	سورة : ٩٦ العلق الجزء : ٣٠
১৩. তুমি কী মনে কর, যদি (ঐ নিষেধকারী লোকটা সত্যকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ?	١٣- اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ
১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন ?	١٤- اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ
১৫. কক্ষনো নয়। যদি সে বিরত না হয়, তাহলে অবশ্যই আমি তার কপালের উপরের চুল ধরে তাকে টেনে আনবো,	١٥- كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ ۵ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ
১৬. যে কপাল মিথ্যুক ও কঠিন অপরাধী।	١٦- نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ
১৭. সে তার সমর্থকদের ডেকে আনুক।	١٧- فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ
১৮. আমিও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডাকব।	١٨- سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ
১৯. কক্ষনো নয়। (হে রাসূল!) তার কথা মানবেন না। আর সিজদা করুন এবং (আপনার রবের) নৈকট্য লাভ করুন। (এ আয়াত পড়লে সিজদা দিতে হবে)	١٩- كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۚ السجدة

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ক্বাদর

নাম ঃ পয়লা আয়াতের ক্বাদর শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটি মাক্কী যুগের না মাদানী যুগের, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে এর আলোচ্য বিষয় থেকে সূরাটি মাক্কী যুগের বলেই মনে হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ কুরআনের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্বই এ সূরার আলোচ্য। সূরা আলাকের পরপরই এ সূরাটির স্থান নির্দিষ্ট করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সূরা আলাকের পয়লা পাঁচটি আয়াত দিয়ে যে কিতাব নাযিল করা শুরু হয়েছে, সে কিতাবের মর্যাদাই সূরা ক্বাদরে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) পয়লা আয়াতে দুটো কথা বলা হয়েছে। একটা কথা হলো আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচিত নয়। এ কিতাব আমি রচনা করেছি এবং আমিই মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর নাযিল করেছি। আর একটা কথা হলো, এই কিতাবের এতবড় মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে যে, একে বছরের যে কোন একদিন নাযিল করা হয় নি। এর জন্য একটা সময় বাছাই করা হয়েছে, যা বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। সে সময়টি হলো ক্বাদরের রাত।

(২) ২ নম্বর আয়াতে ক্বাদরের রাতের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য বলা হয়েছে যে, হে নবী, ঐ রাতের কথা আপনার কতটুকু জানা আছে ? আসলে এ রাতের মর্যাদা শুধু আমি জানি এবং এ সূরাতে এ বিষয়ে আপনাকে যতটুকু দরকার জানাচ্ছি।

(৩) সূরার বাকী ৩টি আয়াতে ক্বাদরের রাতের মর্যাদা, ফযীলত ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এ রাতটি 'শবে ক্বাদর' নামেই পরিচিত। 'শব' ফারসী ভাষার শব্দ এবং এর অর্থ হলো রাত। শবে ক্বাদর মানে ক্বাদরের রাত। ক্বাদর শব্দের দুটো অর্থ রয়েছে এবং উভয় অর্থেই এখানেই ব্যবহার করা হয়েছে। এক অর্থ হলো তাকদীর, আর এক অর্থ সম্মান, মর্যাদা ও মূল্য। শবে ক্বাদর তাকদীরের রাত, আর এ কারণেই মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান রাত।

তাকদীরের রাত মানে মানব জাতির ভাগ্য রচনার রাত। এ কিতাব নাযিলের মানে শুধু কুরাইশ বংশ বা আরব জাতির কিসমাতের ফায়সালা করাই নয়, গোটা মানব জাতির ভাগ্য এ কিতাবের উপর নির্ভর করে। তাই যে রাতে এ কিতাব নাযিল হয়েছে, সে রাতটি আর সব রাতের মতো সাধারণ কোন রাত নয়। সূরায়ে দুখানের (৪৪নং সূরা) পয়লা কয়টি আয়াতে এ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে, "ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের কসম, নিশ্চয়ই আমি এ কিতাবকে বরকতওয়ালা রাতে নাযিল করেছি। অবশ্যই আমি মানুষকে সাবধান করতে চেয়েছি। ঐ রাতে আমার নির্দেশে সব বিষয়ের সুবিচারমূলক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।"

এতে বুঝা যায় যে, এ রাতটি আল্লাহর বিশাল রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত। এ রাতে প্রতিটি মানুষ এবং প্রত্যেক দেশ বা জাতি এমনকি গোটা মানব জাতির ব্যাপারে

www.bjilibrary.com

পরবর্তী বছরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফায়সালা করা হয়, তা ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। এ ফায়সালা অনুযায়ী ফেরেশতাগণ কাজ করেন। সারা বছর এ ফায়সালাকেই বাস্তবে চালু করা হয়। এ রাতটিকে যারা শবে বরাত মনে করেন, তাদের বক্তব্যের কোন সমর্থন কুরআনে পাওয়া যায় না।

এমনি গুরুত্বপূর্ণ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। কারণ, এ কুরআনের উপরই মানব জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। এ কুরআনের সাথে কোন্ জাতি কী ব্যবহার করে এরই উপর সে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কুরআনকে মানবার দাবীদার হয়ে যারা বাস্তবে একে মেনে চলে না, তারা দুনিয়ায় দুর্ভাগা বলে পরিচিত হতে বাধ্য। আর যারা কুরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ধ্বংসই তাদের ভাগ্য।

এ সূরায় শবে ক্বাদরের তিনটি বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

(ক) এ রাতটি হাজার মাসের চেয়েও বেশী ভাল। এ কথা দ্বারা মাক্কার কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ কিতাবকে নিজেদের জন্য অমঙ্গলজনক মনে করছ। অথচ কিতাবটি যে রাতে নাযিল হয়েছে, তা এত বড় মঙ্গল ও বরকতের রাত ছিল যে, কখনো ইতিহাসের হাজার মাসেও মানব জাতির কল্যাণের জন্য এত বিরাট কাজ হয় নি, যা এক রাতে কুরআন নাযিলের মাধ্যমে করা হয়েছে।

হাজার মাসকে গুণে ৮৩ বছর ৪ মাস মনে করা ঠিক নয়। আরবিতে অনেক বড় সংখ্যা বুঝাবার জন্য হাজার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই এখানে হাজার মানে এক হাজারই নয়। অর্থাৎ এ রাতটির ফযীলত যে কত বেশী, তা হিসাব করতে গেলে হাজার রাতের চেয়েও বেশী হবে।

(খ) এ রাতে জিবরাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতার বিরাট বাহিনী সব জরুরী বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। এ বিষয়ে সূরা দুখানে যা বলা হয়েছে, তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) ঐ রাতটি ফজর পর্যন্ত শান্তিময় থাকে। অর্থাৎ ঐ রাতে কোন ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। আল্লাহর সব সিদ্ধান্তই সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। এমনকি কোন জাতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্তও মানব জাতির আসল কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়।

হাদীসে আছে যে, শবে ক্বাদরে ফেরেশতাগণ দুনিয়ার সব এলাকায় আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল বান্দাদের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন এবং তাদের পক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। এভাবে আল্লাহর বান্দাদের জন্য গোটা রাতটা পরিপূর্ণভাবেই শান্তিময় হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ক্বাদর	سـورة القدر
সূরা ঃ ৯৭ মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ٩٨ مكية
মোট আয়াত ঃ ৫ মোট রুকু ঃ ১	ركوعها : ١ اياتها : ٥
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم

১. আমি এ (কুরআন)-কে ক্বাদরের রাতে নাযিল করেছি।	١ – اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚۖ ۝
২. আর ক্বাদরের রাত সম্বন্ধে তোমার কী জানা আছে?	٢ – وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ؕ
৩. ক্বাদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও ভাল।	٣ – لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ؕ
৪. (সে রাতে) ফেরেশতা ও রূহ, নিজেদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি হুকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে।	٤ – تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ۛۙ
৫. ফজরের উদয় হওয়া পর্যন্ত ঐ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়।	٥ – سَلٰمٌ ۛ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝ع

সূরা আল-বায়্যিনাহ

নাম ঃ পয়লা আয়াতে 'বায়্যিনাহ' শব্দটিই এ সূরার নাম।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটির নাযিলের সময় নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এ সূরা মাক্কী যুগে, আবার কারো মতে মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না যে, এ সূরা কোন যুগের। তবে যাকাতের কথা উল্লেখ থাকায় সূরাটিকে মাদানী মনে করার পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।

আলোচ্য বিষয় ঃ মূল আলোচ্য রিসালাত। আল্লাহর কিতাবকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য রাসূলের প্রয়োজনীয়তা। সূরা আলাক ও সূরা ক্বাদরের পর এ সূরার অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আলাকের মারফতে পয়লা ওহী নাযিল হয়। সূরা ক্বাদরে বলা হয়েছে ওহী কোন্ সময় নাযিল হয়েছে। আর এ সূরাতে বলা হয়েছে ওহী নাযিলের জন্য রাসূল পাঠানো কেন জরুরী।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে রাসূল পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, মানুষ আহলি কিতাব হোক আর মুশরিক হোক, তারা যে কুফরীতে লিপ্ত রয়েছে, তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে হলে তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল পাঠানো দরকার ছিল, যিনি তাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট দলীল হিসাবে প্রমাণিত হতে পারেন। মানুষের সামনে আল্লাহর কিতাবকে এর আসল ও বিশুদ্ধ আকারে পেশ করতে পারেন। এর আগে যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে হক ও সঠিক কথা থাকলেও আহলি কিতাবরা অনেক বাতিল কথা এর মধ্যে শামিল করে আল্লাহর কিতাবের আসল শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। তাই মানুষের হিদায়াতের জন্য আবার নতুন করে মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসূল হিসাবে পাঠানো হলো। এ রাসূলই আল্লাহর আসল কিতাব নতুন করে পেশ করছেন। এ রাসূলের কথা ও কাজই আল্লাহর বিশুদ্ধ কিতাবের বাস্তব প্রমাণ। কুফর ও শিরক থেকে বাঁচতে হলে এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে হলে এ রাসূলের কাছ থেকেই হিদায়াত পেতে হবে।

(২) ৪নং আয়াতে আহলি কিতাবের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এরা আল্লাহর দেয়া সত্য ও সঠিক পথ ছেড়ে নানারকম ভুলপথে চলার জন্য নিজেরাই দায়ী। তাদেরকে সঠিক পথ না দেখাবার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়নি। বরং পূর্বেও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারাও নিজেদের দোষেই হয়েছে। আল্লাহর কাছ থেকে রাসূল ও কিতাব আসার পরও দেখা গেছে যে, একদল লোক আল্লাহর দেখানো পথে চলতে রাযী হয়নি। সুতরাং এখনও রাসূল (সা.)-কে আসল কিতাব দিয়ে পাঠানো সত্ত্বেও আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা হিদায়াত কবুল করে না, তাদের গোমরাহীর জন্য তারাই দায়ী।

(৩) ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে চিরদিনই সঠিক ও মযবুত দ্বীন একই রকম। খালিসভাবে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা হামেশাই আল্লাহর দ্বীনের পরিচয় বহন করে।

www.bjilibrary.com

আজ মুহাম্মদ (সা.) যে এসব শিক্ষা দিচ্ছেন, তা নতুন নয়। ইতঃপূর্বে যাদের কাছেই রাসূল ও কিতাব পাঠানো হয়েছে, তাদেরকেও এ সবের বিপরীত হুকুম দেয়া হয় নি। কিন্তু বর্তমানে আহলি কিতাব হওয়ার দাবীদাররা এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের পথতো ছেড়ে দিয়েছেই, নতুনভাবে রাসূল পাঠিয়ে ঐ সঠিক দ্বীনকে তাদের সামনে পেশ করা সত্ত্বেও তারা হিদায়াত গ্রহণ করছে না।

(৪) ৬-৮ আয়াতে সাফ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা এ রাসূলকে মানতে অস্বীকার করবে, তারা সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। তারা পশুর চেয়েও অধম। রাসূলের প্রতি তাদের ঈমান না আনার কোন যুক্তি নেই। তাই দোযখই তাদের চিরদিনের স্থায়ী ঠিকানা।

আর যারা রাসূলের প্রতি ঈমান এনে নেক আমলের চেষ্টা করবে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তারা চিরদিনই বেহেশতে থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এত বড় পুরস্কার ও সাফল্য তাদের জন্যই, যারা তাদের রবকে ভয় করে চলেছে এবং পদে পদে হিসাব করে চলেছে যে, কোন্ কাজে মনিব সন্তুষ্ট, আর কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট। আল্লাহর সন্তুষ্টি যারা তালাশ করেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং পুরস্কার পেয়ে তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরার ৬ ও ৭ আয়াতে এক মহা সত্য কথা প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষকে এমন সব উপাদান দিয়ে তৈরি করেছেন যে, এর সঠিক সমন্বয় হলে মানুষ সৃষ্টির সেরা মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু যদি সমন্বয়ের অভাব হয়, তাহলে মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হয়।

মানুষ পশুর মতো শুধু দেহসর্বস্ব বস্তুগত জীব নয়। আবার মানুষ ফেরেশতাদের মতো বস্তুহীন সত্তাও নয়। বস্তু ও আত্মার সমন্বয়েই মানুষ। মানবদেহ বস্তুর তৈরী বলে বস্তুজগতের দিকে তার প্রবল আকর্ষণ। কিন্তু তার রূহ তাকে আল্লাহর দিকে টানে। এ রূহেরই পরিচয় পাওয়া যায় বিবেকের দংশনের মাধ্যমে। মন্দকে অপছন্দ করা এবং ভালকে পছন্দ করাই রূহের স্বভাব। কিন্তু এ রূহবিশিষ্ট মানুষ যখন বস্তুসর্বস্ব পশুর মতো শুধু দেহের দাবী ও নাফসের খাহেশ নিয়ে মত্ত থাকে এবং রূহের দাবীকে অগ্রাহ্য করে বিবেকের বিরুদ্ধে চলে, তখন মানুষ পশুর চেয়ে অধম হয়ে পড়ে। বিবেক থাকা সত্ত্বেও সে বিবেকহীন পশুর মতো হওয়ায় তাকে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট বলা ছাড়া উপায় কী?

আবার এ মানুষ যখন রূহের দাবী মেনে চলে, তখন সে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ, ফেরেশতার পাপ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু পাপ করার সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ বিবেকের দাবী মেনে চলে, তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করেও পারা যায় না। যারা ঈমানের পথে চলে, তারা সত্যিই সৃষ্টির সেরা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। আর এ পথ যারা কবুল করে না, তারা অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে বেশী অধম।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-বায়্যিনাহ

سـورة البـينـة

সূরা ঃ ৯৮ | মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৮ | মোট রুকূ ঃ ১

مكية | رقمها : ٩٨

اياتها : ٨ | ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

١ – لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ
حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ

১. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ[১] না আসা পর্যন্ত তারা (কুফরী করা থেকে) বিরত থাকতে তৈরি ছিল না।

٢ – رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ۙ

২. (অর্থাৎ) আল্লাহর কাছ থেকে একজন রাসূল (না আসা পর্যন্ত), যিনি পবিত্র কিতাব পড়ে শুনাবেন।

٣ – فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ

৩. যার মধ্যে সত্য ও সঠিক কথা লিখিত আছে।[২]

٤ – وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنَةُ ؕ

৪. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট (সঠিক পথের) স্পষ্ট বিবরণ[৩] আসার পরেও তারা বিভেদে লিপ্ত হয়েছে।

٥ – وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ۬ حُنَفَآءَ
وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ

৫. তাদেরকে এ ছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয় নি যে, তারা যেন দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। এটাই সঠিক মযবুত দ্বীন।

১। এখানে রাসূল (সা.)-কেই এক স্পষ্ট দলীল বলা হয়েছে। আর আহলি কিতাব মানে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান। আহলি কিতাব শব্দের অর্থ কিতাবধারী, যাদের কাছে আল্লাহর কিতাব আছে বলে তারা দাবী করে।

২। মানে, এমন কিতাব যাতে কোন প্রকার মিথ্যা, পথভ্রষ্টতা, নৈতিক দূষণীয় বিষয় নেই, যেখানে শুধু সত্য ও সঠিক কথাই আছে।

৩। অর্থাৎ এর পূর্বে কিতাবধারীগণ যে বিভিন্ন প্রকার ভ্রষ্টতায় বিভ্রান্ত হয়ে অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

٦ – اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُوْلٰٓئِكَ
هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ۝

৬. আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে,[৪] তারা নিশ্চয়ই দোযখের আগুনে যাবে ও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। এরাই হলো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

٧ – اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ ۙ اُوْلٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ؕ۝

৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ভাল।

٨ – جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ رَضِىَ
اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۝

৮. তাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের নিকট চিরস্থায়ী বেহেশত, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এ সব তারই জন্য, যে তার রবকে ভয় করেছে।

তার কারণ এটা নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন উজ্জ্বল অকাট্য দলীল প্রেরণ করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেছিলেন। বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পথ প্রদর্শন ও হেদায়াত আসার পর তারা এই মতি গতি অবলম্বন করেছিল। সুতরাং তারা নিজেরাই তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী।

৪। এখানে কুফর মানে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানতে অস্বীকার করা।

সূরা আয-যিলযাল

নাম ঃ পয়লা আয়াতের 'যিলযাল' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটির মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এর আলোচ্য বিষয় ও বাচনভঙ্গী মাক্কী যুগের ও প্রথম দিকের সূরাগুলোর সাথে বেশী মিল খায়।

আলোচনার বিষয় ঃ মূল আলোচ্য আখিরাত। মওতের পর আবার জীবিত হওয়া এবং ভাল মন্দ ছোট ছোট সব আমালও মানুষের সামনে হাযির হওয়া।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে মওতের পর আবার মানুষকে কিভাবে যিন্দা করা হবে। গোটা পৃথিবীকে ঝাঁকুনির পর ঝাঁকুনি দিয়ে উলট-পালট করা হবে এবং যমীনে লুকিয়ে থাকা সব মানুষকে যখন বের করা হবে, তখন হয়রান হয়ে সবাই বলে উঠবে, যমীনের কী হয়েছে যে, এভাবে হঠাৎ করে উলট-পালট হয়ে গেল?

(২) ৪ ও ৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যমীনের উপর চলাফেরা করার সময় মানুষ নিশ্চিন্তে যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়িয়েছে এবং কল্পনাও করে নি যে, একদিন এ বোবা পৃথিবীও মুখ খুলবে এবং যমীন কিয়ামাতের দিন আল্লাহর হুকুমে কথা বলতে থাকবে, কোন্ মানুষ কখন কোথায় কী কাজ করেছে যমীন নিজেই মনিবের আদালতে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। যদিও আল্লাহ সবার সব আমলের খবরই রাখেন, তবু ইনসাফের দাবী অনুযায়ী সাক্ষী-প্রমাণ না নিয়ে তিনি বিচার করবেন না।

(৩) ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন মানুষ আল্লাহর আদালতে ব্যক্তিগতভাবেই হাযির হবে। বংশ, দল, জাতি বা দেশ হিসাবে একজোট অবস্থায় সেখানে বিচার হবে না। আল্লাহর দরবারে হাযির করে তাদের সবাইকে নিজ নিজ আমলনামা দেখানো হবে। কে কী করেছে, তা তাদেরকে না দেখিয়ে বিচার করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকাজ এমনভাবে দেখানো হবে, যাতে কেউ তার প্রতি অবিচার হয়েছে বলে মনে করতে না পারে।

(৪) শেষ দু'আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের আমল যখন তার সামনে পেশ করা হবে, তখন তা এমন বিস্তারিত ও পরিপূর্ণরূপে দেখানো হবে যে, বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ বা মন্দ কাজও বাদ যাবে না।

অবশ্য সূরা আল 'ক্বারিয়া'তে আল্লাহপাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ভাল কাজের পুরস্কার ও প্রত্যেক মন্দ কাজের শাস্তি দেবার রীতি তিনি গ্রহণ করেন নি। যাদের বদ আমলের চেয়ে নেক আমল বেশী তাদের বদ আমলের জন্য তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন না। এটা মানুষের প্রতি মেহেরবান আল্লাহর অসীম দয়ার প্রমাণ।

সূরা আয-যিলযাল	سورة الزلزال
সূরা ঃ ৯৯ — মাক্কী যুগে নাযিল	مكية — رقمها : ٩٩
মোট আয়াত ঃ ৮ — মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٨ — ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. যখন জমিনকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে।	١ – اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝
২. এবং জমিন নিজের (ভেতরের সব) বোঝা বাইরে ফেলে দেবে।	٢ – وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝
৩. তখন মানুষ বলে উঠবে, এর কী হলো ?	٣ – وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۝
৪. সেদিন (জমিন) নিজের সব খবর বলে দেবে (যা তার উপর ঘটেছে)।	٤ – يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝
৫. কারণ, (হে রাসূল) আপনার রবই তাকে (এরূপ করার) হুকুম দিয়ে থাকবেন।	٥ – بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝
৬. সেদিন মানুষ আলাদা আলাদা (অবস্থায়) ফিরে আসবে, যাতে তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়।	٦ – يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝
৭. অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।	٧ – فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝
৮. আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা-ও দেখতে পাবে।	٨ – وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

সূরা আল-আদিয়াত

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটিই এর নাম।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটির নাযিল হবার সময় নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয় ও বাচনভঙ্গি থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে, মাক্কী যুগের প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ আখিরাত। আখিরাতকে বিশ্বাস না করলে কিরূপ নৈতিক অধঃপতন হয়, তা বুঝানো এবং এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, আখিরাতে মনের গোপন কথারও হিসাব নেয়া হবে।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৫ আয়াতে সেকালের আরবে লুটতরাজ, মারামারি ও চরম অশান্তির একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ পাক মানুষের খিদমাতের জন্য যে ঘোড়া দিয়েছেন, সে ঘোড়াকে তারা ব্যবহার করতো একে অপরের উপর আক্রমণ ও যুলুম করার জন্য। এ অবস্থার দরুন কেউ নিরাপদে ও শান্তিতে ঘুমাতে পারতো না। তাদের এই নৈতিক অধঃপতনের আসল কারণ পরবর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) ৬-৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যত রকম উপায়-উপকরণ ও শক্তি দান করেছেন, তা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করে তারা ধন-দৌলতের লোভে ঐ সবকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। এরই ফলে তারা অশান্তি ভোগ করে। এরূপ আচরণ আসলে আল্লাহর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। তারা যদি আল্লাহর দেয়া নিয়ামাতকে আল্লাহর পছন্দ মত ব্যবহার করতো, তাহলেই এসব নিয়ামাতের প্রকৃত শুকরিয়া আদায় হতো। কিন্তু এরা দুনিয়ার লোভে মত্ত হওয়ায় এরূপ অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছে। এদের বিবেক অবশ্যই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এরা অকৃতজ্ঞ।

(৩) ৯-১১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করে মানুষ যে অশান্তি ভোগ করে এর আসল কারণ হলো আখিরাতের প্রতি অবহেলা। যদি মানুষ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো যে, একদিন কবর থেকে আবার যিন্দা হয়ে উঠতে হবে এবং তাদের সব রকম আমলের হিসাব দিতে হবে, এমনকি তাদের মনে গোপনভাবে যেসব কুভাব পোষণ করতো, তাও তখন প্রকাশ করা হবে, তাহলে তারা এমন অকৃতজ্ঞ হতো না।

সেদিন তাদের মনিবের কাছে তাদের কোন গোপন অবস্থাই গোপন থাকবে না। দুনিয়ায় তারা কে কি কুকাজ করে গেছে এবং কাকে কোন ধরনের শাস্তি দিতে হবে, তা আল্লাহর ভালভাবেই জানা আছে। সেদিন তিনি এসব বিষয় ভালভাবে জেনে-শুনেই তাদের বিচার করবেন। তিনি কারো উপরই অবিচার করবেন না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আদিয়াত

سورة العديت

সূরা ঃ ১০০ — মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ১১ — মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

مكية — رقمها : ١٠٠

اياتها : ١١ — ركوعها : ١

بسم الله الرحمن الرحيم

১. কসম ঐ (ঘোড়া) গুলোর, যারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায়।

২. তারপর (খুর দিয়ে) আগুনের ফুলকি ঝাড়ে।

৩. আর খুব সকালে হামলা করে।

৪-৫. তারপর এ সময় ধূলি উড়ায়, আর এ অবস্থায়ই কোন জন সমাবেশে ঢুকে পড়ে।

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১]

৭. আর নিশ্চয়ই সে নিজে এর সাক্ষী।[২]

৮. নিশ্চয়ই সে ধন-দওলতের মহব্বতে খুব বেশি (মগ্ন)।

৯-১০. সে কি ঐ সময়টা জানে না, যখন কবরে যা-কিছু আছে, তা বের করা হবে? আর (মানুষের) বুকে যা কিছু (লুকিয়ে) আছে, তা বের করে যাচাই করা হবে?[৩]

১১. নিশ্চয়ই সেদিন তাদের রব তাদের সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত থাকবেন।[৪]

١ – وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ

٢ – فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ

٣ – فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ

٤ – فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ

٥ – فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ

٦ – اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ

٧ – وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ

٨ – وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۗ

٩ – اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۙ

١٠ – وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ

١١ – اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۧ

১। মানে, আল্লাহ মানুষকে যেটুকু শক্তি দিয়েছেন, তা আল্লাহর মরযী মতো ব্যবহার করা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে শক্তি যুলুম ও অন্যায় পথে ব্যবহার করে অকৃতজ্ঞ হয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর দেয়া নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করে না।

২। অর্থাৎ তার বিবেক এর সাক্ষী, তার আমলও এর সাক্ষী। এমন কি অনেক কাফিরের মুখের কথাও অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয়।

৩। মানে, মনের মধ্যে যে ইচ্ছা, নিয়ত ও উদ্দেশ্য গোপন আছে, তাও প্রকাশ করে দেয়া হবে এবং আলাদা আলাদা করে দেখান হবে।

৪। অর্থাৎ আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন যে, কে কেমন এবং কোন ধরনের শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ক্বারিআ

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটি দিয়েই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটি যে মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। সূরাটির বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে, এটা মাক্কী যুগের প্রথম দিকেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ কিয়ামাত ও আখিরাত।

আলোচনার ধারা ঃ (১) ১-৩ আয়াতে মানুষকে চমকিয়ে দেবার মতো কয়েকটি কথা এমনভাবে বলা হয়েছে যাতে সবাই সেদিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। কথা কয়টি বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয় যেন কিয়ামাতের মহাবিপদ ও দুর্ঘটনা এখনই হাযির হয়ে গেছে। বলা হয়েছে যে, ঐ বিরাট দুর্ঘটনা যে কী ভয়ানক, তা আমিই জানি। তোমরা সে বিষয়ে কী জান ? তোমরা জান না বলেই তাকে অবহেলা করে চলেছে।

(২) ৪ ও ৫ নং আয়াতে মাত্র দুটো কথায় কিয়ামাতের ভয়াবহ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সেদিন মানুষ পেরেশান হয়ে এমনভাবে সবদিকে ছুটাছুটি করবে যেমন কীট-পতঙ্গ আগুনের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। আর পাহাড়-পর্বতগুলোর অবস্থা এমন হবে যে, ধুনা পশমী তুলার মতো মনে হবে। এমন মযবুত ও ভারী পাহাড়গুলোর দশাই যদি এরূপ হয়, তাহলে সেদিন মানুষের যে কি দুর্দশা হবে, তা কল্পনাও করা যায় না।

(৩) ৬-১১ আয়াতে জানানো হয়েছে যে, আখিরাতে যখন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে, তখন মানুষের বিচার সেখানে কোন্ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হবে। যদি প্রত্যেকের ভাল ও মন্দ সব কাজের ভিত্তিতে বিচার করা হয়, তাহলে কেউ শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ এমন কোন মানুষ নেই, যার কোন দোষ বা ভুল হয় না। তাই মেহেরবান আল্লাহ এমন নীতিতে বিচার করবেন, যার ফলে একমাত্র ঐসব লোকই শাস্তি পাবে, যাদের নেক আমলের চেয়ে বদ আমল বেশী। আর যাদের নেক আমল বদ আমলের চেয়ে বেশী, তাদের বদ আমলের শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে বেহেশতে আরামে থাকতে দেয়া হবে।

আখিরাতে একমাত্র নেকীরই ওজন হবে। তাই পাল্লা ভারী হবার মানে হলো নেকী বেশী হওয়া। আর নেকী কম থাকলে পাল্লা হালকাই হবে। সূরা আ'রাফের ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছে, "ঐ দিন শুধু হকেরই ওজন হবে। যার পাল্লা ভারী হবে, সেই সফল হবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, সেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

বদ আমল বেশী হবার দরুন যারা দোযখে যাবে, তাদের নেক আমল কম হলেও এর কোন পুরস্কার পাওয়ারই কি তাদের হক নেই ? তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, তারা দোযখে শাস্তি ভোগ করার পর এক সময় বেহেশতে যাবে। আর যাদের ঈমান নেই, তাদের কোন নেক আমল আল্লাহ কবুল করেন না। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যত ছাড়া অন্য কোন আমলই পুরস্কারের যোগ্য নয়। তাই বেঈমানের ভাল কাজের কোন পুরস্কার দেয়া হবে না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ক্বারিআ

سورة القارعة

সূরা ঃ ১০১	মাক্কী যুগে নাযিল
মোট আয়াত ঃ ১১	মোট রুকু ঃ ১

مكية	رقمها : ١٠١
اياتها : ١١	ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাংলা	العربية
১। বিরাট দুর্ঘটনাটা (বিপজ্জনক ঘটনা)।	١- اَلْقَارِعَةُ ۙ
২। সে বিরাট দুর্ঘটনাটা কী ?	٢- مَا الْقَارِعَةُ ۚ
৩। আর তুমি ঐ দুর্ঘটনাটা সম্বন্ধে কী জান ?	٣- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ
৪-৫। যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত (ছড়ানো) পোকার মতো হয়ে যাবে। আর পাহাড়গুলো ধোনা রঙিন পশমের মতো হয়ে যাবে।	٤- يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ ٥- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ
৬-৭। তারপর যার পাল্লা ভারী হবে[১], সে মনের মতো আরামে থাকবে।	٦- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ ٧- فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ
৮-৯। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা❖ হবে 'হাবিয়া'* (দোযখ)।	٨- وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ ٩- فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ
১০। হাবিয়া কী, সে বিষয়ে তুমি কী জান ?	١٠- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ؕ
১১। এটা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন।	١١- نَارٌ حَامِيَةٌ ۚ

১। মানে, নেকীর পাল্লা ভারী হবে।

❖ 'উম্মুন' মানে মা। তার মা হাবিয়া হবে মানে, মা যেমনি শিশুর আশ্রয় বা ঠিকানা, তেমনি হাবিয়া দোযখ তার ঠিকানা হবে।

* 'হাবিয়া' মানে গভীর গর্ত। দোযখকে এজন্য 'হাবিয়া' বলা হয়েছে যে, তা খুব গভীর এবং তাতে উপর থেকে দোযখীদেরকে ফেলা হবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তাকাসুর

নাম ঃ পয়লা আয়াতের তাকাসুর শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিপুলসংখ্যক মুফাসসির সূরাটিকে মাক্কী যুগের বলেই মত প্রকাশ করেছেন। এর বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গি থেকে সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম দিকের বলেই মনে হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ দুনিয়া পাওয়ার ধান্দার পরিণাম।

আলোচনার ধারা ঃ (১) পয়লা দু'আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে দুনিয়ার লোভে এমনভাবে মত্ত থাকে যে, সারাটা জীবন দুনিয়ার ধান্দায়ই কেটে যায়। কিভাবে একে অপরকে ঠকিয়ে বা জোর-যুলুম করে পয়সাওয়ালা হওয়া যায় এরই প্রতিযোগিতায় মানুষ পাগল হয়ে খাটতে থাকে। দুনিয়ার মজা, বস্তুগত লাভ ও ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে মানুষ একে অপর থেকে বেশী এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে এতটা মশগুল হয়ে থাকে যে, তারা একথা ভুলেই যায় যে, একদিন তাদেরকে মরতে হবে। এ ধান্দায় থাকা অবস্থায়ই হঠাৎ একদিন মওত এসে তাদেরকে কবরে পৌঁছিয়ে দেয়।

(২) ৩-৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জগত ও জীবন সম্পর্কে একেবারেই ভুল ধারণায় পড়ে থাকার ফলে তোমাদের এ দশা হয়েছে। তোমাদের এ ধারণা কোন সঠিক ইলমের ভিত্তিতে রচিত নয় এবং তোমরা যে পথে চলছ, তা মোটেই ঠিক নয়। যদি তোমরা জানতে যে, মরণের পর এর কুফল কী হবে, তাহলে কখনো এভাবে চলতে পারতে না। রাসূল (সা.) তোমাদেরকে এ বিষয়ে যে জ্ঞান দান করেছেন, যদি তা তোমরা কবুল না কর, তাহলে মওতের পর শিগগিরই তা জানতে পারবে। কিন্তু তখন জেনে কী লাভ হবে? মওতের আগেই সে কথা কবুল করে নাও, যদি আখিরাতে বাঁচতে চাও।

(৩) ৬ ও ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আজ তোমরা যে দোযখের কথা মোটেই বিশ্বাস করতে চাচ্ছ না, মওতের পর সে দোযখকে নিজের চোখে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না।

(৪) শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার যে সব নিয়ামাতে মজে থাকার ফলে আখিরাতকে এভাবে তোমরা ভুলে আছ, সে সব নিয়ামাত তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই দেয়া হয়েছিল। তাই এ সবকে শুধু নিয়ামাত মনে করে আজ যে বিরাট ভুল করছ, তা মওতের পর টের পাবে। আখিরাতে যখন এসব নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, কিভাবে এসব হাসিল করেছিলে এবং কিভাবে তা ব্যবহার করেছিলে, তখন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়ার জীবনে কত বড় ভুল করে গিয়েছ।

www.bjilibrary.com

সূরা আত-তাকাসুর	سورة التكاثر
সূরা ঃ ১০২ — মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ١٠٢ — مكية
মোট আয়াত ঃ ৮ — মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٨ — ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১। একে অপর থেকে বেশি (পাওয়ার ধান্দা) তোমাদেরকে ভুলের মধ্যে ফেলে রেখেছে।	١- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ
২। এমন কি (দুনিয়া পাওয়ার এ চিন্তা-ধান্দা নিয়েই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।	٢- حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ
৩। কক্ষনো নয়। শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে।[১]	٣- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
৪। আবার (শোন), কক্ষনো নয়। শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে।	٤- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ
৫। কক্ষনো নয়। যদি তোমরা বিশ্বাসযোগ্য ইলমের ভিত্তিতে (তোমাদের এ চালচলনের কুফল) জানতে পারতে, (তাহলে এভাবে চলতে পারতে না)।	٥- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۗ
৬। অবশ্যই তোমরা দোযখ দেখতে পাবে।	٦- لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ
৭। আবার (শোন), তোমরা তা এমনভাবে দেখবে, যা একীনে পরিণত হয়।	٧- ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ
৮। তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামাত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।	٨- ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۚ

১। শিগগির অর্থ আখিরাতও হতে পারে, মৃত্যুও হতে পারে। কেননা, মরার পরই মানুষ বুঝতে পারবে যে, সারা জীবন যে সব কাজকর্মে সে মজে ছিল, তা তাঁর জন্য কতটুকু সৌভাগ্য আর কতটুকু দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আসর

নাম ঃ সূরার পয়লা শব্দটিকেই এর নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরার নাযিলের সময় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে সূরাটি মাক্কী যুগে অবতীর্ণ। মাক্কী যুগের প্রথম দিকে সূরার যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা এ সূরায় স্পষ্ট। ছোট ছোট আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাকে এমন আকর্ষণীয় ভাষায় মাক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরায় পেশ করা হয়েছে যে, একবার শুনলে আর ভুলবার উপায় নেই। সূরা আসর ঐ জাতীয় সূরার একটি।

আলোচ্য বিষয় ঃ এ সূরাটি অতি সংক্ষেপে বিরাট বিষয় পেশ করার অতুলনীয় নমুনা। বাছাই করা কয়েকটি মাত্র শব্দে এক দুনিয়ার অর্থ ভরে দেয়া হয়েছে, যা বর্ণনা করতে হলে বিরাট বইও যথেষ্ট নয়। এতে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে মানুষের সফলতার পথ কোন্‌টি এবং বিফলতা ও ধ্বংসের পথই বা কোন্‌টি।

আলোচনার ধারা ঃ (১) 'আসর' শব্দটির অর্থ হলো সময়। সময়ের কসম করে এমন একটা মহা মূল্যবান কথা অতি অল্প কথায় বলা হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। মানব জাতির অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা এ কথার উজ্জ্বল সাক্ষী যে, মানুষ হিসাবে তাদের জীবন সাধারণভাবে ব্যর্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত। দীর্ঘ অতীতকাল এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যে সব বিষয়কে সঠিক বলে অকপটে স্বীকার করে এসেছে বাস্তব জীবনে মানুষ ঐসব কথাকে পালন করে নি। যে সব মূল্যবান ও মূল্যবোধকে মানুষ হিসাবে সবাই সত্য ও পালনযোগ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য, সে সবকেই তারা নানা কারণে অমান্য করে চলে। ভাল ও মন্দ, ঠিক ও বেঠিক, সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে চিরকাল মানুষ যে সব ধারণা পোষণ করে এসেছে, এর কতটুকু মানুষ সত্যিকারভাবে তাদের জীবনে মেনে চলে ?

জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের নিকট মানুষের এই পরাজয় কি মানুষ হিসাবে তাদের ব্যর্থতা নয়? যেসব কথাকে তারা কল্যাণকর বলে স্বীকার করেও তা পালন করতে ব্যর্থ হয়, তারা কি সত্যিকারভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি ?

ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে মানুষের এ জাতীয় ব্যর্থতার ফলে কিভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কত জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে মহাকালই এর সাক্ষী। এ সূরার পয়লা দুটো আয়াত এ কথাই ঘোষণা করেছে।

(২) পরের আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে মানুষের ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে একমাত্র ঐসব লোকই রক্ষা পেয়েছে, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাবেশ হয়েছে। তাদের সংখ্যা যুগে যুগে ও দেশে দেশে কম হতে পারে, কিন্তু তাদের সাফল্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ চারটি গুণের যে কোন একটির অভাব হলে মানব জীবনে প্রকৃত সফলতা সম্ভব নয়।

(ক) পয়লা গুণ হলো ঈমান। এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। শুধু মুখে স্বীকার করলেই ঈমান পয়দা হয় না। মনে-প্রাণে স্বীকার করাকেই ঈমান বলে। আল্লাহ মনের খবর জানেন, তাই "তাসদীক বিল জিনান" বা দিল দিয়ে মেনে নেয়াই হলো আল্লাহর নিকট ঈমানের সঠিক পরিচয়। "নিশ্চয়ই একমাত্র তারাই ঈমানদার, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং এরপর কোনরকম সন্দেহে পড়েনি।" (সূরা হুজুরাত-১৫)

www.bjilibrary.com

"তারাই প্রকৃত মুমিন নিশ্চয়ই যারা বলেছে যে, আল্লাহই আমাদের রব এবং এরপর এ কথার উপর মযবুত হয়ে টিকে রয়েছে।" (সূরা হা-মীম সাজদা-৩০)

কুরআন পাকে যত কথা বলা হয়েছে, এ সবের প্রতি বিশ্বাস করাই ঈমানের দাবী। তবে প্রধানত তিনটি বিষয় বিশ্বাস করাই হলো ঈমানের মূলকথা। আর বাকী সবই এ তিনটিরই শাখা-প্রশাখা। এ তিনটি বিষয়, "তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত" নামে পরিচিত।

(খ) দ্বিতীয় গুণ হলো 'আমলে সালিহ' বা নেক আমল। কুরআনে যেখানেই নেক আমলের কথা আছে, সেখানেই পয়লা ঈমানের উল্লেখ রয়েছে। তাই আমলে সালিহ মানে হলো "ঈমানের তাকিদে আল্লাহ ও রাসূলের হিদায়াত অনুযায়ী কাজ করা।" যে কাজের সাথে ঈমানের কোন সম্পর্ক নেই, যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না এবং যে কাজ রাসূল (সা.)-এর হিদায়াত ও তরীকা অনুযায়ী করা হয় না, তা ভাল কাজ মনে হলেও আমলে সালিহ বলে গণ্য হবে না। বীজ ও গাছের যে সম্পর্ক ঈমানের সাথে আমলে সালিহের সেই সম্পর্ক।

উপরের দুটো গুণ ব্যক্তিগতভাবে যাদের মধ্যে আছে, তাদের মধ্যে সংগঠনগতভাবে আরও দুটো গুণ থাকতে হবে- যদি তারা ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে চায়। এ দুটো গুণের পয়লাটি হলো, একে অপরকে হকের দিকে ডাকতে থাকা। আর দ্বিতীয়টি হলো, একে অপরকে সবরের তাকিদ দেয়া। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এ দুটো কাজ ঈমানদারদের পক্ষে আলাদা আলাদাভাবে করা সম্ভব নয়। এর জন্য তাদেরকে জামায়াতবদ্ধ হতে হবে এবং সংঘবদ্ধভাবেই দুটো কাজ করতে হবে।

(গ) চারটি গুণের তৃতীয় গুণটি হলো, একে অপরকে হকের উপদেশ দেয়া। হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত অর্থবোধক। হকের এক অর্থ হলো, সত্য ও ন্যায়। আর এক অর্থ হলো, অধিকার। প্রথম অর্থ- আকিদা, বিশ্বাস ও দুনিয়ার কাজ-কর্মে যা সত্য, সঠিক, ইনসাফপূর্ণ, তাই হক। আর দ্বিতীয় অর্থ- আল্লাহ ও বান্দার যা প্রাপ্য ও অধিকার তাও হক। "তাওয়াসী বিল হক"-এর দাবী হলো, ঈমানদারদের এমন সজাগ থাকতে হবে যাতে সমাজে যখনই কোথাও হকের বিপরীত কিছু দেখা যাবে, তখনই নিজে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং একে অপরকে এর জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

(ঘ) চতুর্থ গুণটি হলো, "তাওয়াসী বিস সাবর" বা একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ ও তাকিদ দেয়া। অর্থাৎ হককে সমাজে চালু রাখতে হলে বাতিলের সাথে বিরোধ ও সংঘর্ষ হবেই। তাই হকের উপর কায়েম থাকতে হলে এবং হকের পক্ষে সমর্থন দিতে গেলে বহু বাধা আসবে। অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং নানারকম ক্ষতির কারণ ঘটবে। এ অবস্থায়ও যাতে ঈমানদাররা তাদের কর্তব্যে অবহেলা না করে এবং বাধা-বিপত্তি দেখে পিছিয়ে না যায়, সেজন্য ধৈর্য্য তো ধারণ করবেই, একে অপরকে মযবুত থাকার জন্য আহ্বানও জানাবে। একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং সবাইকে সাহস যোগাবে।

বিপদ-আপদ ও বাধা-বিপত্তি দেখে বিরক্ত হয়ে ঘরে বসে থাকার নাম সবর নয়। মানুষ হক কথা শুনতে চায় না বলে এবং হকের পক্ষে কাজ করতে গেলে বাতিলপন্থীদের নিকট অপমানিত হতে হয় বলে 'সবর ইখতিয়ার' করে চুপ করে থাকা সবরের সম্পূর্ণ বিপরীত। সবর মানে অধ্যবসায়। যত বাধাই আসুক, তার পরওয়া না করে হকের পক্ষে সব অবস্থায় কাজ করতে থাকাই হলো প্রকৃত সবর। ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে হলে ঈমান, আমলে সালিহ, তাওয়াসী বিল হক ও তাওয়াসী বিস সাবর-এ চারটি গুণ একসাথে থাকতে হবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-আসর	سورة العصر
সূরা ঃ ১০৩ — মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ١٠٣ — مكية
মোট আয়াত ঃ ৩ — মোট রুকু ঃ ১	ركوعها : ١ — اياتها : ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- وَالْعَصْرِ ۙ

১। সময়ের কসম।[১]

٢- اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ

২। নিশ্চয়ই মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

٣- اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ

৩। ঐ সব লোক ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, একে অপরকে হক কথার উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে সবর করার উপদেশ দিয়েছে।

সময় মানে গত সময় এবং চলিত সময়ও। সময়ের কসম অর্থ, ইতিহাস সাক্ষী এবং যে সময় এখন যাচ্ছে, তাও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পরের আয়াতে যে কথা বলা হচ্ছে, তা এমন সত্য ও খাঁটি কথা, যা সময়ের কসম দিয়ে বলা যায়।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-হুমাযাহ্

নাম ঃ পয়লা আয়াতের হুমাযাহ শব্দ দিয়ে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ সকল মুফাসসিরই একমত যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে। ভাব ও ভাষা থেকে একথা স্পষ্ট যে, সূরাটি মাক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরা।

আলোচ্য বিষয় ঃ মূল আলোচ্য আখিরাত। সে সময়কার আরব সমাজের ধনী লোকদের বড় বড় কতক চারিত্রিক দোষ এবং আখিরাতে এর ভয়ানক পরিণাম।

সূরা যিলযাল থেকে হুমাযাহ্ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় ঃ যিলযাল, আদিয়াত, ক্বারিআ, তাকাসুর, আসর ও হুমাযাহ্- এ ছয়টি সূরা পরপর এমনভাবে সাজানো আছে যে, এদের একটির আলোচ্য বিষয়ের সাথে পরবর্তী সূরার আলোচ্য বিষয় মিলে একই মূল বক্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে হয়। আল্লাহ পাক এ কয়টি সূরায় দুনিয়ার জীবনের সাথে আখিরাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টিকে ৬টি কিস্তিতে ধাপে ধাপে এমন সুন্দর করে বুঝিয়েছেন যে, সবটুকু মিলে একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় পরিণত হয়েছে। একই সূরায় এ সবটুকু কথা বুঝালে মন-মগযে এত ভালভাবে কথাগুলো বসে যেতে পারতো না।

সূরা যিলযালে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে প্রত্যেক মানুষের গোটা আমলনামা তার সামনে রেখে দেয়া হবে। অণু পরিমাণ আমলও বাদ দেয়া হবে না। ভাল হোক আর মন্দ হোক তার সকল আমলই সেখানে হাযির করা হবে।

সূরা আদিয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে যত কিছু নিয়ামাত ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে, সে সবের হিসাব আখিরাতে নেয়া হবে এবং সেখানে শুধু আমলের হিসাবই নয়, কোন্ আমল কী নিয়তে করা হয়েছে, তাও সেখানে প্রকাশ করা হবে।

সূরা ক্বারিআতে কিয়ামাতের চিত্র তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আদালতে আখিরাতে মানুষের কিসমাতের ফায়সালা এর উপর নির্ভর করবে যে, কার আমলের পাল্লা ভারী আর কার পাল্লা হালকা। নেকী ও বদী ওজন করে পুরস্কার ও শাস্তির ফায়সালা দেয়া হবে।

সূরা তাকাসুরে বলা হয়েছে যে, মানুষ এ বস্তুগত জগতের আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে দোযখকে যতই ভুলে থাকুক, মওতের পর সে নিজের চোখে তার শাস্তির আয়োজন দেখতে পাবে। তখন দুনিয়ার প্রতিটি নিয়ামাত সে কিভাবে হাসিল করেছে আর কিভাবে তা ব্যবহার করেছে সবই তাকে তন্নতন্ন করে জিজ্ঞেস করা হবে।

সূরা আসরে একেবারে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানব জাতির ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, ঈমান ও নেক আমল এবং এর ভিত্তিতে সমাজকে গঠন করার চেষ্টা ছাড়া মানব জীবন একেবারেই ব্যর্থ ও বিফল। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভিত্তি ছাড়া যারা জীবনে সফলতা চায়, তারা শেষ পর্যন্ত দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। আর মানব জীবন যেহেতু দুনিয়ায়ই সীমাবদ্ধ নয়, সেহেতু তাদের ব্যর্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা আখিরাতে আরও ভয়ানক হবে।

www.bjilibrary.com

এর পরই সূরা হুমাযাহ্‌তে সমাজের নেতা ও ধনী লোকদের স্বার্থপরতা ও পরনিন্দা মাল-দৌলতের লোভ এবং ধন-সম্পদকে সফলতার মাপকাঠি মনে করাকে তাদের ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনটাকেই যারা সবকিছু মনে করে, তাদের চরিত্র এমন হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এর পরিণাম যে কত মর্মান্তিক, তার করুণ চিত্র সূরার শেষাংশে তুলে ধরা হয়েছে। সূরা ক্বারিআতে শুধু জ্বলন্ত আগুনের উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরায় বলা হয়েছে যে, সে আগুনের এমন ক্ষমতা যে, মানুষকে টুকরা টুকরা করে দিতে পারে। সে আগুন শুধু শরীরকে পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয় না, দিলকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাড়ে। এ আগুন থেকে বের হবার কোন উপায় থাকবে না। ঢাকনা দিয়ে আটক রাখা অবস্থায় আগুনের মধ্যেই ঘেরাও হয়ে থাকতে হবে। সূরা আ'লাতে বলা হয়েছে যে, দোযখের এত কঠিন শাস্তি সত্ত্বেও তারা মরবে না। মরলে তো আযাব থেকে বেঁচে যেতো। কিন্তু এ অবস্থায় বেঁচে থাকাটাকে বাঁচাও বলা যায় না। তাই বলা হয়েছে যে, তারা মরবেও না, বাঁচবেও না।

বিশেষ শিক্ষা

এ সূরার পয়লা তিনটি আয়াতে মানুষের এমন কয়েকটা দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে, যা প্রায় সব লোকের মধ্যেই দেখা যায়।

(১) মানুষ নিজের দোষ খুব কমই দেখতে চায়। নিজের বড় বড় দোষকেও ঢেকে রাখতে সবাই ব্যস্ত। এমনকি নিজের বিবেককে শান্ত করার জন্য দোষগুলোর পক্ষেও যুক্তি দেখায়। কিন্তু মানুষ অন্যের সামান্য দোষ দেখলেও তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে খুব মজা পায়। এটাকেই গীবত বলে। বেশী বেশী গীবত করাকেই 'হুমাযাহ্‌' বলা হয়।

(২) অপরের দোষ চর্চা করতে গিয়ে মানুষ শুধু নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয় না। গীবতের এক পর্যায়ে গিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও ধিক্কার দিয়ে অন্যকে হেয় করে সে তৃপ্তি বোধ করে। এটাকেই 'লুমাযাহ্‌' বলা হয়।

(৩) টাকা-পয়সা কামাই করা অবশ্যই মানুষের দরকার। জীবন কাটাবার জন্য ধন-দৌলত নিশ্চয়ই দরকারী জিনিস। কিন্তু টাকা-পয়সার সাথে মানুষ সাধারণত যে মহব্বত প্রকাশ করে, তা অর্থহীন। সে টাকা-পয়সা গুনে গুনেই যেন মজা পায়। অনেক সময় নিজের জরুরী কাজেও পয়সা খরচ করে না। টাকার অংক বড় করে জমিয়ে রাখার মধ্যেই সে আরাম বোধ করে। মনে হয় যেন টাকা-পয়সা জমা করাটাই তার জীবনের বড় উদ্দেশ্য।

(৪) মানুষ ভুলে যায় যে, একদিন এ সব মাল ছেড়ে খালি হাতে চলে যেতে হবে। এ মাল যে স্থায়ী নয় এবং চিরদিন এ মাল যে তার সাথে থাকবে না, সে সহজ হিসাবটাও সে ভুলে যায়। মালের মহব্বত তাকে এমন পাগল ও অবুঝ বানিয়ে ছাড়ে যে, সে দুনিয়াতে তো মাল ভোগ না করে জমা করেই রাখে, আখিরাতেও এ মালের কারণেই তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।

মানুষের এসব দোষ দূর করার একমাত্র উপায়ই হলো আখিরাতের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-হুমাযাহ

সূরা ঃ ১০৪ — মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৯ — মোট রুকু ঃ ১

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

سـورة الـهمـزة

مكية — رقمها : ١٠٤

ايـاتها : ٩ — ركوعها : ١

بسم الله الرحمن الرحيم

১। ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে (সামনা-সামনি) ধিক্কার দেয় ও (পেছনে) নিন্দা করে বেড়ায়।	١- وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۙ
২। যে মাল জমা করেছে ও গুনে গুনে রেখেছে।	٢- الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ
৩। সে মনে করে যে, তার মাল সব সময় তার সাথেই থাকবে।[১]	٣- يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ
৪। কক্ষনো নয়। অবশ্যই এমন জায়গায় তাকে ফেলে দেয়া হবে, যা (ভেঙ্গে) টুকরা টুকরা করে।	٤- كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ
৫। সেই টুকরা টুকরা করার জায়গাটি সম্পর্কে তুমি কী জান ?	٥- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ
৬-৭। (সেটা) আল্লাহর আগুন, (যাকে) বেশি করে জ্বালানো হয়েছে। যা অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।	٦- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ
	٧- الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ
৮। নিশ্চয়ই (এ আগুনকে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে।	٨- اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ
৯। (এ অবস্থায় তারা) উঁচু উঁচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)[২]	٩- فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ࣖ

১। এ কথার আরও একটা অর্থ হতে পারে। সে মনে করে যে, তার ধন-রত্ন তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তার মনে কখনও একথা আসে না যে, তাকে একদিন এসব ফেলে দুনিয়া থেকে খালি হাতে চলে যেতে হবে।

২। এর কয়েক রকম অর্থ হতে পারে ঃ

ক. দোযখের দরজা বন্ধ করে উঁচু উঁচু খুঁটি গেড়ে দেয়া হবে যাতে দরজা না খোলে।

খ. এসব অপরাধী উঁচু উঁচু খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দোযখের আযাব ভোগ করতে থাকবে।

গ. দোযখের আগুনের শিখা উঁচু উঁচু খুঁটির মতো লম্বা হয়ে উপরে উঠতে থাকবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফীল

নাম ঃ পয়লা আয়াতে 'ফীল' শব্দ থেকেই এ নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ সবার মতে সূরাটি মাক্কী যুগের। এর ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে খেয়াল, করলে মনে হয় যে, মাক্কী যুগের প্রথম দিকেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ সউদী আরব ও ইয়ামান লোহিত সাগরের পূর্বদিকে এবং এ সাগরের পশ্চিম দিকে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। সউদী আরবের দক্ষিণ অংশে ইয়ামান এবং ইয়ামানের বরাবর লোহিত সাগরের অপর পারে আফ্রিকার ঐ বিখ্যাত দেশটি অবস্থিত, যেখানে বাদশাহ নাজ্জাশীর শাসনকালে রাসূল (সা.)-এর সাহাবাগণ মাক্কাবাসীদের অত্যাচারের ফলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেকালে ঐ দেশটির নাম ছিল হাবশা। বর্তমান ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া নামে সে দেশটি পরিচিত। আমাদের এ আলোচনায় সে দেশটিকে হাবশা নামেই উল্লেখ করব।

৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে হাবশার খ্রিষ্টান শাসকরা ইয়ামান দখল করে নেয়। ১০-১২ বছর পর আবরাহা ইয়ামানের গভর্নর হয়। ধীরে ধীর আবরাহা সেখানে স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। আবরাহা গোটা আরবে ঈসায়ী ধর্ম প্রচার করার সাথে সাথে আরব ব্যবসায়ীদের হাত থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখল করার চেষ্টা করে। আরবের পূর্বদিকে ভারত, চীন ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে এবং পশ্চিমে আফ্রিকা ও ইউরোপের সাথে যে ব্যবসা চলতো, তা আরবদের মধ্যেই চালু ছিল।

আরবদের ধর্মীয় অবস্থা তখন যত বিকৃতই থাকুক, চার হাজার বছর পূর্ব থেকেই [ইবরাহীম (আ.)-এর সময় থেকেই] মাক্কার কাবাঘর সমস্ত আরববাসীর নিকট সম্মানের স্থান বলে গণ্য ছিল। এ কাবাঘর যিয়ারতের জন্য রজব, যিলক্বাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম মাসে সারা আরবে মারামারি-কাটাকাটি বন্ধ থাকতো। ঐ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এ সময় বিনা বাধায় চলতো। আর কাবাঘরের হিফাযাতকারী হিসাবে কুরাইশ বংশের লোকেরা সারা বছরই বিনা বাধায় ব্যবসা করতো। গোত্রে গোত্রে যত মারামারি ও লুটতরাজই চলুক, কুরাইশদেরকে কাবাঘরের খাতিরে সবাই সম্মান করতো বলে তাদের ব্যবসায় কোন অসুবিধা হতো না।

আবরাহা এ গোটা ব্যবসা আরবদের হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝতে পারল যে, মাক্কার কাবাঘরের মর্যাদার সাথে এর এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে, এর মতো সম্মান পাওয়ার যোগ্য কোন ধর্মীয় কেন্দ্র ইয়ামানে কায়েম করতে না পারলে ঈসায়ী ধর্ম প্রচার ও ঐ ব্যবসা দখল করার কোন আশাই পূরণ হতে পারে না। তাই ইয়ামানের রাজধানী সানাআতে এক বিরাট গির্জা তৈরি করে কাবার পরিবর্তে ঐ গির্জা যিয়ারত করার জন্য গোটা আরবে ঘোষণা দেয়া হলো।

আরবরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ গির্জায় আগুন লাগিয়ে দিল এবং অপমান করার উদ্দেশ্যে রাতের বেলা গোপনে সেখানে পায়খানা করে দিলো। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আবরাহা ষড়যন্ত্র করে নিজের লোক দিয়েই এসব করিয়েছে, যাতে কাবাঘর আক্রমণ করার জন্য অজুহাত পেয়ে যায়। আবরাহা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল যে, মাক্কার কাবাঘর কায়েম থাকতে তার তৈরি গির্জা মানুষকে

www.bjilibrary.com

মোটেই আকৃষ্ট করতে পারবে না। তাই সে কাবাঘরকে ধ্বংস করার জন্য সুযোগ তালাশ করছিল।

৫৭০ সালে তেরটি হাতিসহ ষাট হাজার হাবশী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আবরাহা মাক্কার দিকে রওয়ানা হলো। পথে কোন কোন আরব গোত্র বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মাক্কার কাছাকাছি আসার পর সেনাবাহিনীকে সেখানেই থামবার আদেশ দিয়ে আবরাহা মাক্কার সরদারের কাছে লোক পাঠালো। দূত গিয়ে বলল যে, বাদশাহ মাক্কাবাসীকে আক্রমণ করার জন্য আসেন নি। কাবাঘর ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ বিষয়ে সরদারদের সাথে বাদশাহ্ কথা বলতে চান।

রাসূল (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবই সবচেয়ে বড় সরদার ছিলেন। তিনি দূতের সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, আবরাহা তাঁকে দেখেই নিজের আসন থেকে উঠে সম্মানের সাথে তাঁকে নিয়ে আলোচনায় বসলো। আবদুল মুত্তালিব বললেন যে, আপনার কোন কিছুর দরকার থাকলে আমাদেরকে জানালেই হতো, আপনার নিজের এতদূর আসার কী দরকার ছিল? আবরাহা বলল, আমি শুনেছি কাবাঘর নাকি শান্তির ঘর। আমি এ শান্তিকে খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বললেন যে, এটা আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত আল্লাহ কোন লোককে এ ঘর দখল করতে দেন নি। আবরাহা বলল, আমি এ ঘর না ভেঙ্গে ফিরে যাব না। আবদুল মুত্তালিব বললেন, আপনি যা চান আমাদের কাছে থেকে নিয়ে ফিরে যান। কিন্তু আবরাহা এ কথা মানতে রাযী হলো না এবং মাক্কা আক্রমণ করার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, আবরাহার সেনাবাহিনী যেখানে অবস্থান করছিল, সেখানে তারা মাক্কাবাসীদের উট, গরু-ছাগল ইত্যাদি পালিত পশু দখল করে নিয়েছিল। এর মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের ২০০ উট ছিল। আবরাহার সাথে আলোচনার সময় আবদুল মুত্তালিব যখন তার উট ফেরত চাইলেন, তখন আবরাহা বলল, "আপনি কাবাঘরের খাদিম, আর আমি এসেছি সে ঘর ধ্বংস করতে। ঐ ব্যাপারে আপনাকে পেরেশান মনে হলো না। অথচ আপনার উটের জন্য এত ব্যস্ত হলেন?" এর জওয়াবে আবদুল মুত্তালিব বললেন, "ঐ ঘরের যিনি মালিক, তিনি তাঁর হিফাযাত করবেন। আমি ঐ ঘরের মালিক নই। আমি যেসব উটের মালিক, তা আমার হিফাযাতে দিয়ে দিন।" তখন আবরাহা তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। আবদুল মুত্তালিব মাক্কায় ফিরে এসে মাক্কাবাসীকে বিবি-বাচ্চা নিয়ে পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিবার পরামর্শ দিলেন এবং কতক কুরাইশ সরদারকে নিয়ে কাবাঘরের দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে ধরণা দিলেন, যাতে আল্লাহ তাঁর ঘরকে হিফাযাত করেন। এ বিপদের সময় কোন সরদারই কাবায় রাখা ৩৬০টি মূর্তির কাছে ধরণা দেন নি। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সবাই দোয়া করলেন। দোয়ায় কিরূপ কাতরভাবে তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন, তা তাফহীমুল কুরআনের তাফসীরে লেখা আছে।

আবরাহা যখন মাক্কার দিকে এগিয়ে আসতে চাইল, তখন তার নিজস্ব হাতি 'মাহমুদ' হঠাৎ বসে পড়লো এবং মাহুত তাকে যখম করা সত্ত্বেও মাক্কার দিকে এক কদমও এগুতে রাযী হলো না। অন্যদিকে যেতে বললে সে দৌড়ে যায়, কিন্তু মাক্কার দিকে নিতে চাইলেই বসে যায়। এ সময় হঠাৎ বিরাট একদল পাখি ঠোঁটে ও পায়ে করে কংকর নিয়ে এসে আবরাহার হাবশা

www.bjilibrary.com

সেনাবাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো ফেলতে লাগলো। যার উপরই এ পাথর পড়তো, তার শরীর গলে যেতো, গায়ের গোশত খুলে খুলে পড়তো এবং রক্ত পানির মতো বয়ে যেতো। আবরাহাও এভাবেই মরে গেল। ৬০ হাজারের গোটা বাহিনী পালাতে থাকলো ও পথে পথে মরতে মরতে শেষ হয়ে গেল।

এভাবে আবরাহা ধ্বংস হয়ে যাবার পর ইয়ামানে হাবশার রাজত্বও খতম হয়ে গেলে এবং হাবশার বিরুদ্ধে ইয়ামান বিদ্রোহ করে তাদের আযাদী ফিরে পেল। মাক্কা থেকে আরাফাত যাবার পথে মিনা ও মুযদালিফার মাঝামাঝি যে জায়গাটি মুহাস্‌সির নামে পরিচিত, সেখানেই আবরাহার সেনাবাহিনীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখি এসে কংকর বৃষ্টি বর্ষণ করে। রাসূল (সা.) আরাফাত যাতায়াত করার সময় এ জায়গাটিকে আল্লাহর গযবের স্থান মনে করতেন এবং তাড়াতাড়ি এ জায়গাটি পার হয়ে চলে যেতেন। এখানে কোন সময় অবস্থান করতেন না। হাজ্জের সময় আরাফাত থেকে ফিরে আসবার সময় মুযদালিফায় হাজী সাহেবগণকে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়। তখন সবাই সাবধান থাকেন যেন ভুলে মুহাস্‌সির নামক এ স্থানটিতে অবস্থান করতে না হয়।

আবরাহার হাবশী বাহিনী সারা আরবে 'আসহাবুল ফীল' বা হাতিওয়ালা বাহিনী নামেই পরিচিত হয় এবং যে বছর এ ঘটনা ঘটে, সে বছরকে 'আমুল ফীল' বা হাতির বছর বলা হয়। এটা এত বড় ঘটনা যে ঘরে ঘরে এর ব্যাপক চর্চা হয় এবং কবিরাও এ বিষয়ে বহু কবিতা রচনা করে। এ ঘটনা মুহাররম মাসে ঘটে, আর রাসূল (সা.) রবিউল আউয়ালে পয়দা হন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, আবরাহার ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচনার ধারা ঃ আবারাহার হাতীওয়ালা বাহিনীকে ধ্বংস করার ঘটনাকে সামান্য কয়েকটি কথায় এ সূরাটিতে পেশ করা হয়েছে। মাক্কার সবাই এ বিষয়ে ভাল করেই জানতো বলে সামান্য ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এ সূরাটি নাযিল হবার মাত্র ৪০-৪২ বছর আগে আবরাহার বাহিনীকে সামান্য পাখির দ্বারা যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তা যে একমাত্র আল্লাহর অসীম কুদরাতেই হয়েছে এ কথা গোটা আরববাসী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো। ইতিহাসে এ কথাও স্বীকৃত যে, কুরাইশ সরদাররা কাবাঘরের হিফাযাতের জন্য কাতরভাবে একমাত্র আল্লাহরই কাছে দোয়া করেছিলেন। আর আল্লাহর কুদরাতের চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে কুরাইশরা এত অভিভূত হয়েছিল যে, এরপর দশ বছর তারা মূর্তিপূজা করে নি।

এ সূরাতে আল্লাহর কুদরাতের ঐ বাস্তব প্রমাণের ইংগিত দিয়ে বিশেষভাবে কুরাইশদেরকে এবং সাধারণভাবে সব আরববাসীকে বুঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে ঐ শক্তিমান আল্লাহর দাসত্ব করারই দাওয়াত দিচ্ছেন, যিনি সামান্য পাখির মাধ্যমে কাবাঘরের দুশমনকে ধ্বংস করেছেন। মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদাত করার দাওয়াত যে রাসূল (সা.) দিচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধে যারা আজ দুশমনী করছে, তাদের ভালভাবে চিন্তা করা উচিত যে, ঐ আল্লাহর গযব তাদের উপরও পড়তে পারে এবং যিনি বাদশাহ আবরাহার আক্রমণ থেকে কাবাঘরকে হিফাযাত করতে পারেন, তিনি তাঁর রাসূলকেও কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করতে সক্ষম।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফীল	سورة الفيل
সূরা ঃ ১০৫ মাক্কী যুগে নাযিল	مكية رقمها : ١٠٥
মোট আয়াত ঃ ৫ মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٥ ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم

১. তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী (ব্যবহার) করেছেন ?

١- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ ۝

২. তিনি কি তাদের চালাকি বানচাল করে দেন নি ?

٢- اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝

৩-৪. আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন যারা তাদের উপর পাকা মাটির তৈরি পাথর ফেলছিল।

٣- وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

٤- مِنْ سِجِّيْلٍ ۝

৫. ফলে তাদেরকে (পশুর) চিবানো ভুসির[১] মতো করে দিলেন।

٥- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

১। এটা ঐ ঘটনার কথা, যা রাসূল(সা.)-এর জন্মের মাত্র ৫০ দিন আগে ঘটেছিল। ইয়ামানের খ্রিষ্টান বাদশাহ আবরাহা ষাট হাযার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে কাবা ঘর ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে মাক্কা আক্রমণ করে। এ বাহিনীর সাথে কতক হাতিও ছিল। যখন এরা মুযদালিফা ও মিনার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছলো, তখন লোহিত সাগরের দিক থেকে দলে দলে এক প্রকার পাখি ঠোঁটে ও পায়ে পাথরের টুকরা নিয়ে এসে আবরাহার বাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো ফেলতে লাগলো। যার উপর এ কংকর পড়লো, তারই গায়ের মাংস গলে গলে পড়তে থাকলো। এভাবে সে বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলো।

আরবে এ ঘটনা খুব বিখ্যাত ছিল। এ সূরা নাযিল হবার সময় মাক্কায় হাযার হাযার এমন লোক জীবিত ছিল, যাদের চোখের সামনে ঐ ঘটনা ঘটেছে। সমস্ত আরববাসী এ কথা স্বীকার করতো যে, একমাত্র আল্লাহর কুদরাতেই ঐ বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

সূরা কুরাইশ

নাম ঃ পয়লা আয়াতের কুরাইশ শব্দই এ সূরার নাম।

নাযিলের সময় ঃ কেউ কেউ এ সূরাকে মাদানী যুগের বলেছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরগণ এ সূরাটিকে মাক্কী যুগের বলেই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় আয়াতের "এই ঘরের রব" কথাটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মাক্কী যুগের। এই ঘর বলতে যে কাবাঘরই বুঝায় এ বিষয়ে সবাই একমত। তাই মাদানী যুগে মাক্কার ঘরকে এই ঘর বলা কিছুতেই মানানসই হতে পারে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ কুরাইশ বংশের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষ কুসাই বিন কিলাবের পূর্ব পর্যন্ত আরবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। কুসাই-এর চেষ্টায় এরা মাক্কায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং আল্লাহর ঘরের খাদিমের দায়িত্ব পায়। তারই নেতৃত্বে মাক্কা শহরভিত্তিক একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠে। হাজ্জের সময় সমস্ত আরব থেকে আগত হাজীদের সন্তোষজনক খিদমাতের মাধ্যমে কুরাইশদের মর্যাদা ও প্রভাব বেড়ে যায়।

কুসাই-এর ছেলে আবদে মানাফ পিতার জীবিতকালেই আরববাসীদের নিকট সুনাম অর্জন করে। আবদে মানাফের চার ছেলের মধ্যে হাশিম বড় ছিল। রাসূল (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব হাশিমেরই ছেলে। গোটা আরবে কুরাইশ বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম-সুখ্যাতির ফলে হাশিমই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দেয়। সূরা ফীলের ঐতিহাসিক পটভূমিতে বলা হয়েছে যে, আরবের পূর্ব ও পশ্চিম দেশগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু ছিল। কিন্তু এ ব্যবসা তখন ইরানীদের হাতে ছিল। ইরানীরা একদিকে পারস্য উপসাগর দিয়ে দক্ষিণ আরবের মাধ্যমে পূর্বদিকের দেশগুলোর সাথে এবং অপরদিকে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে মিসর ও সিরিয়ার সাথে এ ব্যবসা চালু করেছিল। যদিও আরবদের সহযোগিতা ছাড়া এ ব্যবসা চলতে পারতো না, তবু এ ব্যবসার আসল লাভ ইরানীরাই ভোগ করতো।

কুরাইশ নেতা হাশিম সারা আরবে তাদের সুনাম ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে এ বাণিজ্যে আরবদের প্রাধান্য হাসিলের উদ্যোগ নেয়। হাজ্জের সময় কুরাইশদের উদার ব্যবহার ও আশাতীত খিদমাতে আরবের সব গোত্রের লোকই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকায় কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফিলাকে কেউ লুট করতো না। এমনকি তাদের কাছে কোন গোত্রই কোনরকম ট্যাক্স দাবী করতো না। এ ব্যবসার সুযোগে মাক্কা শহর আরবের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হলো।

হাশিম ও তার ভাই আবদে শামস, মুত্তালিব ও নাওফেল মিলে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়ামান ও হাবশার শাসকদের কাছ থেকে সরকারীভাবে এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুমতি

হাসিল করে নেয়। এ ব্যবসা এতটা উন্নতি লাভ করে যে, এরা চার ভাই আরবে "ব্যবসায়ী গোষ্ঠী' হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এ বাণিজ্য উপলক্ষে আরবের সমস্ত গোত্রের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং চারপাশের রাষ্ট্রগুলোর সাথে আরবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার কারণে কুরাইশ নেতাগণ "আসহাবুল ঈলাফ" বা "বন্ধুত্ব ও পরিচয়ের ধারক ও বাহক" হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই 'ঈলাফ' শব্দটি দিয়েই সূরা কুরাইশ শুরু হয়েছে।

কুরাইশদের এ মর্যাদার ফলে সারা আরবে তাদের নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়া হতো। ধন-দৌলতের দিক দিয়েও তারা আরবের সেরা গোত্রে পরিণত হয়। মাক্কা শহর আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রের মর্যাদা পায়। আন্তর্জাতিক পরিচিতির দরুন কুরাইশরা ইরাক থেকে উন্নত মানের আরবি অক্ষর লেখার শিক্ষা পায় এবং সে অক্ষরেই কুরআন মজীদ লিখিত হয়। লেখা-পড়ার চর্চা কুরাইশদের মধ্যে যে পরিমাণে ছিল, এতটা আর কোন গোত্রে ছিল না। এসব কারণেই রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "কুরাইশই জনগণের নেতা"।

এ অবস্থায় যদি বাদশাহ আবরাহার হাবশী বাহিনী কাবাঘর ধ্বংস করতে পারতো, তাহলে কুরাইশদের সব কিছুই খতম হয়ে যেতো। আল্লাহর ঘর হিসাবে কাবার মর্যাদা শেষ হয়ে যেতো, কাবার খাদিম হিসাবে কুরাইশদের সম্মানও খতম হতো। মাক্কা আর ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হতো না এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরবদের হাত থেকে হাবশীদের হাতে চলে যেতো।

আল্লাহর কুদরতে হাবশী বাহিনী চরম গযবে পতিত হবার ফলে কাবাঘর "বাইতুল্লাহ" হিসাবে সারা আরবে আগের চেয়েও বেশী সম্মানিত বলে গণ্য হলো এবং সাথে সাথে কুরাইশদের নেতৃত্ব আরও মযবুত হলো। সবার মনেই এ বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, কুরাইশদের উপর আল্লাহর খাস মেহেরবানী আছে।

আলোচনার ধারা ঃ উপরিউক্ত পটভূমিকে সামনে রাখা হলে সূরা কুরাইশের মর্মকথা বুঝতে কোন রকম বেগ পেতে হয় না। শীত, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সারা বছর সর্বত্র ব্যাপক পরিচিতি ও বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে কুরাইশরা যে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে, তার বাহাদুরী যে তাদের নয়, একথাই এ সূরায় বুঝানো হয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষ কুসাই-এর নেতৃত্বে কুরাইশরা মাক্কায় সমবেত হবার পূর্বে সারা আরবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তারা যে অভাব-অনটনে ছিল এবং নিরাপত্তার দিক দিয়ে অন্যান্য আরব গোত্রের মতোই তারা যে অনিশ্চিত অবস্থায় জীবন যাপন করতো, সে দুরবস্থা থেকে বর্তমান সুদিনের কারণ যে একমাত্র এই কাবাঘর, সে কথা এখানে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ ঘরের যিনি মালিক, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা তাদের উচিত। আর মুহাম্মদ (সা.) তাদেরকে এ কথারই দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত কবুল করলেই কুরাইশদের মর্যাদা বহাল থাকতে পারে। নেতৃত্বের অহংকারে যদি এ দাওয়াত তারা কবুল না করে, তাহলে এ ঘরের মালিকই তাদের মর্যাদা কেড়ে নেবেন।

www.bjilibrary.com

সূরা কুরাইশ	سورة قريش
সূরা ঃ ১০৬ মাক্কী যুগে নাযিল	مكية رقمها : ١٠٦
মোট আয়াত ঃ ৪ মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٤ ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم
১. যেহেতু কুরাইশরা সুপরিচিত হয়েছে।	١۔ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ
২. (অর্থাৎ) শীতকাল ও গরমকালে (বিদেশ) সফরে তাদের পরিচিতি হয়েছে,[১]	٢۔ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِۚ
৩. সেহেতু এ (কাবা) ঘরের[২] মালিকের ইবাদাত করা তাদের উচিত।	٣۔ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ
৪. যিনি তাদেরকে খিদে থেকে বাঁচিয়ে খাবার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদে রেখেছেন।[৩]	٤۔ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ ە وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍۚ

১. শীত ও গ্রীষ্মের সফর মানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর। কুরাইশ বংশের লোকেরা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে এবং শীতকালে দক্ষিণ আরবের দিকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতো। এরই ফলে তারা ধনশালী হতে পেরেছিল।

২. এর অর্থ হলো কাবাঘর যা মাক্কা শহরে অবস্থিত।

৩. মাক্কাকে হারাম শরীফ (সবার সম্মানের জায়গা) হিসাবে সবাই মানতো বলে কুরাইশদের বিশ্বাস ছিল যে, কেউ মাক্কা আক্রমণ করবে না। আর কুরাইশরা কাবাঘরের খাদিম ছিল বলে তাদের বণিকদের কাফেলা নিরাপদে আরবের সব এলাকায় যাতায়াত করতে পারতো এবং কেউ তাদের সাথে কোন রকম খারাপ ব্যাবহার করতো না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-মাউন

নাম ঃ এ সূরার শেষ শব্দটি দিয়ে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী যুগের, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সূরাটির মধ্যে এমন প্রমাণ রয়েছে, যার দরুন এ সূরাকে মাদানী বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। সূরার ৪-৬ আয়াতে যাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তারা ঐ শ্রেণীর মুনাফিক, যাদের অস্তিত্ব মাক্কায় ছিল না। মাদীনার বিজয় যুগেই লোক দেখানো নামাযীদের সন্ধান মেলে। এরা আসলে মুসলিম ছিল না। এরা মুসলিম সেজে মুসলিম সমাজে ঢুকে ইসলামের দুশমনী করতো। কিন্তু নামাযের জামায়াতে যারা হাযির হয় না, তাদেরকে মুসলিম হিসাবে গণ্যই করা হতো না বলে বেচারাদেরকে নামাযী সাজতে হতো। এ জাতীয় মুনাফিক মাক্কার সংগ্রাম যুগে ছিল না। সে সময় তো খাঁটি মুসলমানদের পক্ষেও প্রকাশ্যে নামায পড়া কঠিন ছিল। মাক্কী যুগের মুনাফিকদের পরিচয় সূরা আনকাবুতের পয়লা রুকুতে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সূরা মাউন নিঃসন্দেহে মাদানী।

আলোচ্য বিষয় ঃ আখিরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের চরিত্র কী ধরনের হয়।

আলোচনার ধারা ঃ (১) পয়লা তিন আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা কি খেয়াল করে দেখ না যে, যারা এ দুনিয়ার জীবনকেই সবকিছু মনে করে এবং মৃত্যুর পর আখিরাতে যে দুনিয়ার জীবনের হিসাব নিয়ে ভাল ও মন্দ কাজের বদলা দেয়া হবে- এ কথাকে যারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তাদের চরিত্র কেমন হয়ে থাকে ? এ জাতীয় লোকেরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। ইয়াতীম, মিসকীন ও সমাজের অভাবগ্রস্তদের প্রতি এদের কোন দরদের পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ, দরদ থাকলেই ত্যাগ সম্ভব। আখিরাতে বদলার আশা যারা করে না, তারা কেন ত্যাগ করবে ? অভাবীদের জন্য দরদ বোধ করা ও তাদের জন্য খরচ করার মধ্যে তারা দুনিয়ার কোন লাভই দেখে না। আর বিনা লাভে মানুষ কি কাজ করতে পারে ?

(২) ৪-৬ আয়াতে আখিরাতে অবিশ্বাসীদের একটা বড় দোষের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা যদি কোন ভাল কাজ করেও, তাহলে তা দেখাবার উদ্দেশ্যেই করে। ভোটের জন্য, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য অর্থাৎ দুনিয়ার কোন স্বার্থ পাওয়ার জন্য দরকার হলে এরা দরদ দেখায় এবং ত্যাগও করে থাকে। এ দরদ আসল দরদ নয়, একেবারেই মেকি।

আর এ জাতীয় ত্যাগ আরও বেশী পাওয়ার জন্য করে থাকে। এমনকি এরা যদি দুনিয়ার স্বার্থে ঈমানদার সাজতে বাধ্য হয়, তাহলে নামাযও লোক দেখাবার জন্যই পড়ে এবং এর মধ্যে যত রকমভাবে ফাঁকি দেয়া যায়, সে চেষ্টাই করে।

(৩) শেষ আয়াতে এদের ছোটলোকীর পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, এরা দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস পর্যন্ত কাউকে ধার দিতে রাযী হয় না। মানুষের সামান্য কোন প্রকার উপকারই তাদের দ্বারা হয় না। এরা শুধু নিজের স্বার্থ-চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আখিরাতে বিশ্বাস করলে তাদের এ ধান্দাই বড় হতো যে, আল্লাহর সৃষ্টির কী কী খিদমাত করে আল্লাহকে খুশী করা যায় যাতে আখিরাতে লাভবান হওয়া যায়। এদের নিকট দুনিয়ার স্বার্থই একমাত্র ধান্দা।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-মাউন	سورة الماعون
সূরা ঃ ১০৭ — মাক্কী যুগে নাযিল	مكية — رقمها : ١٠٧
মোট আয়াত ঃ ৭ — মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٧ — ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۟ؕ
٢- فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۟ۙ
٣- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۟ؕ
٤- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۟ۙ
٥- الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۟ۙ
٦- الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۟ۙ
٧- وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۟

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে (আখিরাতের) বদলাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ?

২-৩. ঐ লোকই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) এবং মিসকীনের খাবার* দিতে উৎসাহ দেয় না।[১]

৪-৫. অতঃপর ঐ নামাযীদের জন্য ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে,[২]

৬. যারা লোক দেখানো কাজ করে।

৭. (এমনকি) সাধারণ ব্যবহারের জিনিসও ❖ (অন্যকে দেয় না।)

১. অর্থাৎ এরা ইয়াতীমকে সাহায্য করা দূরের কথা, ভদ্রতার সাথেও বিদায় করে না, বরং গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর এদের মালে যে মিসকীনদের হক আছে, সে কথাও তারা স্বীকার করে না।

২. এর অর্থ নামাযে ভুল করা নয়। নামাযে অবহেলা করা মানে, নামাযকে গুরুত্ব না দেয়া। কখনো পড়ে, কখনো পড়ে না, পড়লেও সময় মতো পড়ে না, নামাযে এমন ভাবে যায় যেন এতে কোন আগ্রহ নেই, দায়ে ঠেকে যেন যায়, নামায পড়া অবস্থায় কাপড় নিয়ে খেলে, বার বার হাই তোলে, নামায পড়ছে অথচ মন সেদিকে নেই, এত তাড়াহুড়া করে পড়ে যে, রুকু-সাজদা ঠিকমত হয় না, ইত্যাদি।

* খেয়াল রাখা দরকার যে, "মিসকীনকে খাবার" দেবার কথা বলা হয় নি। "মিসকীনের খাবার" বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো যে সচ্ছল লোকদের নিকট মিসকীনদের খাবার আছে। যখন মিসকীনকে খাবার দেয়া হয়, তখন তার নিজের খাবারটুকুই সে পায়। এ খাবার দাতার দয়া নয়-মিসকীনের হক।

❖ 'মাউন' মানে সাধারণ ব্যাবহারযোগ্য এমন সব দৈনন্দিন জরুরী জিনিস, যা প্রতিবেশীরা একে অপর থেকে ধার নেয় এবং কাজ শেষে ফেরত দেয়। এ সব জিনিস ধনী-গরীব সবাই ধার চাইতে লজ্জা করে না। এ ধরনের জিনিস দেয়া-নেয়া সাধারণভাবে প্রচলিত এবং কেউ চাইলে না দেয়াটা খুব ছোটলোকের স্বভাব বলে মনে করা হয়। যেমন বই-কলম, বাসন-পেয়ালা, দা-কোদাল-কুড়াল-খন্তা, বিছানা-বালিশ, ডেক-ডেকচি, বালতি ইত্যাদি।

সূরা আল-কাওসার

নাম ঃ পয়লা আয়াতের 'কাওসার' শব্দ থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ এ বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের দরুন যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে সূরাটি মাক্কী যুগেই নাযিল হয়েছে। সূরার আলোচ্য বিষয় থেকেও বুঝা যায়, তখন ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (সা.)-কে সান্ত্বনা দেয়া দরকার মনে করেছেন। এ জাতীয় পরিবেশ মাক্কায়ই ছিল। তাই এ সূরাটি নিঃসন্দেহে মাক্কী।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ সূরা দোহা ও সূরা আলাম নাশরাহ সম্বন্ধে আলোচনায় দেখানো হয়েছে, নবুওয়াতের প্রথম দিকে যখন রাসূল (সা.) নিজের বংশের লোকদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিলেন, তখন কেমন ধরনের বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। রাসূল (সা.) এবং তার সামান্য কয়েকজন সাহাবীর ঐ অসহায় অবস্থায় আল্লাহ পাক সূরা দোহার ৩ ও ৪ নং আয়াতে সান্ত্বনা দিলেন যে, 'নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরের অবস্থা আগের অবস্থার চেয়ে ভাল আসবে এবং শিগগিরই আপনার রব আপনাকে এতো দান করবেন যে, আপনি খুশী হয়ে যাবেন'। সূরা আলাম নাশরাহ-এর ৪ থেকে ৬ নং আয়াতে আবার সান্ত্বনা দিলেন যে, 'আমি আপনারই খাতিরে আপনার সুনামের কথা উঁচু করে দিয়েছি, নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানী রয়েছে'। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, দুশমনরা সারাদেশে আপনার বদনাম করার চেষ্টা করছে দেখে ঘাবড়াবেন না। আমি আপনার নাম উজ্জ্বল করার ব্যবস্থা করেছি। আর বর্তমানে পরিবেশ আপনার জন্য কঠিন দেখে পেরেশান হবেন না, এ অবস্থা বেশী দিন থাকবে না।

এমনি কঠিন পরিবেশেই সূরা কাওসারের মাধ্যমে একদিকে রাসূল (সা.)-কে সান্তনা দেয়া হয়েছে, অপরদিকে তার দুশমনদেরই লেজ কাটা যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। সে সময় পরিবেশ কিরূপ নৈরাশ্যজনক ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসেই রয়েছে।

কুরাইশ সরদাররা বলতো, 'সে তো গোটা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একঘরে হয়ে গেছে এবং তার কোন সঙ্গী-সাথী ও সহায়ক নেই'। তারা আরো বলতো,'সে তো শিকড়-কাটা গাছের মতো শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে।' মাক্কার সরদার আস বিন ওয়ায়েল বলতো, 'সে তো জড়-কাটা এক লোক, তার কোন ছেলে সন্তান নেই, মরে গেলে তার নাম নেবারও কেউ থাকবে না'।

রাসূল (সা.)-এর বড় ছেলে কাসিম (রা.) পয়লা ইন্তিকাল করেন। পরে ছোট ছেলে আবদুল্লাহ (রা.)-ও যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা ও নিকটতম প্রতিবেশী আবূ লাহাব খুশী হয়ে দৌড়ে যেয়ে এ খবরটাকে একটা সুসংবাদ হিসাবে ছড়াতে ছড়াতে বললো, "আজ রাতে মুহাম্মদ নিঃসন্তান হয়ে গেল, তার শিকড় কেটে গেল"।

www.bjilibrary.com

এ অবস্থায় রাসূল (সা.)-এর মনে কতটা ব্যথা বোধ হওয়ার কথা, তা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিকে তাওহীদের দাওয়াত দেবার পরে মুশরিক কুরাইশদের কাছে তিনি হেয় হয়ে গেলেন। বংশের সেরা সম্মানিত বলে যিনি সমাদর পেতেন, তিনি 'বংশের কলংক' বলে চিহ্নিত হলেন। অপরদিকে যে কজন লোক তার সাথী হয়েছিলেন, তাদেরকেও সমাজচ্যুত করে মারপিট করতে লাগলো। এরপর একে একে সব পুত্র সন্তানের ইন্তিকালে যখন পাড়া-প্রতিবেশী ও দূরের আত্মীয়দের কাছ থেকে শোক জ্ঞাপন ও সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিবর্তে আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা পর্যন্ত উৎসব পালন করতে থাকলো, তখন রাসূল (সা.)-এর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

সূরা কাওসার আল্লাহ পাকের ঐ উপলব্ধিরই প্রমাণ। আল্লাহ নিজেই যাকে ইসলামী আন্দোলনের কঠিন ময়দানে নামিয়ে দিয়েছেন, তার আপদ-বিপদ ও দুঃখ-বেদনায় তিনি ছাড়া আর কে সান্ত্বনা দেবে?

সূরা কাওসার সে সান্ত্বনার সওগাত নিয়েই হাযির হয়েছে। এ সূরাটি কুরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা। কিন্তু এর মধ্যে রাসূল (সা.)-এর জন্য এমন মহা সুসংবাদ রয়েছে, যা আর কোন মানুষকে কোন কালেই দেয়া হয়নি। সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করছে আসলে তারাই জড়-কাটা ও শিকড়-ছেঁড়া বলে প্রমাণিত হবে।

আলোচ্য বিষয় ঃ রাসূলের প্রতি আল্লাহ অগণিত দান ও বিরোধীদের প্রতি অভিশাপের ঘোষণা।

আলোচনার ধারা ঃ (১) এ সূরা নাযিলের সময়কার নৈরাশ্যজনক যে করুণ বিবরণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ফলে রাসূল (সা.) শোক-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার যে মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, সে অবস্থায় মাত্র ১০টি শব্দের ছোট্ট এ সূরাটির পয়লা তিনটি শব্দে আল্লাহ পাক যেন দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত নিয়ামাত তাঁর প্রিয় বান্দার উপর ঢেলে দিলেন। 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি' বলে আল্লাহ পাক যেন এক কথায়ই সবকিছুই দিয়ে দিলেন। কোন ভাষায়ই এক শব্দে 'কাওসার' শব্দটির তরজমা পেশ করা সম্ভব নয়। সব রকম কল্যাণ ও মঙ্গল এবং অফুরন্ত নিয়ামাতের প্রাচুর্য এ একটা শব্দেই বুঝাচ্ছে। ভবিষ্যতে 'কাওসার' দেয়া হবে বলে এখানে বলা হয়নি। বরং নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, কাওসার দেয়া হয়ে গেছে। এ কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

দুশমনরা ধারণা করেছিল যে, 'ইসলামী আন্দোলনের কারণে রাসূল (সা.)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য খতম হয়ে গেছে। সমাজে তিনি একঘরে হয়ে আছেন অসহায় সঙ্গী-সাথীরাও নির্যাতিত ও আধমরা অবস্থায় আছে। ছেলেরাও মরে গেলো। এ অবস্থায় বেচারা দুনিয়া থেকে চলে গেলে এর নাম নেবার জন্যও আর কেউ থাকবে না।' এর জওয়াবে সামান্য এক কাওসার শব্দে আল্লাহ পাক পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, 'হে আমার প্রিয় বান্দা, আমি আপনাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়েছি, চরিত্রের অতুলনীয় সম্পদ দিয়েছি, কুরআন, ইলম ও হিকমাত দান করেছি এবং মানব জাতির উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য জীবন বিধান দিয়েছি। এসবের কারণে

কিয়ামাত পর্যন্ত আপনার উম্মতের মাধ্যমেই মানব জাতি কল্যাণের পথ পেতে থাকবে। আর কিয়ামাতের পর হাশরের ময়দানে যখন সব মানুষ পিপাসায় কাতর হবে, তখন 'হাউজে কাওসার' আপনারই দায়িত্বে থাকবে এবং আপনি যাদেরকে এ হাউজ থেকে পানি পান করাবেন, তারা ছাড়া আর কেউ সেদিন পানি পাবে না। এ পানি বেহেশতের হাউজে কাওসার থেকেই হাশরের ময়দানে প্রবাহিত হবে। হাশরের পর যখন আপনি জান্নাতে যাবেন, তখনও সেখানকার হাউজে কাওসার আপনারই হাতে থাকবে। এসব নিয়ামাতই আপনাকে দিয়ে দিলাম। হাউজে কাওসারের পানি সম্বন্ধে হাদীসে বিস্তর আলোচনা আছে। বলা হয়েছে যে, সে পানি দুধ, বরফ ও রূপা থেকে বেশী সাদা, বরফ থেকে ঠান্ডা ও মধু থেকে মিষ্টি। এর নীচের মাটি মিসক আতর থেকে বেশী সুগন্ধি। যে এ পানি পান করবে, তার আর পিপাসা হবে না, আর যে এ পানি থেকে বঞ্চিত হবে, অন্য কিছুতেই তার পিপাসা মিটবে না।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার দুশমনদের বেদনাদায়ক কথাবার্তা গায়ে মাখবেন না। আপনার সম্পর্কে তাদের মন্তব্যে মন খারাপ না করে আপনার রবের দেয়া দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

(৩) শেষ আয়াতে রাসূল (সা.)-কে শান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে লেজ-কাটা বা জড়-কাটা বলছে, তারাই আসলে এসব উপাধি পাওয়ার যোগ্য। কিছুদিন সবর করুন দেখবেন যে, আপনার দুশমনরা কিভাবে পরাজিত হয় এবং এবং চিরদিনের জন্য মানব জাতির নিকট ঘৃণ্য হয়ে থাকে।

বিশেষ শিক্ষা

ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আসল সম্পদ নয়। দুনিয়ায় আল্লাহর মরযী মতো কাজ করে আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই আসল কামিয়াবী।

কুরাইশ সরদাররা রাসূল (সা.)-এর কোন পুত্র-সন্তান না থাকার ফলে মনে করেছিল যে, তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার নাম নিশানাও মিটে যাবে। তারা নিজেদের হিসাব অনুযায়ীই এ ধারণা করেছিল।

কিন্তু এ কথাই চির সত্য যে, মানুষ কর্মের মাধ্যমেই বেঁচে থাকে। পরবর্তী বংশধরদের মাধ্যমে কারো নামটুকু শুধু কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু যিনি মহৎ ও বড় কোন কাজ করে যান, তাকে গোটা মানব জাতি চিরদিন মনে রাখে। এসব লোকের মৃত্যু নেই।

রাসূল (সা.)-এর কোন ছেলে না থাকায় রক্তের দিক দিয়ে তার বংশ বাড়ে নি। কিন্তু তাঁর রূহানী সন্তান দুনিয়ার সব জায়গায় পাওয়া যায়। কোটি কোটি মানুষ রাসূল (সা.)-কে যেভাবে মহব্বত করে এবং তাঁর জন্য যে আবেগ বোধ করে, আর কোন মানুষের বেলায় কি এমন হয়?

যারা রাসূল (সা.)-কে লেজ-কাটা বলে মনে করেছিল, তাদেরকে ধিক্কার দেয় না এমন মানুষ কি দুনিয়ায় আছে? এমন কি যারা আজ আবু জাহ্ল ও আবু লাহাবদের ভূমিকা পালন করছে, তারাও এদেরকে ধিক্কারই দিয়ে থাকে। তাই এরাই আসলে লেজ-কাটা।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-কাওসার		سورة الكوثر	
সূরা ঃ ১০৮	মাক্কী যুগে নাযিল	رقمها : ١٠٨	مكية
মোট আয়াত ঃ ৩	মোট রুকু ঃ ১	ركوعها : ١	اياتها : ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. (হে রাসূল) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাওসার' দান করেছি।[১]

١- إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

২. সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্যই নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।

٢- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

৩. আসলে আপনার দুশমনই জড়-কাটা[২] (শিকড়-ছেঁড়া বা লেজ-কাটা)।

٣- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

১. কাওসার অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত কল্যাণ ও মঙ্গল। হাশরের দিন 'হাউজে কাওসার' এবং বেহেশতের কাওসার নামক ঝরনাও ঐ সব কল্যাণের মধ্যেই গণ্য।

২. কাফিররা রাসূল (সা.)-কে দু'অর্থে জড়-কাটা বলতো। (ক) তিনি নিজের দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, মাত্র অল্প কিছু লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁর আপন কুরাইশ বংশও তাঁর দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। (খ) রাসূল (সা.)-এর কোন পুত্র সন্তানই জীবিত ছিলেন না বলে কাফিররা মনে করতো যে, তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তাঁর নাম ও পরিচয় খতম হয়ে যাবে।

এর জওয়াবে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) জড়-কাটা বা লেজ-কাটা নন, তাঁর দুশমনরাই লেজ-কাটা। অর্থাৎ রাসূল (সা.) শিগগিরই জনপ্রিয় হবেন এবং তাঁর নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে, আর কাফিররা হেয় ও পরাজিত হবে এবং চিরদিন তাদের নাম ঘৃণ্য হয়েই থাকবে।

সূরা আল-কাফিরূন

নাম ঃ পয়লা আয়াতে 'কাফিরূন' শব্দ দিয়েই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ মতভেদ সত্ত্বেও অধিকাংশ মুফাসসির সূরাটিকে মাক্কী যুগের বলেই মত প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য বিষয় থেকেও সূরাটি মাক্কী বলেই প্রমাণিত হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ রাসূল (সা.)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও কুরাইশ সরদাররা বারবার রাসূল (সা.)-এর নিকট বিভিন্ন ধরনের আপস-প্রস্তাব পেশ করতে থাকে। তখনও তারা আশা করছিলো যে, কোন না কোন রকমে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে পারলে বর্তমান ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ খতম হতে পারে।

তারা কোন সময় প্রস্তাব দিয়েছে যে, 'তোমাকে আমরা মাক্কার সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দিই, তুমি সুখে থাক কিন্তু সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না'। কোন সময় মাক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে। মাক্কার সরদাররা তাকে সরদার হিসাবে মানবার জন্যও রাযী ছিল। এসব প্রস্তাবে যখন তিনি কোন সাড়াই দিলেন না, তখন ধর্মীয় সমঝোতার চেষ্টা চললো। তারা বলল, 'তুমি আমাদের মাবুদের পূজা করতে রাযী হলে আমরাও তোমার মাবুদকে পূজা করব'। 'এক বছর তোমার ধর্ম চালু থাকুক, আর এক বছর আমাদের ধর্ম মানা হোক'।

এ জাতীয় অগণিত প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা রাসূল (সা.)-কে বিরক্ত করছিল। আল্লাহ পাক এ সূরার মারফতে স্পষ্ট জওয়াব দিয়ে তাদের এ আপস-মনোভাবকে খতম করে দিলেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা এবং শিরকের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ একশ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক এ সূরাটিকে এর ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। 'প্রত্যেকেই যার যার ধর্ম নিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাক, ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি করো না এবং একের ধর্ম অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করো না' ইত্যাদি বক্তব্য তারা এ সূরার মাধ্যমে আবিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

কুরআন পাকে 'লা-ইকরাহা ফিদ-দ্বীন' বলে অবশ্যই ঘোষণা করা হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই। কারণ দ্বীন কবুল করা মনের ব্যাপার। মনের উপর জোর চলে না। জোর করে ঈমান আনানো যায় না। জোর করে যাকে মুসলমান বানানো হয়, সে সত্যিকার মুসলিম হয় না, মুনাফিক হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়। তাই এ জাতীয় মুসলমান ইসলামী সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিধায় গায়ের জোরে মুসলমান বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

কিন্তু এ বক্তব্য সূরা কাফিরূনে নেই। এখানে বরং কাফিরদের আপস প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাওহীদের ব্যাপারে মুশরিকদের সাথে কোন সমঝোতা হতে পারে না।

আলোচনার ধারা ঃ সূরাটিতে আগাগোড়া একটা মূল বক্তব্যকেই বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে,

www.bjilibrary.com

যাতে কোন রকম অস্পষ্টতা বাকী না থাকে। আল্লাহ্ পাক এ কথাগুলো রাসূল (সা.)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন। 'হে রাসূল, আপনি এভাবে বলুন' বলে সূরাটি 'কুল' (বলুন) শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। কাফিরদের আপস-প্রস্তাবের জওয়াব এ সূরাটিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

(১) পয়লা আয়াতে রাসূল (সা.) কাফিরদেরকে সম্বোধন করেছেন। এখানে কাফির শব্দটি কোন গালি হিসাবে ব্যবহার করা হয় নি। রাসূল (সা.) ঐ সব লোককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, যারা রাসূলকে মানতে রাযী হয় নি এবং যারা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে। এখানে কাফির শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে কাফিরগণ, তোমরা যাদের ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদাত করি না'। মাক্কার কাফিররা মুশরিক ছিল। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, কিন্তু আল্লাহর সাথে অনেককে মাবুদ হিসাবে শরীক করতো। যেমন ফেরেশতা, জিন, আম্বিয়া, আওলিয়া, দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়, নদী, গাছ ইত্যাদির প্রতীক হিসাবে মূর্তি বানিয়ে এসবকে আল্লাহর বিভিন্ন শক্তির বিকাশ হিসাবে পূজা করতো। আজও দুনিয়ায় মুশরিকদের মধ্যে এসব চালু রয়েছে। এরা আল্লাহকে স্বীকার করে, কিন্তু সৃষ্টির অনেক কিছুকে মাবুদ হিসাবে আল্লাহর অংশীদার মনে করে। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করলে তার সাথে শরীক করে কি করে ?

এ আয়াতে রাসূল (সা.) যে কথাটি কাফিরদেরকে বলেছেন, এর মর্ম অতি পরিষ্কার। তিনি বলতে চান যে, 'হে কাফিরগণ, তোমরা যদিও আল্লাহকে স্বীকার কর, তবু তাঁকে একমাত্র মাবুদ মনে কর না। ইবাদাতে আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদের কারো ইবাদাত করি না। আমি শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করি।

(৩) তৃতীয় আয়াতে রাসূল (সা.) আরও পরিষ্কার করে দিলেন যে, 'আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তো তার ইবাদতকারী নও'। অর্থাৎ আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী, তোমরা তা নও। তোমরা আল্লাহকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করার ফলে তোমরা কোন কোন সময় আল্লাহর ইবাদাত করলেও তা আল্লাহর ইবাদাত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং আমার মাবুদ ও তোমাদের মাবুদ এক নয়।

এরচেয়েও বড় কথা হলো, আমি যে আল্লাহর ইবাদাত করি, তাকে তোমরা মাবুদ মেনেই নিচ্ছ না। যে গুণাবলী একমাত্র আল্লাহর, তা অন্যের মধ্যে আছে বলে তোমরা মনে কর। যে সব অধিকার একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, তার মধ্যে তোমরা অন্যকেও শরীক করে থাক। সুতরাং তোমরা আসল আল্লাহকে চিনতেই পার না। তোমাদের আল্লাহ আলাদা। তোমরা নামে মাত্র আল্লাহকে স্বীকার কর। আমি যে আল্লাহর ইবাদত করি, তোমরা সে আল্লাহর ইবাদতকারী নও।

(৪) চতুর্থ আয়াতে রাসূল (সা.) আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'হে কাফিরগণ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করে এসেছ, আমি তাদের ইবাদতকারী নই। ২নং আয়াতে যে কথাটা বর্তমান কালের অর্থে বলা হয়েছে, সে কথাটাই ৪ নং আয়াতে অতীত কালের অর্থে বলা হয়েছে। ২ নং আয়াতে 'তোমরা যার ইবাদাত কর' বলা হয়েছে, আর এখানে 'তোমরা যার

ইবাদাত করেছ' বলা হয়েছে।

অর্থাৎ রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাবুদের সংখ্যার তো হিসাবই নেই। তোমরা কত কিছুকেই মাবুদ মেনে থাক। তোমাদের পূর্বপুরুষদের মাবুদের সাথে নতুন মাবুদও তোমরা যোগ করে থাক। তোমরা মাবুদের তালিকায় যত কিছুকে এ পর্যন্ত শামিল করেছ, আমি এদের কারো ইবাদাতকারী নই।

(৫) পঞ্চম আয়াতের ভাষা তৃতীয় আয়াতের মতো হলেও দু'জায়গায় দু'রকম অর্থ বুঝায়। ২ নং আয়াতে 'তোমরা যাদের ইবাদাত কর, আমি তাদের ইবাদাত করি না' বলার পর ৩ নং আয়াতের অর্থ হয়, 'আমি যে গুণবিশিষ্ট একমাত্র মাবুদের ইবাদাত করি, তোমরা তার ইবাদাতকারী নও।

আর ৪ নং আয়াতে 'তোমরা যাদের ইবাদাত করেছ, আমি তাদেরও ইবাদাতকারী নই' বলার পর ৫ নং আয়াতের অর্থ হয় 'আমি যে গুণবিশিষ্ট একমাত্র মাবুদের ইবাদাত করি, তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে বলে মনে হয় না'। অর্থাৎ তোমরা অতীতে ইবাদাতের ব্যাপারে যে ভুলের মধ্যে ছিলে এবং এখনও তোমাদের মনোভাব যা, তাতে আমি আশা করি না যে, তোমরা আমার মাবুদের ইবাদাতকারী হবে।

(৬) শেষ আয়াতে রাসূল (সা.) চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন। হে কাফিরগণ, তোমাদের দ্বীন ও আমার দ্বীনের মধ্যে কোন রকম আপস বা সমঝোতা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহর আনুগত্যই দ্বীনের ভিত্তি। সে ভিত্তিই আমাদের এক নয়। আমার আল্লাহকে তোমরা আল্লাহ বলে স্বীকারই কর না। তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে যে ধারণা রাখ, সে ধরনের আল্লাহকে আমিও স্বীকার করি না। সুতরাং তোমাদের সাথে আমার কোন মিল হতেই পারে না। তোমাদের পথ আর আমার পথ কখনও এক নয়।

এ আয়াতের অর্থ এটা হতেই পারে না যে, 'তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপর কায়েম থাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমাকে আমার দ্বীনের উপর চলতে দাও। দ্বীনের ব্যাপারে আমরা এভাবে আপস করে চলতে থাকি। আমাদের পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই।

এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা সারা কুরআনে বহু জায়গায়ই আছে। সূরা যুমারের ১৪ নং আয়াতই এর জন্য যথেষ্ট। এতে বলা হয়েছে, 'হে নবী, এদেরকে বলে দিন যে, আমি তো আমার দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে নিয়ে তাঁরই ইবাদাত করতে থাকব। তোমরা তাঁকে ছেড়ে যার যার ইবাদাত করতে চাও করতে থাক।

একথার সঠিক অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে একথা শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি কাফির ও মুশরিকদেরকে এভাবে বলুন, 'তোমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে আমি ইবাদাতের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছি। আমি যাঁর ইবাদাত করছি, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। এ উপদেশ মানা, না মানা তোমাদের ইচ্ছা। এ বিষয়ে তোমাদের সাথে কোন রকম আপস করার প্রশ্নই ওঠে না।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-কাফিরূন	سورة الكفرون
সূরা ঃ ১০৯ মাক্কী যুগে নাযিল	مكية رقمها : ١٠٩
মোট আয়াত ঃ ৬ মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٦ ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم

১-২. হে (রাসূল) আপনি বলে দিন ঃ হে কাফিররা![1] তোমরা যাদের ইবাদাত কর আমি তাদের ইবাদাত করি না, ।[2]

৩. আর আমি যার ইবাদাত করি,[3] তোমরা তার ইবাদাতকারী নও।

৪. তোমরা যাদের ইবাদাত করেছ,[4] আমি তাদেরও ইবাদতকারী নই।

৫. আর আমি যার ইবাদাত করি, তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও।

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।[5]

١- قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ

٢- لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

٣- وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ

٤- وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ

٥- وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۗ

٦- لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۚ

১. মানে, হে ঐ সব লোক, যারা আমাকে রাসূল হিসাবে মানতে ও আমার আনীত শিক্ষাকে কবুল করতে অস্বীকার করেছ।

২. যদিও কাফিররা অন্যান্য মাবুদের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদাতও করতো, তবুও তাদের ইবাদাতকে এখানে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদকে ইবাদাতে শরীক করার দরুন তাদের কোন ইবাদাতই কবুল হবার যোগ্য নয়।

৩. অর্থাৎ যে গুণাবলী বিশিষ্ট আল্লাহর ইবাদাত আমি করি, তোমরা সেই আল্লাহর ইবাদাত করছো না।

৪. মানে, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা যে সব মাবুদের ইবাদাত করে এসেছ, আমি তাদের ইবাদাত করি না।

৫. মানে, দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে আমার কোন মিল নেই। আমার পথ আলাদা, তোমাদের পথও আলাদা।

সূরা আন-নাসর

নাম ঃ পয়লা আয়াতের 'নাসর' শব্দ দ্বারাই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ রাসূল (সা.)-এর বিদায় হাজ্জের সময় আইয়্যামে তাশরীকের (যিলহাজ্জ মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখের) কোন এক দিন এ সূরাটি নাযিল হয়। বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা নাসর নাযিলের তিন মাস কয়েকদিন পর রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন। বিদায় হাজ্জ ও রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের মধ্যবর্তী সময়ও তিন মাসের কিছু বেশী। এভাবে এ কথা নিশ্চিত মনে হয় যে, সূরাটি বিদায় হাজ্জেরই কোন এক সময় নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আরবে যখন ইসলামের বিজয় পরিপূর্ণ হবে এবং যখন দলে দলে লোক ইসলাম কবুল করতে থাকবে, তখন মনে হবে যে, ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করা হয়েছে, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দায়িত্ব পালন শেষে যেন তিনি সেই আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ করতে থাকেন, যাঁর মেহেরবানী ও সাহায্যে এতো বিরাট দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ পাক আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে আল্লাহর দেয়া এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ হিসাবে ছোটখাট কোন ভুল হয়ে থাকলে, সে জন্য তিনি যেন আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে থাকেন।

সর্বশেষ পূর্ণ সূরা ঃ পূর্ণ সূরা হিসাবে এ সূরাটি সবশেষে নাযিল হয়। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, কোন্ আয়াতটি সবশেষে নাযিল হয়েছে বা শেষ ওহী কোন্‌টি। কিন্তু সূরা হিসাবে এ সূরাটিই নাযিলকৃত শেষ সূরা। যেমন সূরা ফাতিহার পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক বার ওহী নাযিল হলেও পরিপূর্ণ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহাই পয়লা নাযিল হয়।

ইসলামের বিজয় উৎসবের ধরন ঃ রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে মাত্র ২৩ বছরে আরবে যে মহাবিপ্লব বিজয় লাভ করল, তা চিরকালই ইতিহাসের মহাবিস্ময় হয়ে থাকবে। একটা বিচ্ছিন্ন ও অসভ্য মানব গোষ্ঠীকে মানব জাতির জন্য চির আদর্শে পরিণত করার এতোবড় গৌরব যে মহামানবের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে, তাঁকে সূরাটিতে তাঁর সাফল্যের বিজয়োৎসব পালনের অপূর্ব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

সাধারণত কোন বিপ্লবী নেতা সফলতা লাভ করার পর আনন্দ-উৎসবে মেতে নিজের বাহাদুরীর ঢোল সারা দুনিয়াকে শুনিয়ে বাজাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর রাসূল (সা.)-কে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে সাফল্যের জয়গান শেখালেন। এ শিক্ষাই দেয়া হলো যে, ইকামাতে-দীনের এ বিরাট সাফল্য কোন মানুষের বাহাদুরীর ফল নয়। এ সাফল্য মহান আল্লাহর দান। তাই তাঁর গুণগান করেই বিজয় উৎসব পালন করতে হবে। আর এ কাজে মানবিক দুর্বলতার দরুন যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা করার মাধ্যমে মনে সান্ত্বনা পেতে হবে।

www.bjilibrary.com

রাসূল (সা.)-এর জীবনে এ সূরার প্রভাব ঃ

(১) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন এ সূরা নাযিল হয়, তখন রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

(২) হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বলেন যে, যখন এ সূরা নাযিল হয়, তখন রাসূল (সা.) বললেন, এ বছরই আমার ইন্তেকাল হবে।' একথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'আমার বংশের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম এসে আমার সাথে মিলিত হবে।' একথা শুনে তিনি [ফাতিমা (রা.)] হাসলেন।

(৩) হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'রাসূল (সা.) ইন্তিকালের আগে 'সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা' বেশী বেশী পড়তেন।' এ কথাগুলো অন্য রিওয়ায়াতে এভাবে বলা হয়েছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।'

(৪) হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সব অবস্থায় উঠতে-বসতে, আসতে-যেতে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পড়তে থাকতেন। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'এ যিকিরটি আপনি এত বেশী কেন করেন ? জওয়াবে তিনি বললেন, 'আমাকে এর হুকুম করা হয়েছে।' এ কথা বলেই তিনি এ সূরাটি পড়ে শুনালেন।

(৫) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এ সূরা নাযিল হবার পর রাসূল (সা.) আখিরাতের জন্য এতো বেশী পরিশ্রম করতে লাগলেন, যা ইতঃপূর্বে কখনও দেখা যায় নি।

বিশেষ শিক্ষা

কোন মহৎ ও বড় কাজ সমাধা করাই আসল সাফল্য নয়। সে কাজ যদি আল্লাহ পাক কবুল না করেন, তাহলে বড় কাজ সত্ত্বেও জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যত যত্নের সাথেই কোন কাজ করুক, তাতে ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে আল্লাহর দৃষ্টিতে ও তাঁর উন্নত মানে বিচার করলে পদে পদেই দোষ বের হবে। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ মানুষের সাধনার সুফল দিতে চান। তাই মানুষকে এ সূরার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যেন নিজের যোগ্যতা নিয়ে গর্ববোধ না করে এবং কোন বড় কাজ সমাধা করতে পারায় গৌরবের দাবীদার না হয়।

অন্য মানুষ তার কাজের যত প্রশংসা করুক সে নিজে যেন এ কথাই মনে করে যে, তার কাজ যতটা নিখুঁত হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয় নি। তার এ ধারণা থাকাই উচিত যে, এ কাজে যে পরিমাণ সাফল্য হয়েছে, তা আল্লাহর মেহেরবানী। আর যেটুকু ত্রুটি রয়ে গেছে, তা তারই দোষে। এ মনোভাব যার আছে, সে কোন বিরাট খিদমাত আন্‌জাম দেবার পরও অহংকার প্রকাশ করবে না। বরং সে বিনয়ের সাথে ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং দোষ-ত্রুটি মাফ করে এ খিদমাতটুকু কবুল করার জন্য মনিবের দুয়ারে ধরণা দিতে থাকবে।

www.bjilibrary.com

সূরা আন-নাসর

سورة النصر

সূরা ঃ ১১০ | মাদানী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৩ | মোট রুকূ ঃ ১

مكية | رقمها : ١١٠

اياتها : ٣ | ركوعها : ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. যখন[১] আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায়,

١- اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ

২. এবং (হে রাসূল) আপনি দেখতে পান যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে,

٢- وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ
اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ

৩. তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করুন ও তাঁর কাছে মাফ চান,[২] নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

٣- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط
اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۠

১. নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাই সব শেষে রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালের প্রায় তিন মাস আগে নাযিল হয়েছে। এ সূরার পর আরও কতক আয়াত নাযিল হয়েছে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ কোন সূরা আর নাযিল হয় নি।

২. এটাও বর্ণিত আছে যে, এ সূরা নাযিল হবার পর রাসূল (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে অনেক বেশী হামদ, তাসবীহ ও ইস্তিগফার করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-লাহাব

নাম ঃ পয়লা আয়াতের 'লাহাব' শব্দ দ্বারাই এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ সবার মতেই এ সূরাটি মাক্কী যুগের। কিন্তু মাক্কী যুগের কোন্ স্তরে এ সূরা নাযিল হয়, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। অবশ্য সূরার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, যখন রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা আবূ লাহাবের বিরোধিতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছল যে, ইসলামী আন্দোলনের পথে সে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হয়। সম্ভবত নবুওয়াতের সপ্তম বছর থেকে দুশমনরা যখন রাসূল (সা.)-এর চাচা আবূ তালিবসহ নবীর গোটা বংশকে 'শি'আবে আবূ তালিব' নামক উপত্যকায় বন্দী করে রাখে, তখন একমাত্র আবূ লাহাব ছাড়া রাসূল (সা.)-এর সব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই বংশীয় সম্পর্কের খাতিরে রাসূল (সা.)-কে সমর্থন করে। এর ফলে তারা সবাই রাসূল (সা.)-এর সাথে বন্দীদশায় জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এ কঠিন সময়েও আবূ লাহাব বংশের সবার বিরুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর দুশমনদের সাথে মিলে শত্রুতা করতে থাকে।

এ সূরাটি নাযিলের সময়ের সাথে উপরের ঘটনার সম্পর্ক আছে বলেই ধারণা হয়। কারণ কুরআন মজীদে স্পষ্ট নাম উল্লেখ করে আর কোন লোককে নিন্দা করা হয়নি। আবূ লাহাবকে এ সূরায় যে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, তা রাসূল (সা.)-এর মুখে আপন চাচার বিরুদ্ধে উচ্চারণ করা সাধারণ অবস্থায় ভদ্রতার খুবই বিরোধী। বিশেষ করে সেকালে আরবে বংশীয় সম্পর্কের যে রেওয়াজ ছিল, তাতে এ ধরনের নিন্দাবাদ নিতান্ত আপত্তিকর মনে হওয়ারই কথা। রাসূল (সা.) সমাজে অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এ নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কেউ করে নি। সমাজ বরং আবূ লাহাবের আচরণকেই চরম রীতি বিরোধী মনে করেছে। গোটা বংশের বিরুদ্ধে এক আবূ লাহাব যে ব্যবহার করেছে, তাতে সে সময়কার রেওয়াজ অনুযায়ী সে চরম নিন্দার যোগ্য ছিল বলেই কেউ এতে আপত্তি তোলে নি। আবূ লাহাবের এ আরচণ ঐ সময় যতোটা নিন্দনীয় বলে সমাজে স্বীকৃত ছিল, এতোটা শুধু তার ইসলাম বিরোধিতার কারণে হয় নি। তাই এ সূরাটি ঐ সময়কার বলেই মনে হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ কুরআন মজীদে ইসলামের দুশমনদের মধ্যে একমাত্র আবূ লাহাবের নাম নিয়ে কেন নিন্দাবাদ করা হলো- এ কথা ভালভাবে বুঝতে হলে আরব সমাজকে বুঝতে হবে এবং আবূ লাহাবের ভূমিকা জানতে হবে।

প্রাচীনকাল থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এমন মারামারি, কাটাকাটি, লুটতরাযজ চালু ছিল যে, আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে বংশীয় ও গোত্রীয় ঐক্য ছাড়া বাঁচবার কোন পথই ছিল না। আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের গুরুত্ব সেখানে সবচেয়ে বেশী ছিল। তাই এক বংশের কোন লোকের সাথে অন্য বংশের কোন লোকের ব্যক্তিগত ঝগড়াও সহজেই বংশীয় লড়াইয়ে পরিণত হতো।

www.bjilibrary.com

এ সামাজিক প্রথার কারণেই কুরাইশদের অন্যান্য সব গোত্র এক জোট হয়ে রাসূল (সা.)-এর দুশমন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব প্রকাশ্যভাবে রাসূল (সা.)-কে সমর্থন করতে থাকল। অথচ তাদের অধিকাংশ লোক তখনও ঈমান আনে নি। ধর্মের দিক দিয়ে রাসূল (সা.)-এর বিরোধী কুরাইশদের সাথে তাদের মিল থাকলেও গোত্রীয় কারণেই তারা রাসূল (সা.)-কে তার দুশমনদের হাতে ছেড়ে দিতে রাযী ছিল না।

বংশীয় ও গোত্রীয় ঐক্যের প্রচলিত এ রীতি আরবে এতটা স্বীকৃত সামাজিক নীতি হিসাবে গণ্য ছিল যে, কুরাইশরা বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবকে রাসূল (সা.)-এর সমর্থন করার দরুন কখনও এ অভিযোগ করে নি যে, তোমরা বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধী লোকের সমর্থন করে ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছ। কারণ, ঐ সমাজে বংশের মর্যাদা ধর্মের চেয়েও বেশী ছিল। এমনি এক সমাজে আবূ লাহাবই একমাত্র লোক ছিল যে, এ প্রচলিত ও সর্বজনস্বীকৃত রীতির বিরুদ্ধে তারই আপন ভাতিজার দুশমনদের সাথে মিলে নিজ বংশের বিরোধী বলে পরিচিত হয়ে গেল। যে সমাজে ভাতিজাকে আপন ছেলের মতো স্নেহ করা এবং জান দিয়ে হলেও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার নীতি চালু ছিল, সে সমাজে আবূ লাহাবের এ আচরণ চরম নিন্দারই যোগ্য ছিল তাই তার নাম নিয়ে এ নিন্দাবাদ করা সত্ত্বেও কেউ এ কারণে রাসূল (সা.)-এর উপর দোষারোপ করে নি এবং আপন চাচার বিরুদ্ধে এ সূরার কঠোর ভাষা প্রয়োগ করাকে নিন্দনীয় মনে করে নি।

আবূ লাহাবের দুশমনীর ধরন ঃ

(১) নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে যখন রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম সাফা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মাক্কাবাসীদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিলেন, তখন আবূ লাহাব চিৎকার করে বলে উঠলো, 'তাব্বান লাকা'-'তুমি ধ্বংস হও'। এ সূরাতে এ শব্দটিই আবূ লাহাবের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

(২) একদিন আবূ লাহাব রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দ্বীন কবুল করলে আমার কী লাভ হবে?' রাসূল (সা.) বললেন, "আর সব ঈমানদারদের যা হবে তাই।" আবূ লাহাব ঐ 'তাব্বান' শব্দ ব্যবহার করেই বলল, 'ঐ দ্বীন ধ্বংস হোক, যা আমাকে সাধারণ লোকের সমান বানাতে চায়।'

(৩) আবূ লাহাবের বাড়ী ও রাসূল (সা.)-এর বাড়ী পাশাপাশি ছিল। সে ও তার স্ত্রী হরহামেশা রাসূল (সা.)-কে বিরক্ত করতো। রাসূল (সা.) যখন নামায আদায় করতেন, তখন ছাগলের ভুঁড়ি উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলতো। কখনো রাসূল (সা.)-এর বাড়ীতে খাবার পাক হবার সময় মলমূত্র ছড়িয়ে দিতো। আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) রোজ কাঁটাওয়ালা গাছ-গাছড়া রাতের বেলা ঘরের দরজার সামনে জমা করে রাখতো, যাতে সকালে বের হলেই রাসূল (সা.)-এর পায়ে বিঁধে।

(৪) নবুওয়াতের পূর্বে আবূ লাহাবের দু'ছেলের সাথে রাসূল (সা.)-এর দু'মেয়ের বিয়ে হয়। ইসলামের দাওয়াত ব্যাপক হতে দেখে আবূ লাহাব রাসূল (সা.)-এর মেয়েদেরকে তালাক দিতে বাধ্য করল।

www.bjilibrary.com

(৫) যখন রাসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় ছেলেও ইন্তিকাল করলেন, তখন আবূ লাহাব খুশী হয়ে দৌড়ে যেয়ে কুরাইশ সরদারদেরকে 'সুসংবাদ' দিল। রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতায় সে এমন অন্ধ ছিল যে, এ জাতীয় হীন কাজ করতেও লজ্জাবোধ করে নি।

(৬) রাসূল (সা.) যখনই যেখানে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন, সাথে সাথেই আবূ লাহাব যেয়ে লোকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো। কখনো নিজেই পাথর মেরে রাসূল (সা.)-কে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতো।

(৭) নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত গোত্র মিলে যখন বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবকে 'শি'আবে আবূ তালিবে' বন্দী করে তাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করল, তখন একমাত্র আবূ লাহাবই তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিজ বংশের বিরুদ্ধে কুরাইশদের দলে যেয়ে শামিল হলো। এ অবরোধ দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত চলেছিলো। রাসূল (সা.) এবং বংশের লোকেরা যাতে খাবার জিনিস, এমনকি পানিও না পায়, সে ব্যবস্থাই তারা করলো। জেলের বন্দীদের চেয়েও দুরবস্থায় পড়ে, ক্ষুধা, তৃষ্ণায় যাতে বাধ্য হয়ে তারা কুরাইশদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে চেষ্টাই চললো। এমন অমানুষিক কাজেও আবূ লাহাব অগ্রগামী ছিল।

(৮) হাজ্জের সময় আগত দূরবর্তী লোকদের কাছে রাসূল (সা.)-এর পক্ষে দ্বীনের দাওয়াত দেবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল আবূ লাহাব। রাসূল (সা.)-এর আপন চাচা হিসাবে সে যখন দূর থেকে আগত লোকদের কাছে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচার চালাতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ বিভ্রান্ত হতো। তারা রাসূল (সা.)-কে ঘনিষ্ঠভাবে না চেনার ফলে তাঁর চাচার বিরোধিতায় কমপক্ষে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সহজ ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে আবূ লাহাবই এমন এক ব্যক্তি ছিল, যার নাম নিয়ে নিন্দা করা দরকার ছিল। কিয়ামাত পর্যন্ত যে কিতাব মানুষ পড়তে থাকবে, সে কিতাবে তার নামে লা'নত বর্ষণ করাই তার উপযুক্ত পুরস্কার। আখিরাতে তার ও তার স্ত্রীর যে দশা হবে, সে বিষয়ে সূরার শেষ তিন আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আর সূরার প্রথম আয়াতের মাধ্যমে তাদের জন্য চিরকাল মানব জাতির অভিশাপ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সূরার মারফতে রাসূল (সা.)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আত্মীয়ের কোন পরওয়া করার দরকার নেই। আপন বংশের লোক হলেও যদি সে দ্বীনের বিরোধী হয়, তাহলে তাকে আপন মনে করা চলবে না। আর যারা দ্বীনের সাথী, তারা দুশমনের বংশের লোক হলেও তাদেরকেই প্রকৃত পক্ষে মানুষ মনে করতে হবে। এটাই দ্বীনের দাবী।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-লাহাব

سورة اللهب

সূরা ঃ ১১১ — মাক্কী যুগে নাযিল

মোট আয়াত ঃ ৫ — মোট রুকূ ঃ ১

رقمها :١١١ — مكية

ركوعها : ١ — اياتها : ٥

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

১. আবূ লাহাবের[১] দু'হাত ধ্বংস হলো এবং সেও ধ্বংস হয়ে গেলো (বিফল হয়ে গেলো)।[২]

২. তার মাল ও যা সে কামাই করেছে, তা তার কোন কাজে লাগলো না।

৩-৪. শিগগিরই সে শিখাযুক্ত আগুনে প্রবেশ করবে এবং (তার সাথে) তার ঐ স্ত্রীও[৩] (আগুনে প্রবেশ করবে), যে কুটনামী করে বেড়ায়।❖

৫. তার ঘাড়ে খেজুর শাখার আঁশের পাকানো (খসখসে) দড়ি থাকবে।※

١- تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

٢- مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

٣- سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

٤- وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

٥- فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

১। এ লোকটি রাসূল (সা.)-এর চাচা ছিল এবং আবূ লাহাব নামেই পরিচিত ছিল। (লাহাব মানে আগুনের শিখা। তার গায়ের রং আগুনের মতো উজ্জ্বল বলে তাকে এ নামে ডাকা হতো। সে শেষ পর্যন্ত দোযখের আগুনে জ্বলবে বলেও আবূ লাহাব নামই বেশী উপযোগী)

২। মানে, ইসলামের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য আবূ লাহাব যত শক্তিই খরচ করে থাকুক, শেষ পর্যন্ত সে বিফল ও ব্যর্থই হয়েছে।

৩। এ মহিলার নাম ছিল উম্মে জামীল এবং সে আবূ সুফিয়ানের বোন ছিল। সে ইসলামের দুশমনীর ব্যাপারে তার স্বামী থেকে কোন অংশেই কম ছিল না।

❖ 'হাম্মা লাতাল হাতাব' এর শাব্দিক অর্থ-সে কাঠ বয়ে আনে। 'কাঠ বয়ে আনা' কথাটির কয়েকটা অর্থ হতে পারে ঃ

ক. উম্মে জামীল জংগল থেকে কাঁটাওয়ালা ডালপালা জোগাড় করে রাসূল (সা.)-এর ঘরের সামনে রাখতো, যাতে রাসূল (সা.)-এর পায়ে বিঁধে।

খ. সে রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে বেড়াতো, যার ফলে তার পাপের বোঝা বেড়ে যাচ্ছিল। আরবি পরিভাষার পাপের বোঝা অর্থেও কাঠের বোঝা বলা হয়।

※ 'জীদ' অর্থ অলংকারে সজ্জিত গলা। উম্মে জামীল খুব মূল্যবান হার গলায় পরতো। এখানে বলা হয়েছে যে, সেই সজ্জিত গলায় দোযখের কষ্টদায়ক শিকল বাঁধা থাকবে।

সূরা আল-ইখলাস

নাম ঃ কুরআন শরীফের সূরাগুলোর নাম যে নিয়মে রাখা হয়েছে, সে নিয়মে এ সূরার নামকরণ করা হয় নি। সাধারণত একটি সূরার কোন একটি শব্দ থেকেই ঐ সূরার নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু এ সূরায় সে নিয়ম পালন করা হয় নি। 'ইখলাস' শব্দটি এ সূরায় নেই। সূরা ফাতিহার মধ্যেও 'ফাতিহা' শব্দ নেই। এ দুটি সূরার নামকরণই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

এ সূরাটির নাম অত্যন্ত সার্থক। 'ইখলাস' মানে আন্তরিকতা। খালিস বা খালাস শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। খালিস মানে বিশুদ্ধ এবং খালাস মানে মুক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যে পরিচয় এ সূরায় দেয়া হয়েছে, তাওহীদ সম্পর্কে এটাই একমাত্র বিশুদ্ধ ধারণা এবং যারা এভাবে আল্লাহকে চিনে নেবে, তারাই শিরকের ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবে এবং এর ফলে দোযখ থেকেও মুক্তি পাবে। তাওহীদ সম্পর্কে প্রকৃত আন্তরিকতা সৃষ্টি করাই এ সূরার উদ্দেশ্য। তাই এর নামই রাখা হয়েছে ইখলাস বা আন্তরিকতা।

নাযিলের সময় ঃ বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াতের কারণে এ সূরাটি মাক্কী, না মাদানী সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে বটে, কিন্তু সূরার ভাষা ও বাচনভঙ্গি মাক্কী যুগের পয়লা দিকের সূরার মতোই মনে হয়। আর যেহেতু তাওহীদই দ্বীন-ইসলামের পয়লা ভিত্তি, সেহেতু নবুওয়াতের প্রথম দিকেই এ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া স্বাভাবিক। ছোট ছোট আয়াতে দ্বীনের বুনিয়াদী কথা মুখস্থ রাখার উপযোগী করে বলার যে বৈশিষ্ট্য মাক্কী যুগের পয়লা দিকের সূরায় দেখা যায়, এ সূরাটিতেও সে বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। আরও একটা বিখ্যাত ঘটনা থেকে সূরাটি মাক্কী বলে প্রমাণ পাওয়া যায়– হযরত বিলাল (রা.) উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলামের তাওহীদী শিক্ষা ত্যাগ করে মুশরিকী আকীদায় ফিরিয়ে নেবার জন্য উমাইয়া যখন হযরত বিলাল (রা.)-কে আগুন-ঝরা রোদের সময় ভয়ানক গরম বালুর উপর শোয়ায়ে বুকের উপর বিরাট এক পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল, তখন তিনি 'আহাদ আহাদ' শব্দ দিয়ে একদিকে তাওহীদের কথা ঘোষণা করছিলেন, অপরদিকে এ মহাবিপদে 'আহাদ' শব্দেই আল্লাহকে কাতরভাবে ডাকছিলেন। এ ঘটনা মাক্কী যুগের এবং এ শব্দটি এ সূরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। তাই সূরাটি নিঃসন্দেহে মাক্কী।

আলোচ্য বিষয় ঃ তাওহীদই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। মানুষ আল্লাহকে যে নামেই ডাকুক, সবকিছুর উপর যে একজন মহাশক্তিমান সত্তা আছেন, তা মানব জাতি কোন কালেই অস্বীকার করতে পারে নি। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে মানুষ অগণিত দেব-দেবী ও বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ মনে করে এ সবকে আল্লাহর সাথে শরীক বলে ধরে নিয়েছে। অগ্নিপূজা ও সূর্যপূজা থেকে আরম্ভ করে লিঙ্গপূজা পর্যন্ত অসংখ্য শিরকী আকীদা দুনিয়ায় আজও আছে, যেমন সেকালে ছিল। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা এক আল্লায় বিশ্বাসী বলে দাবী করলেও তারা আল্লাহর নবীদেরকে পর্যন্ত আল্লাহর সন্তান বানিয়ে পূজা করার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহর কিতাবকে মানার দাবীদার হয়েও তারা তাওহীদের বিশুদ্ধ শিক্ষা হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় রাসূল (সা.) যখন হাজারো রকমের শিরকে লিপ্ত মানুষকে খালিস তাওহীদের দাওয়াত

www.bjilibrary.com

দিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবে গোটা সমাজই এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল। সবার একই প্রশ্ন, 'বাপ-দাদার কাল থেকে যাদের পূজা করে এসেছি তা সবই মিথ্যা ? তাহলে মুহাম্মদ (সা.) যাকে একমাত্র মাবুদ মানার দাওয়াত দিচ্ছে, সে সত্তার সঠিক পরিচয় কী ? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক বিচিত্র ধরনের ভাষায় রাসূল (সা.)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। এমনকি অভদ্র, বিদ্রূপজনক ও হাস্যকর প্রশ্ন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এ সূরাতে অতি সংক্ষেপে স্পষ্ট ভাষায় ঐসব প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন।

ফযীলত ও গুরুত্ব ঃ রাসূল (সা.) থেকে এ সূরা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ দ্বারা এ সূরাটির বিরাট মর্যাদা, ফযীলত ও গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝা যায়। এ সূরাটি যেন বেশী বেশী পড়া হয়, সে বিষয়েও যথেষ্ট তাকিদ দেয়া হয়েছে। কারণ, ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো তাওহীদ। আর এ সূরাতে অতি সংক্ষেপে তাওহীদের মূল কথাকে এমন কয়েকটি ছোট ছোট আয়াতে শেখানো হয়েছে, যা সহজেই মুখস্থ হবার যোগ্য এবং যা বুঝতেও সহজ।

এ সূরার ফযীলত সম্পর্কে সবচেয়ে বিখ্যাত হাদীস হলো এই যে, রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় বলেছেন, 'এ সূরাটি কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।' হাদীসের ব্যাখ্যাদাতাগণ (মুহাদদিসীন) এ কথার অনেক রকম অর্থ করেছেন। একটি অর্থই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। সে অর্থ অনুযায়ী তিনবার এ সূরাটি পড়লে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ একবার পড়ার সওয়াব হয়। অবশ্য রাসূল (সা.) নিজে এ ধরনের কোন কথা বলেন নি। সওয়াব দেবার ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। এ ব্যাখ্যা আল্লাহ ঠিক মনে করলে অবশ্যই সওয়াব দেবেন।

যারা এ সূরার মূল আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভিত্তিতে ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা করেন, তাদের মতে হাদীসটিতে এ সূরার বিরাট গুরুত্বই বুঝান হয়েছে। ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা তিনটি- তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। ঈমানের জন্য যতগুলো বিষয়ে বিশ্বাস করা জরুরী, তার মধ্যে এ তিনটিই আসল ও প্রধান। গোটা কুরআনের বুনিয়াদী শিক্ষাই এ তিনটি। তাই তাওহীদের শিক্ষা কুরআনের বুনিয়াদী তিনটি শিক্ষার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। সে হিসাবে তাওহীদের শিক্ষাই কুরআনের মূল শিক্ষার তিন ভাগের এক ভাগ। আর সূরা ইখলাসে ঐ তাওহীদের শিক্ষাই সুস্পষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। তাই গুরুত্বের দিক দিয়ে এ সূরাটি কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ।

রাসূল (সা.)-এর সময় বেশ কয়েকজন সাহাবী এ সূরাটি নামাযে খুব বেশী পড়তেন। এমনকি ইমামতী করতে গিয়ে কোন এক সাহাবী প্রত্যেক রাকআতে এ সূরা পড়ার পর অন্য সূরা পড়তেন। এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস সম্পর্কে অনেকেই রাসূল (সা.)-এর মতামত জানতে চান। যাদের সম্পর্কে এ বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়, তাদেরকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এ সূরাকে নামাযে এতো বেশী বেশী কেন পড় ?' তারা সবাই একই ধরনের জওয়াব দিলেন যে, 'এ সূরাকে আমি খুব মহব্বত করি। কারণ, এতে রহমানের গুণাবলী বয়ান করা হয়েছে।' রাসূল (সা.) এ কথা শুনে বললেন, 'এ সূরার মহব্বত তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিল।' আর একজন সম্পর্কে তিনি বললেন, 'তাকে খবর দিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে মহব্বত করেন।'

www.bjilibrary.com

# সূরা আল-ইখলাস	# سـورة الاخلاص
সূরা ঃ ১১২ মাক্কী যুগে নাযিল	مكية رقمها : ١١٢
মোট আয়াত ঃ ৪ মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٤ ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم

১. (হে রাসূল) আপনি বলে দিন[১] তিনিই আল্লাহ,[২] (যিনি) একক (অদ্বিতীয়)[৩]

٭١- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ

২. আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)।

٢- اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

৩. তাঁর কোন সন্তান নেই; তিনিও কারো সন্তান নন।❖

٣- لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

৪. কেউ তার সাথে তুলনার যোগ্য নয়।

٤- وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

১। কাফির ও মুশরিকরা রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করতো যে, সব মাবুদকে বাদ দিয়ে আপনার যে রবকে একমাত্র মাবুদ মানাবার জন্য চেষ্টা করছেন, তিনি কেমন? তাঁর বংশ পরিচয় কী? কী দিয়ে তিনি তৈরী? এ দুনিয়া তিনি কার কাছ থেকে ওয়ারিস হিসাবে পেয়েছেন? আর কে-ই বা তাঁর ওয়ারিস হবে? এ প্রশ্নের জওয়াবেই এ সূরা নাযিল হয়।

২। অর্থাৎ যাকে তোমরাও আল্লাহ নামেই জান, যাকে গোটা সৃষ্টির স্রষ্টা ও রিযিকদাতা বলে মান, তিনিই আমার রব।

৩। 'ওয়াহিদ' শব্দ ব্যবহার না করে 'আহাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ওয়াহিদ' মানে 'এক' আর 'আহাদ' মানে 'অদ্বিতীয়'-যার মতো আর কেউ নেই। একজন মানুষ বা একটি দেশ বললে বুঝা যায় যে, অনেক মানুষ বা দেশ আছে, যার একটির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ অদ্বিতীয় বললে বুঝা যায়, তিনি সকল দিক দিয়েই একক, যার সাথে তুলনা করার কেউ নেই বা এ জাতীয় সত্তা আর একটিও নেই। তাই আরবি ভাষায় 'আহাদ' শব্দটি শুধু আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা হয়।

❖ অর্থাৎ তিনি কাকেও জন্ম দেন নি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয় নি।

সূরা আল-ফালাক
সূরা আন-নাস

নাম ঃ এ দুটি সূরা আলাদা দু'নামে পরিচিত হলেও বিভিন্ন কারণে সূরা দুটির পরিচিতি একই সাথে দেয়া হচ্ছে। সূরা দুটির মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আলোচ্য বিষয়েও সূরা দুটোর মধ্যে এত মিল রয়েছে যে, দুটোকে মিলিয়ে 'মুত্তয়্যি ফাতাইন' (আশ্রয় চাওয়ার দুটো সূরা) নাম দেয়া হয়েছে। আলাদাভাবে সূরা দুটোর পয়লা আয়াত থেকে 'ফালাক' ও 'নাস' শব্দ দ্বারা এদের নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময় ঃ বিভিন্ন রকম রেওয়ায়াতের দরুন এ দুটো সূরা মাক্কী, না মাদানী, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু সূরা দুটোর ভাব ও ভাষা এবং বাচনভঙ্গি মাক্কী যুগের সূরার অনুরূপ।

মাদীনায় ইয়াহুদীরা রাসূল (সা.) এর উপর যে যাদু করেছিল, সে যাদু এ দুটো সূরার মাধ্যমে খতম করা হয়েছিল বলেই এ সূরা দুটোকে মাদানী মনে করা জরুরী নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় একই সূরা নতুন করে পেশ করা হয়েছে বলে জানা যায়। তাই এ সূরা দুটি মাক্কী যুগে নাযিল হয়েছে বটে, কিন্তু হিজরাতের পর মাদীনায় ইয়াহুদীদের যাদুক্রিয়া বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে জিবরাঈল (আ.) এ দুটো সূরা পড়ার জন্য রাসূল (সা.)-কে উপদেশ দেন। সূরা দুটি একই সাথে নাযিল হয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ মাক্কী যুগে যখন এ দুটো সূরা নাযিল হয়, তখন কুরাইশদের বিরোধিতা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যে, রাসূল (সা.)-এর ইসলামী আন্দোলন যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার কাজ করেছে। এক সময় বিরোধীরা ধারণা করেছিল যে, কোন না কোনভাবে রাসূল (সা.)-কে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু তারা যখন এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল, তখন দুশমনী চরম আকার ধারণ করল।

বিশেষ করে যেসব পরিবারে কোন পুরুষ বা নারী, যুবক বা যুবতী ইসলাম কবুল করার দরুন পরিবারের অন্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলছিল, কুরাইশদের নেতৃত্বে তাদের দুশমনী আরও বেড়ে গেল। ঘরে ঘরে গভীর রাতে সলা-পরামর্শ চলতে লাগলো। রাসূল (সা.)-কে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চললো। নানারকম যাদু-টোনা করা হলো, যাতে রাসূল (সা.) অসুস্থ হন বা পাগল হয়ে যান। মানুষ ও জিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শয়তান প্রকৃতির সবাই জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে হাজারো রকমের অপপ্রচার চালাতে লাগলো। তারা জনগণের মনে এমন সব সন্দেহ ও খারাপ ধারণার সৃষ্টি করতে থাকলো, যাতে তারা রাসূল (সা.) থেকে দূরে সরে থাকে।

আবূ জাহেল ও অন্যান্য কুরাইশ নেতাদের মনে হিংসার আগুন জ্বলছিল। কারণ, রাসূল (সা.) কুরাইশ বংশের বনী আবদে মানাফের শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর আবূ জাহেল ও অন্যান্য

www.bjilibrary.com

নেতারা দুনিয়ার সব ব্যাপারেই ঐ শাখার সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। সব পার্থিব বিষয়েই প্রতিযোগিতা সম্ভব ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের বেলায় আবূ জাহেলরা অসহায় বোধ করে চরম হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলো।

আলোচ্য বিষয় ঃ এমনি পরিবেশে আল্লাহ পাক এ দুটো সূরার মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে উপদেশ দিলেন যে, আপনি কোন অবস্থায়ই পেরেশান হবেন না। আপনি আপনার রবের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুন ও নিরাপত্তা বোধ করুন। বিরোধিতার এ তুফান দেখে আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আপনি নিজেকে অসহায় ও নিরাশ্রয় মনে করবেন না। আপনার রবই আপনার সহায়ক। তার নিকট আশ্রয় চান।

এ দুটো সূরার মাধ্যমে রাসূল (সা.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, দুশমনদের সামনে ঘোষণা করে দিন যে, আপনি কোন মহাশক্তির আশ্রয়ে আছেন এবং সে কারণেই তাদের বিরোধিতার কোন পরওয়া করেন না।

আলোচনার ধারা ঃ সূরা ফালাকের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি এভবে ঘোষণা করুন ঃ

'হে আমার দুশমনের দল, তোমরা আমাকে অসহায় ও দুর্বল মনে করছ ? আমার উপর দুশমনীর কালোরাত চাপিয়ে দিয়ে তোমরা ভাবছ যে, এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায়ই আমার নেই ? তোমরা জেনে রাখ যে, তিনিই আমার রব, যিনি অন্ধকার রাত সরিয়ে দিয়ে আলোময় সকাল এনে দেন। তোমরা রাতের বেলায় গোপন পরামর্শ করে যাদুর সাহায্যে এবং হিংসার বশবর্তী হয়ে যত রকমেই আমার ক্ষতি করার চেষ্টা কর না কেন, আমার রব আমার আন্দোলনের পথে তোমাদের সৃষ্ট এসব দুশমনীর অন্ধকার দূর করে আমার জন্য একদিন সফলতার সকাল অবশ্যই এনে দেবেন, যেমন তিনি রাতের পর দিন এনে থাকেন। আমি ঐ মহাশক্তিমান রবের কোলে আশ্রয় নিয়েছি। তোমাদের যাবতীয় গোপন ষড়যন্ত্র, যাদু ও হিংসার অনিষ্ট আমার নাগালই পাবে না।'

সূরা নাসের মারফতে রাসূল (সা.)-কে শিখিয়ে দিলেন যে, আপনি এভাবে ঘোষণা করুন ঃ

'হে আমার বিরোধীরা, তোমরা কি জান যে, আমি কার কোলে আশ্রয় নিয়েছি ? যিনি গোটা মানব জাতির মুনীব, যিনি সকল মানুষের উপর ক্ষমতাসীন বাদশাহ এবং যিনি সব মানুষের ইলাহ হিসাবে স্বীকৃত, তাঁরই নিরাপদ আশ্রয়ে আমি আছি। তাই জিন ও ইনসানের মধ্যে যতরকম শয়তানী খাসলাতের লোক আছে, তারা আমার আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনগণের মনে যত ভুল ধারণারই সৃষ্টি করুক এর ক্ষতি থেকে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।

আল্লাহর নিকট রাসূলগণের আশ্রয় চাওয়ার ধরন ঃ আল্লাহ পাক যাদের উপর রাসূলের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাদের কাছে সবচেয়ে মযবুত আশ্রয়ই হলো আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। তারা দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় করেন না। এক আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় ছাড়া আর কারো পরওয়া তারা করেন না। তারা জানেন যে, আল্লাহপাকই তাদেরকে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তিনিই সকল অবস্থায় তাদের সহায়ক। তাই বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত

www.bjilibrary.com

হুমকিই আসুক, তারা এতে কখনও ভীত হন না। অতি কঠিন অবস্থায়ও আল্লাহর আশ্রয়ে আছেন বলে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকেন। ধীরস্থির মনে তারা দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রতিকূল পরিবেশেও তারা পেরেশান হয়ে পড়েন না।

রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের চরম দুশমনীর অবস্থায় আল্লাহ পাক এ দুটো সূরার মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে ঐ মহা অস্ত্রই দান করলেন, যার চেয়ে কার্যকর আর কোন অস্ত্র হতে পারে না। সত্যিকারভাবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করার মধ্যে যে পরম নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়, তা আর কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। যদি মনের মধ্যে এ নিরাপত্তাবোধ আছে বলে টের পাওয়া না যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহর কাছে সঠিকভাবে আশ্রয় চাওয়াই হয় নি। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর পূর্ণ ইয়াকীনের সাথে নির্ভর হতে হবে।

আল্লাহর রাসূলগণের জীবনে এ জাতীয় সত্যিকারের আশ্রয় চাওয়ার উদাহরণ গোটা কুরআন পাকে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি নমুনার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে ঃ

(১) রাসূল (সা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে মাদীনায় হিজরত করার পথে মাক্কা থেকে একটু দূরে এক পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নেন। দুশমনের দল রাসূল (সা.)-কে কতল করার জন্য তালাশে বের হলো। একদল ঐ গর্তের মুখে পৌঁছে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে গেলেন নিজের প্রাণের ভয়ে নয়, রাসূল (সা.)-এর নিরাপত্তার চিন্তায়। কিন্তু রাসূল (সা.) একটুও পেরেশান হলেন না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে অভয় দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

(২) উহুদের যুদ্ধে একদল সাহাবার ভুলের কারণে যখন মুসলিম বাহিনীর প্রাথমিক পরাজয় হলো, তখন রাসূল (সা.) পর্যন্ত আহত হলেন। দুশমনরা তখন প্রচার করে দিলো যে, রাসূল (সা.) নিহত হয়ে গেছেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় মুসলিমদের মধ্যে যখন দিশেহারা অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন আহত অবস্থায়ও রাসূল (সা.) মুজাহিদদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। সূরা আলে ইমরানের ১৫৩ আয়াতে আল্লাহ পাক উহুদের যুদ্ধের পর্যালোচনা উপলক্ষে সে কথার উল্লেখ করেছেন।

(৩) মূসা (আ.)-এর প্রভাব বেড়ে যেতে দেখে ফিরআউন রাজ-দরবারের লোকদেরকে বললো, 'আমাকে বাধা দিও না, আমি মূসাকে কতল করব।' ফিরআউন মহাশক্তিশালী বাদশাহ আর মূসা (আ.)-এর সাথে তার ভাই হারূন (আ.) ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাদের কাছে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু ফিরআউনের পক্ষ থেকে হত্যার হুমকি শুনে তিনি অতি শান্তভাবে ঘোষণা করলেন, 'আখিরাতের হিসাব-নিকাশ যেসব অহংকারীরা বিশ্বাস করে না, তাদের অনিষ্ট থেকে আমি অবশ্যই ঐ সত্তার নিকট আশ্রয় নিয়েছি, যিনি আমার রব এবং তোমাদের রব।' (সূরা মুমিন-২৭) এখানে মূসা (আ.) স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, 'আমাকে হত্যার ভয় দেখাচ্ছ ? আমি তো এমন এক মুনীবের নিকট আশ্রয় নিয়েছি, যিনি আমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাকেও আমার অনিষ্ট করা থেকে ফিরিয়ে রাখার যোগ্যতা রাখেন।

(৪) হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরূদ আগুনে ফেলে দেবার ঘোষণা দিল। ইবরাহীম

www.bjilibrary.com

(আ.) একবিন্দুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহ এ অবস্থা দেখে নিজেই আগুনকে নির্দেশ দিলেন, 'হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও, ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' (সূরা আম্বিয়া-৬৯)

এসব উদাহরণ আল্লাহ পাক গল্প বলার জন্য উল্লেখ করেন নি। যারা আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর যমীনে কায়েম করার উদ্দেশ্যে জান ও মাল কুরবানী দেবার জন্য সত্যিকারভাবে প্রস্তুত, তাদেরকে ঐ মহা বর্ম অবশ্যই হাসিল করতে হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেবার চেয়ে বড় কোন নিরাপত্তা নেই। এ নিরাপত্তাবোধ নিয়ে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে হাসিমুখে শহীদ হওয়া সম্ভব। এ মনোভাবই মুসলিম সেনাপতির প্রধান অস্ত্র। এ অস্ত্র না থাকলে অন্যান্য অস্ত্র সত্ত্বেও পরাজয় আসবে। আর এ অস্ত্র থাকলে অন্য অস্ত্রের অভাব হলেও বিজয় সম্ভব।

রাসূল (সা.)-এর উপর যাদুর প্রভাব ঃ এ কথা ঐতিহাসিক সত্য এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, মাদীনার ইয়াহুদীরা রাসূল (সা.)-এর এক ইয়াহুদী কর্মচারীর সাহায্যে তার চিরুনি ও মাথার কতক চুল নিয়ে তাতে যাদু করে একটা কুয়ার ভিতর মাটিতে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল। অনেক দিনে ধীরে ধীরে এর কুফল দেখা গেল। অবশ্য নবী হিসাবে রাসূল (সা.)-এর উপর যে পবিত্র দায়িত্ব ছিল, তার উপর যাদুর কোন প্রভাব পড়ে নি। শুধু দৈহিক দিক দিয়ে তিনি রোগা হতে লাগলেন। কোন কাজ না করেই তিনি কখনো মনে করতেন যে, করেছেন। হঠাৎ মনে হতো যে, তিনি যেন কিছু দেখছেন, অথচ তিনি আসলে দেখেন নি। যাদুর এ জাতীয় যে প্রভাব দেখা গেল, তা অনুভব করে রাসূল (সা.) একদিন আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকলেন। এ অবস্থায় একটু ঘুম ঘুম ভাব হলো। জেগেই তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, 'আমার রবকে আমি যে কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলেন যে, দু'জন ফেরেশতার একজন আমার মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে একে অপরের সাথে আলাপ করার মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, লাবীদ বিন আ'সাম নামক ইয়াহুদী আমার চিরুনি ও চুলে যাদু করে খেজুরের খোসা দিয়ে ঢেকে অমুক কুয়ার মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। কুয়ার পানি ফেলে ঐ জিনিসটা বের করে নিতে হবে।

রাসূল (সা.) হযরত আলী (রা.)-সহ কতক সাহাবাকে সেখানে পাঠালেন এবং নিজেও সেখানে গেলেন। জিনিসটা বের করে দেখা গেল যে, চিরুনি ও চুলের সাথে একটা সুতায় এগারটা গেরো দেয়া আছে এবং মোমের একটা পুতুলে এগারটা সুঁই বিঁধানো আছে।

জিবরাঈল (আ.) এসে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি 'মুআব্বিযাতাইন' পড়ুন। তিনি এক এক আয়াত পড়তে থাকলেন। সাথে সাথে এক একটা গেরো খোলা হতে লাগলো এবং এক একটা সুঁই বের করা হলো। এ দুটো সূরার এগারটি আয়াত পড়ার সাথে গেরো ও সুঁই খুলে ফেলার পর রাসূল (সা.) এমন হালকা অনুভব করলেন যেন তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং এখন সে বন্ধন খুলে দেয়া হয়েছে।

যাদুর এ ঘটনা হাদীস থেকে এতটুকুই প্রমাণিত। যাদুর প্রভাব একজন মানুষ হিসাবে অবশ্যই রাসূল (সা.)-এর দেহের উপর পড়েছিল। এ দ্বারা নবুওয়াতের উপর কোন ক্রমেই প্রভাব

www.bjilibrary.com

পড়ার কারণ নেই। তায়েফে তিনি পাথরের আগাতে রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। উহুদের যুদ্ধে তীরের আঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন, এমনকি তার দাঁত পর্যন্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল। একবার তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলেন। এক সময় বিচ্ছুর কামড়ে তিনি বেদনা বোধ করেছিলেন। মানুষ হিসাবে এসব অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাসূল (সা.)-এর শরীরে ও মনে যে প্রভাব পড়েছিল, তাতে যদি নবুওয়াতের মর্যাদার কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে জাদুর কারণে অসুস্থ হওয়ার দরুন নবুওয়াতের উপর কোনরূপ প্রভাব পড়ার কোনই যুক্তি নেই।

ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান ঃ এ দুটো সূরার মারফত যেভাবে রাসূল (সা.)-কে যাদুর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করা হলো, তাতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাকের আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ইসলামে জায়িয। রাসূল (সা.) নিজেও শোবার সময় এ সূরা দুটি পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে সারা শরীরে হাত বুলিয়েছেন।

আরব সমাজে রোগের চিকিৎসা হিসাবে বা সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কামড়ালে মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক করার প্রথা চালু ছিল। রাসূল (সা.) প্রথমে এসব করা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব দ্বারা মানুষের যে উপকার হচ্ছিল, সে বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি দুটো শর্তে অনুমতি দিলেন ঃ

(১) মন্ত্রের কথাগুলো অর্থবোধক হতে হবে-তাতে এমন আজে-বাজে কথা থাকতে পারবে না, যা অর্থহীন।

(২) মন্ত্রের কথাগুলোতে শিরকের লেশও থাকতে পারবে না এবং তাতে তাওহীদের বিপরীত কোন কথা থাকা চলবে না।

একবার রাসূল (সা.)-কে নামাযরত অবস্থায় বিচ্ছু কামড়ে দিয়েছিল। নামায শেষে তিনি লবণ পানিতে মিশিয়ে মালিশ করালেন এবং সাথে সাথে সূরা কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়তে থাকলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চিকিৎসা করাতে হবে, কিন্তু রোগমুক্ত করার আসল ক্ষমতা যে আল্লাহর, সে কথা মনে রাখতে হবে। তাই চিকিৎসার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের কাছে দোয়া করতে হবে। কারণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছে হলে তবেই ঔষুধ ও চিকিৎসায় সুফল হবে। শুধু ঔষুধেই যদি রোগ সেরে যেতো, তাহলে হাসপাতালে কেউ মারা যেতো না।

একবার রাসূল (সা.)-এর অসুখ হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আল্লাহর নাম নিয়ে তাকে ঝাড়লেন। তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেলেন। এতে লোকেরা আশ্বর্য বোধ করলেন। তিনি বললেন, 'জিবরাঈল এসে কতক কথা দ্বারা আমাকে ঝেড়েছেন।'

মোটকথা, আল্লাহর নাম নিয়ে বা আল্লাহর কালামের সাহায্যে ঝাড়-ফুঁক করা জায়িয বলে প্রমাণিত। কিন্তু শুধু এর উপর নির্ভর করা এবং কোন রকম চিকিৎসার চেষ্টা না করা ঠিক নয়। রাসূল (সা.) চিকিৎসা করার তাকিদ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা তিনি নিজেও শিক্ষা দিয়েছেন বলে হাদীসে প্রমাণিত। চিকিৎসা এক জিনিস, আর ঝাড়-ফুঁক অন্য জিনিস। চিকিৎসা করতে হবে রোগ মুক্তির তদবীর হিসাবে। আর ঝাড়-ফুঁক হলো আল্লাহর নিকট দোয়া করা যাতে চিকিৎসায় উপকার হয়।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর নাম ও তার কালাম দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা জায়িয, এমনকি সুন্নাত হলেও এটাকে চিকিৎসার ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করার কোন প্রমাণ সাহাবায়ে কেরামের যুগে দেখা হয় নি। যারা ডাক্তারদের মতো দোকান খুলে এ ব্যবসাকে রুযী-রোযগারের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন, তাদের পক্ষে হাদীসে মযবুত কোন যুক্তি পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতিহা ও এ দুটো সূরার মধ্যে মিল ঃ কুরআন মজীদ সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এ দুটো সূরা দিয়ে শেষ হয়েছে। যদিও এ দুটো সূরা মাক্কী যুগেই নাযিল হয়েছে, তবু কুরআন পাকের সূরাগুলোকে সাজাবার সময় এ সূরা দুটিকে সর্বশেষে রাখা হয়েছে। কুরআন আল্লাহ পাকই নাযিল করেছেন এবং তিনিই সূরাগুলোকে এভাবে সাজাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই প্রথম সূরা ও শেষ দুটো সূরার এ বিন্যাস তাৎপর্যবিহীন নয়।

প্রথম সূরাতে রাব্বুল আলামীন, রাহমান ও রাহীম এবং মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের (বিচার দিবসের মালিকের) প্রশংসা করে আল্লাহর বান্দাহ নিবেদন করছে যে, 'আমি একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আর সবচেয়ে বড় যে সাহায্য আমার দরকার, তা হলো এই যে আমাকে সরল মযবুত পথে চালাও।

এ দরখাস্তের জওয়াবে বান্দাহকে সঠিক পথ দেখাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক তাঁকে যে কুরআন দান করলেন, তা এ কথা দ্বারা শেষ করা হলো, 'যে মুনীব রাব্বুল ফালাক, রাব্বুন নাস, মালিকিন নাস ও ইলাহিন নাস, তাঁরই কাছে বান্দাহ সবশেষে আরয করছে যে, 'আমি প্রতিটি সৃষ্টির যাবতীয় ফিতনাহ ও অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তোমারই কাছে আশ্রয় চাই। বিশেষ করে জিন ও মানুষের মধ্যে যারা কুপরামর্শ দেয়, তাদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় ছাড়া কুরআনে দেখানো পথে চলার সাধ্য আমার নেই।'

সূরা ফাতিহা ও এ দুটি সূরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অতি স্পষ্ট। কুরআনের শুরু ও শেষ মুনীব ও দাসের সম্পর্ককে কত গভীর করে দিয়েছে! আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে এ গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-ফালাক

সূরা ঃ ১১৩ | মাক্কী যুগে

মোট আয়াত ঃ ৫ | মোট রুকু ঃ ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১-২. (হে রাসূল) আপনি বলুন, আমি সকাল বেলার রবের[১] নিকট আশ্রয় চাই, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।

৩. আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়।

৪. এবং গিরায় ফুঁক দানকারীদের (বা ফুঁক দান কারিণীদের)[৩]

৫. আর হিংসুক যখন হিংসা করে,[৪] তার অনিষ্ট থেকে।

سورة الفلق

مكية | رقمها : ١١٣

اياتها : ٥ | ركوعها : ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ

٢- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ

٣- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ

٤- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
فِى الْعُقَدِ ۙ

٥- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ࣖ

১। মানে, ঐ রবের নিকট, যিনি রাতের অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল ও ফরসা সকাল এনে দেন।

২। কেননা যুলুম ও অন্যায় সাধারণত রাতেই হয়ে থাকে এবং অনিষ্টকারী জীব-জানোয়ার রাতের বেলায়ই বের হয়।

৩। এখানে জাদুকর পুরুষ ও নারী বুঝাচ্ছে, যারা গিরায় ফুঁ দিয়ে জাদু করে।

৪। মানে, যখন সে হিংসা করে কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

www.bjilibrary.com

সূরা আন-নাস	سورة الناس
সূরা ঃ ১১৪ মাক্কী যুগে	مكية رقمها : ١١٤
মোট আয়াত ঃ ৬ মোট রুকু ঃ ১	اياتها : ٦ ركوعها : ١
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	بسم الله الرحمن الرحيم

১-৩. (হে রাসূল) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের (আসল) মাবুদের কাছে।	١- قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ٢- مَلِكِ النَّاسِ ۙ ٣- اِلٰهِ النَّاسِ ۙ
৪. ঐ কুপরামর্শ দাতার[১] অনিষ্ট থেকে, যে বার বার ফিরে আসে।❖	٤- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۖ ۙ
৫. যে মানুষের দিলে কুপরামর্শ দেয়।	٥- اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ
৬. সে জিন হোক আর মানুষ হোক।[২]	٦- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

১। 'ওয়াসওয়াস' অর্থ যে ফুসলিয়ে বা কুপরামর্শ দিয়ে কুপথে নেবার চেষ্টা করে। "ওয়াসওয়াসাহ" অর্থ কুমন্ত্রণা। এ থেকেই 'ওয়াসওয়াস' শব্দটি এসেছে।

২। অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা মানুষ হোক আর জিন (শয়তান) হোক, উভয়ের অনিষ্ট থেকেই আমি আশ্রয় চাই।

❖ 'খান্নাস' অর্থ পলায়নকারী। শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে পালিয়ে যায়, আবার এসে কুমন্ত্রণা দেয়।

www.bjilibrary.com

অনুবাদে আরবি ও উর্দূ শব্দের ব্যবহার

কুরআনের তরজমা করতে গিয়ে বহু আরবি শব্দের বাংলা অনুবাদ না দিয়ে আরবি শব্দই বাংলা অক্ষরে লিখেছি। যেমন রব, মুমিন, ঈমান, আমল, হালাল, হারাম, মুত্তাকী, হিদায়াত ইত্যাদি। আমার ধারণা যে, মুসলিম জনগণ এ শব্দগুলো মোটামুটি বুঝেন।

বাংলায় এক এক শব্দে এর অনুবাদ করলে তাদের বুঝতে সহজ হবে না। অবশ্য এ সব শব্দের সঠিক অর্থ অনেকেরই জানা নেই। তাই এই জাতীয় শব্দগুলোর একটা তালিকা তৈরি করে এর সরল অর্থ এখানে পেশ করে দিলাম।

মুসলিম সমাজে বহু উর্দূ ও ফারসি শব্দ এত বেশী প্রচলিত যে, এ সবের বাংলা অর্থ সে তুলনায় সহজ মনে হয় না। যেমন-আসমান, যমীন, নেকী, বদী, গুনাহ, কুফরী, মুনাফিকী ইত্যাদি। এ সব শব্দের বাংলা অনুবাদ না করে এগুলো বাংলা অক্ষরেই লিখে দিয়েছি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতদের পক্ষে এসব শব্দ বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে এরও একটা তালিকা তৈরি করে বাংলা তরজমা ও কিছু ব্যাখ্যা করলাম।

অনুবাদে যে সব আরবি, উর্দূ ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা থেকেই এ তালিকা তৈরি করে বাংলা আক্ষরিক ক্রমানুযায়ী সাজানো হয়েছে।

প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যে এমন কতক শব্দ পাওয়া যায়, যা অভিধানে দেয়া সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন বা অতিরিক্ত কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ অর্থকে বলা হয় আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ। আর বিশেষ অর্থকে পারিভাষিক অর্থ বলা হয়। এ জাতীয় শব্দগুলোকে ঐ ভাষা ও সাহিত্যের পরিভাষা বলা হয়। কুরআনের যেসব শব্দের অর্থ এখানে আলোচনা হচ্ছে, সে সবও কুরআনের পরিভাষা। তাই এ সবের শাব্দিক অর্থের সাথে সাথে পারিভাষিক অর্থও দেয়া হলো।

আরবি শব্দের তালিকা

আখিরাত ঃ 'আখির' মানে শেষ। 'ইয়াওমুল আখির' মানে শেষ দিন। আখিরাতের শাব্দিক অর্থ ভবিষ্যত বা পরবর্তী, যা পরে আসবে। পারিভাষিক অর্থে পরকাল বা মৃত্যুর পরের অবস্থা।

আযাব ঃ শাব্দিক অর্থ ব্যথা, যন্ত্রণা, ভোগান্তি, নির্যাতন, পীড়ন। পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া শাস্তি। বিশেষ করে মৃত্যুর পর যে শাস্তি, তাকেই আযাব বলে।

আমাল ঃ শাব্দিক অর্থ কাজ। পারিভাষিক অর্থ ঐ সব কাজ, যার ভিত্তিতে আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

আমালে সালিহ ঃ সালিহ মানে ভাল, যোগ্য, উপযোগী, পুণ্যবান ইত্যাদি। আমালে সালিহ এমন কাজ, যা মানুষের জন্য ভাল ও উপযোগী, যে কাজ যোগ্যতার পরিচায়ক। পরিভাষা হিসাবে

www.bjilibrary.com

এর অর্থ হলো, ঐ সব কাজ করা, যা আল্লাহ ও রাসূল পছন্দ করেন এবং ঐ সব কাজ থেকে বিরত থাকা, যা তাঁরা অপছন্দ করেন। কারণ, এভাবে চলাই মানব জীবনের জন্য মঙ্গলকর, এসব কাজই মানব সমাজের উপযোগী এবং এসব কাজের মাধ্যমেই মানবিক যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

আরশ ঃ শাব্দিক অর্থ রাজ-সিংহাসন, বাদশাহর আসন। পরিভাষা হিসাবে আল্লাহর আরশ মানে আল্লাহর সিংহাসন যার উপর তিনি বিরাজমান। তা দেখতে কেমন এবং তাতে তিনি কিভাবে বিরাজমান সে বিষয়ে কোন ধারণা করার সাধ্য মানুষের নেই।

আহলি কিতাব ঃ কিতাবধারী, কিতাবের অধিকারী। পারিভাষিক অর্থে ইয়াহুদ ও নাসারা (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান), যাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত কিতাব আছে। তাওরাত ও ইনজীল আল্লাহরই প্রেরিত কিতাব। যদিও ঐ কিতাব বিশুদ্ধ অবস্থায় নেই তবু তারা আল্লাহর কিতাব বলেই বিশ্বাস করে।

আয়াত ঃ শাব্দিক অর্থ চিহ্ন, প্রমাণ, নিদর্শন, প্রতীক, পরিচায়ক ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে কুরআনের যে কোন বাক্যকে আয়াত বলা হয়। কুরআনের আয়াতকে এ জন্য আয়াত বলা হয় যে, তা আল্লাহর পরিচয় বহন করে। গোটা সৃষ্টি জগত এবং এর প্রতিটি অংশই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় বলে এ সবকেও আয়াত বলা হয়।

ইখলাস ঃ খালাসা মানে বিশুদ্ধ হয়েছে। খালেস মানে পরিষ্কার, বিশুদ্ধ, ভেজালহীন। এ থেকেই ইখলাস শব্দ হয়েছে। এর অর্থ সরল, অকপট, প্রকৃত, আসল, খাঁটি, স্পষ্ট, আন্তরিকতাপূর্ণ।

ইনসাফ ঃ নিসফ অর্থ অর্ধেক। নাসাফা মানে মাঝামাঝি পৌঁছেছে, বেশ-কম না করা, সমান সমান দু'ভাগ করা হয়েছে। এ থেকে ইনসাফ শব্দ হয়েছে। এর অর্থ হলো সুবিচার, ন্যায়, সমান আচরণ, নিরপেক্ষতা, ন্যায় ব্যবহার ইত্যাদি।

ইন্তিকাল ঃ নাকালা মানে স্থানান্তর হয়েছে, জায়গা বদল করা, চলা। নাকল অর্থ স্থানান্তর, পরিবহন, ট্রান্সফার। এ থেকেই ইন্তিকাল শব্দ তৈরি হয়েছে। এর অর্থ স্থানান্তরিত হওয়া, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অপসারিত হওয়া, সরিয়ে দেয়া। ইন্তিকালের পারিভাষিক অর্থ মৃত্যু, এ দুনিয়া থেকে আর এক জগতে যাওয়া বা বদলী হওয়া।

ইবাদাত ঃ 'আবদ' মানে দাস, গোলাম। ইবাদাত অর্থ দাসত্ব বা গোলামের কাজ, অর্থাৎ মুনীবের হুকুম পালন করা। আল্লাহর সব হুকুম পালন করাই ইবাদাত। নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত হল বুনিয়াদী ইবাদাত, যা আর সব কাজকে ইবাদাতে পরিণত করে। মুনীবের হুকুম পালনই ইবাদাত। রমযান মাসে রোযা রাখা মুনীবের হুকুম। আবার ঈদের দিনে রোযা না রাখাই হুকুম। তাই রমযানে রোযা রাখা এবং ঈদে রোযা না রাখা ইবাদাত। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রোযা রাখাই ইবাদাত নয়, মুনীবের হুকুম পালনই ইবাদাত। রোযা রাখাই যদি ইবাদাত হয়, তাহলে ঈদের দিনে রোযা রাখলেও ইবাদাত হতো। এ অর্থে দুনিয়ার সব কাজই ইবাদাত বলে গণ্য, যদি সে সব কাজ আল্লাহর হুকুম মতো করা হয়।

ইলম ঃ শাব্দিক অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা। পরিভাষা হিসাবে ঐ জ্ঞানকেই ইলম বলা হয়, যা আল্লাহ

www.bjilibrary.com

পাক ওহীর মাধ্যমে রাসূলের নিকট পাঠিয়েছেন। আর যত জ্ঞান ওহীর বিপরীত নয়, তাও ইলম। মানুষের মনগড়া যেসব বিদ্যা ওহীর বিপরীত, তা ইলম নয়।

ইলহাম ঃ শাব্দিক অর্থে ইলহাম ও ওয়াহীর অর্থ একই। গোপন ইশারা, খবর জানানো ইত্যাদি। পরিভাষা হিসাবে ইলহাম মানে ঐ জ্ঞান, যা যে কোন মানুষের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসতে পারে। এ জ্ঞান চেষ্টা-সাধনার স্বাভাবিক ফল নয়। সাধকের নিকট ইলহামী জ্ঞান আসে। কিন্তু তারাও অনুভব করে যে, এ জ্ঞান সাধনার ফসল নয়, এর উর্ধ্বের বিষয়। বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারও এ পর্যায়ের জ্ঞান। কিন্তু ইলহাম দ্বারা দ্বীনী জ্ঞানই বুঝায়। নাবীর কাছে প্রেরিত ইলমকে ওয়াহী বলে এবং অন্য মানুষের কাছে প্রেরিত জ্ঞানকে ইলহাম বলে।

ইলাহ্ ঃ এমন হুকুমকর্তা, যার হুকুম করার নিরংকুশ অধিকার আছে। এমন সত্তা, যে অভাব পূরণ, আশ্রয় দান ও শান্তি দানের ক্ষমতা রাখেন। এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি অদৃশ্য হওয়ার দরুন তাঁকে মনের চোখে তালাশ করতে হয়। মানুষের অন্তহীন অভাববোধ এবং শান্তি ও আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষার ফলে সে এতটা অসহায় বোধ করে যে, সে এমন এক সত্তাকে তালাশ করতে বাধ্য হয়। এমন ইলাহ্ একজনই আছেন। তাই ইলাহ্ শব্দের সাথে আলিফ ও লাম ব্যবহার করলে আল-ইলাহ্ শব্দ তৈরি হয় এবং এর অর্থ হলো একমাত্র ইলাহ্। এই আল-ইলাহ্ শব্দই আল্লাহ শব্দে পরিণত হয়েছে। আল্লাহই যেহেতু একমাত্র ইলাহ্ হবার যোগ্য, তাই শুধু তাঁরই নাম আল্লাহ। আর কেউ এ নামে পরিচিত নয়।

ইসলাম ঃ সিলম ও সালাম অর্থ শান্তি, প্রশান্তি, স্থিরতা। সালামা মানে নিরাপদ হলো। আসলামা অর্থ আত্মসমর্পণ করল, অধীন হলো। ইসলাম থেকেই আসলামা শব্দ হয়েছে। ইসলামের শাব্দিক অর্থ হলো শান্তি ও আত্মসমর্পণ। পারিভাষিক অর্থ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাবী করীম (সা.) এর মাধ্যমে প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা, যার কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করা যায়।

ইয়াকীন ঃ ইয়াকীন মানে নিশ্চিত হওয়া। ঈকান অর্থ নিশ্চয়তা। এ থেকে ইয়াকীন হয়েছে। এর অর্থ নিশ্চয়তাবোধ, নিশ্চিত বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, মযবুত ঈমান।

ইয়াতীম ঃ অনাথ, পিতৃ-মাতৃহীন। অল্প বয়সে যার পিতা মারা গেছে সে তার মা থাকা সত্ত্বেও ইয়াতীম।

ইহ্সান ঃ শাব্দিক অর্থ বদান্যতা, হিতকামিতা, অনুকম্পা, দানশীলতা, দয়ার কাজ ইত্যাদি। 'আহসানা' মানে ভালভাবে করেছে। এ থেকে ইহ্সান মানে ঐ কাজ, যা ভালভাবে করা হয়েছে। দানশীলতা ও বদান্যতা এমন কাজ যা ভালভাবে করা হয়। এ ইহ্সান মানুষের সাথে করা হলে এর অর্থ হয় দয়া, মহব্বত, অনুগ্রহ, পাওনার চেয়ে বেশী দেয়া বা কারো কাছ থেকে পাওনার চেয়ে কম নেয়া। পরিভাষার দিক দিয়ে আল্লাহর সাথে ইহ্সান করার অর্থ গভীর আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে আল্লাহর হুকুম পালন করা। রাসূল (সা.) ইহ্সানের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'এমনভাবে ইবাদত করা যেন বান্দাহ আল্লাহকে দেখছে। যদি এতটা সম্ভব না হয়, তাহলে এমন সচেতন হয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করা যে, আল্লাহ্ তাকে দেখতে পাচ্ছেন।'

www.bjilibrary.com

ঈমান ঃ আমান মানে নিরাপত্তা, শান্তি। আমীন মানে বিশ্বস্ত, অনুগত। ঈমানের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় ঈমান অর্থ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিশ্বাস করা। বিশ্বাস অর্থ হলো এমন সব বিষয়কে সত্য মনে করা, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও যুক্তি ও বুদ্ধি সে সবকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সব জিনিসকে জানা যায়, সে সবের প্রতি বিশ্বাস আনার দরকার হয় না। অদৃশ্য বিষয়ের জন্যই ঈমানের দরকার। ঈমানের ফলেই নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়া সম্ভব।

ওয়াহী ঃ শাব্দিক অর্থ গোপনে জানানো, ইশারা করা, খবর দেয়া। পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বাণী বা ইঙ্গিত। এ ওয়াহীর মারফতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যে সব সহজাত গুণ আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া। আর কেউ তা দেয় নি। নিজে নিজেও তারা শিখে নি। যেমন মৌমাছির সুন্দর মৌচাক তৈরি ও মধু আহরণের যোগ্যতা। তাই কুরআনে বলা হয়েছে '(হে নবী) পাহাড়ে বাসা তৈরি করার জন্য আপনার রব মৌমাছির কাছে ওয়াহী পাঠিয়েছেন।' (নাহল-৬৮)

ওয়ারিস ঃ ইরস বা ভিরাসাত বা মীরাস মানে উত্তরাধিকার। ওয়ারিস অর্থ উত্তরাধিকারী। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যাদের অধিকার ইসলাম স্বীকার করেছে, তারাই ওয়ারিস।

কবুল ঃ কবুল বা কাবুল করা মানে স্বীকার করা, গ্রহণ করা, রাযী হওয়া, মনযুর করা, সম্মতি দেয়া।

কসম ঃ শাব্দিক অর্থ শপথ, প্রতিজ্ঞা। কোন কথাকে সত্য বলে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যেই কসম করা বা খাওয়া হয়। ইসলামে একমাত্র আল্লাহর নামে কসম করারই অনুমতি আছে। এ কসমের অর্থ হলো আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলা। সাধারণত কসম করে কোন কথা বললে শ্রোতারা সে কথা সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব অবস্থায়ই সত্য বলেন। কোন কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য তাঁর কসম খাওয়ার কোন দরকার নেই। অথচ কুরআনের বহু জায়গায় বিশেষ করে আমপারায় তিনি সবচেয়ে বেশী কসম খেয়েছেন। এ কসমের উদ্দেশ্য কি?

আল্লাহ পাক বহু জিনিসের নামে কসম খেয়েছেন। কসমের পরবর্তী কথার যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবেই ঐ সব জিনিসের কসম করেছেন। যেমন সূরা আসর। আসর মানে সময়। সময়ের কসম করে তিনি এ সূরায় যেসব কথা বলেছেন, তার প্রমাণ হিসাবেই সময়কে পেশ করেছেন। এ ভাবেই যে জিনিসের নাম দিয়ে কোথাও কসম খেয়েছেন, সে জিনিসের সাথে কসমের পরবর্তী কথার অবশ্যই সম্পর্ক আছে। কসমের পর যে কথা বলা হয়েছে, সে কথার যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবেই ঐ কসম খাওয়া হয়েছে।

কাওম ঃ শাব্দিক অর্থ জাতি, জনগণ, দেশবাসী। যখন কুরআনে কোন জনগোষ্ঠীকে নবীর কাওম হিসাবে বলা হয়েছে, তখন এর অর্থ নেয়া হয়েছে, 'ঐসব লোক, যাদের হিদায়াতের জন্য ঐ নবীকে পাঠানো হয়েছে।' যেমন কাওমে লূত বললে ঐ লোকদেরকেই বুঝায়, যাদেরকে লূত (আ.) দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। 'ইয়া কাওমী' বলে নবীগণ যে সম্বোধন করেছেন, তার অর্থ হলো, 'হে আমার দেশবাসী।'

www.bjilibrary.com

কাফির ঃ শাব্দিক অর্থ যে গোপন করে বা ঢেকে রাখে। চাষী জমির নীচে ফসলের বীজ ঢেকে দেয় বলে কাফির অর্থ চাষীও হয়। পারিভাষিক অর্থে মুমিনের বিপরীত শব্দই কাফির। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা যে অস্বীকার করে, এ সবের পক্ষে তার মনে যেসব যুক্তির উদয় হয়, তা সে গোপন করে, বিবেকের দাবীকে সে ঢেকে রাখে, তাই সে ঈমান আনতে রাযী হয় না। অর্থাৎ সে কাফির।

কালব ঃ কালাবা মানে বদলানো, উল্টানো, ফেরানো বা পরিবর্তন করা হয়েছে। এ থেকেই ইনকিলাব শব্দ হয়েছে। যার অর্থ হলো বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন। কালব মানে ঐ বস্তু, যে পরিবর্তনশীল, যে এক অবস্থায় থাকে না। মন বা দিলকে এ জন্যই কালব বলা হয় যে, বিভিন্ন অবস্থায় সে বদলে যায়।

কিতাব ঃ কাতাবা মানে লিখেছে। কিতাবের শাব্দিক অর্থ লিখিত জিনিস, বই, চিঠি, লিখিত বাণী ইত্যাদি। পরিভাষায় কিতাব মানে কুরআন ও অন্যান্য ইসলামী বই।

কিরামান কাতিবীন ঃ কিরাম মানে সম্মানিত, কাতিব মানে লেখক। শাব্দিক অর্থ সম্মানিত লেখক। পরিভাষায় ঐ সব ফেরেশতাকে বুঝায়, যারা মানুষের ভাল-মন্দ আমলকে রেকর্ড করে রাখেন।

কিয়ামাত ঃ শাব্দিক অর্থে কিয়াম করা, দাঁড়ান, উঠা, উত্থান। পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ হলো দুনিয়ার বর্তমান কাঠামো ভেঙ্গে দেবার পরবর্তী অবস্থা। আল্লাহ পাক বর্তমান পৃথিবী ও গোটা বস্তু জগত ধ্বংস করে আবার সমস্ত মানুষকে জীবিত করে এক নৈতিক জগত কায়েম করবেন। যেখানে মানুষের বিচার হবে এবং ইনসাফের সাথে সবাইকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে। এ সবটুকু অবস্থাকে এক সাথে 'কিয়ামাত' বলা হয়। দুনিয়া ধ্বংস হওয়া থেকেই কিয়ামাতের শুরু। কিয়ামাতের দ্বিতীয় পর্যায়কেই আখিরাত বলা হয়। পুনরুত্থান থেকেই আখিরাতের শুরু।

দুনিয়ার জীবনে মানুষকে যে ইখতিয়ার ও আযাদী দেয়া হয়েছে, মৃত্যুর সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যাবে। এরপর মানুষ একমাত্র আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। তাই এ অবস্থার নাম দেয়া হয়েছে কিয়ামাত বা কিয়ামাহ।

কুফর ঃ কাফিরের আচরণকেই কুফর বলে। এর অর্থ হলো অস্বীকার, অমান্য, অবাধ্যতা, অবিশ্বাস ইত্যাদি।

গযব ঃ শাব্দিক অর্থ রাগ, উগ্রতা, গভীর ক্রোধ। পরিভাষায় আল্লাহর প্রচণ্ড অসন্তোষ ও ক্ষোভ।

গাইব ঃ গাইব বা গায়ব অর্থ যা গোপন আছে বা যা দেখা যায় না। গাবা মানে ডুবে যাওয়া, অনুপস্থিত হওয়া। যা উপস্থিত বা হাযির নয়, তাই গাইব। পরিভাষায় এর অর্থ হলো ঐ সব অদৃশ্য বিষয়, যার উপর বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য জরুরী।

জান্নাত ঃ শাব্দিক অর্থ বাগান। পরিভাষায় স্বর্গ বা বেহেশত বুঝায়। জান্নাত ঐ জায়গার নাম, যেখানে শুধু সুখ আছে এবং যেখানে কোনরকম দুঃখ নেই। অভাবের কারণেই দুঃখ হয়। জান্নাতে

www.bjilibrary.com

কোন অভাব থাকবে না। সেখানে মন যা চাবে তা-ই পাবে (সাজদা-৩১)। জান্নাত এমন এক সুখকর চিরশান্তিময় জায়গা, যেখানে একমাত্র অভাবেরই অভাব আছে। আর কিছুরই অভাব নেই।

যালিম ঃ যুলম মানে অন্যায়, অবিচার, যা করা উচিত তার বিপরীত কাজ, যে উদ্দেশ্যে যাকে ব্যবহার করা উচিত নয়, সে উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা ইত্যাদি। যে যুলুম করে, তাকে যালিম বলে। তাই যালিম অর্থ অত্যাচারী, অবিচারক, অন্যায়কারী ইত্যাদি। পরিভাষায় যালিম ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ফলে নিজের ও গোটা সৃষ্টির উপর যুলুম করার দোষে দোষী।

জাহান্নাম ঃ দোযখ, নরক। জাহান্নাম ঐ জায়গার নাম, যেখানে শুধু দুঃখ ও কষ্ট স্থায়ীভাবে আছে। বেহেশতে যে অভাবের অভাব রয়েছে, সে অভাব সবটুকুই দোযখে আছে। যেখানে শুধু অভাবই আছে আর কিছুই নেই। আর অভাবই দুঃখের কারণ। তাই জাহান্নাম চির দুঃখের জায়গা।

যিকর ঃ শাব্দিক অর্থ স্মরণ করা, মনে করা, ইয়াদ করা। পরিভাষায় আল্লাহকে মনে রাখা। আল্লাহকে মনে রাখার জন্যই তাসবীহ জপা হয় বলে এ কাজকে যিকর বলা হয়। মুখে আল্লাহর নাম নেবার সাথে সাথে মনে মনে খেয়াল রাখা না হলে যিকর হয় না। মনে যিকর করা যাতে সহজ হয়, সেজন্যই মুখের দরকার। সব কাজ আল্লাহর মরযী ও পছন্দ মতো করাই হলো আসল যিকর। মুখে আল্লাহর নাম জপ করার উদ্দেশ্যও তাই। নামাযকেও কুরআনে যিকর বলা হয়েছে। মুখে নাম জপা ও নামায আদায় করার মাধ্যমে সব সময় আল্লাহকে মনে রাখার চেষ্টা করা হয়, যাতে সব সময় ও সব অবস্থায় আল্লাহর মরযী মতো সব কাজ করা হয়।

জিন ঃ আগুনের তৈরি এক সচেতন জীব। মানুষের আগে এ জাতিকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। মানুষের মতো জিনকেও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যার ফলে ভাল কাজ ও মন্দ কাজের স্বাধীনতা তাদেরও আছে। তাই তারাও মানুষের মতো আখিরাতে পুরস্কার ও শাস্তি পাবে। মানুষের সাথে জিনের পার্থক্য একটি জায়গায়। আল্লাহ পাক মানুষকে দুনিয়ায় খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। জিনকে এ দায়িত্ব দেয়া হয় নি। এ কারণেই সমস্ত নবীই মানুষ ছিলেন। জিন জাতির মধ্য থেকে কাউকে নবী বানান হয় নি। অবশ্য তারাও মানুষ নবীর কাছ থেকেই হিদায়াত পায়।

জিহাদ ঃ জুহদ মানে চেষ্টা, পরিশ্রম। জাহাদা মানে বিরোধী শক্তির সাথে টক্কর দিয়ে চেষ্টা করেছে। জুহদ থেকেই জিহাদ শব্দ হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে চেষ্টায় লেগে থাকা। পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ হলো আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য বাতিলের সৃষ্ট সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকা থেকে শুরু করে ইসলামী আন্দোলনের সব পর্যায়ে যা কিছু করা দরকার হয়, তা সবই জিহাদে শামিল। এমনকি একপর্যায়ে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করারও দরকার হতে পারে। সাধারণত এ লড়াইকেই জিহাদ মনে করা হয়। কিন্তু এটা ভুল। এ লড়াই অবশ্যই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জিহাদ বললে শুধু এ লড়াই বুঝায় না। লড়াই-এর জন্য আর একটা পরিভাষা কুরআনে আছে- তা হলো

কিতাল। কিতাল মানে একে অপরকে মারা বা কতল করার চেষ্টা। যে জিহাদ করে, তাকেই মুজাহিদ বলে।

তারীকা ঃ তারীকা মানে পথ, রাস্তা। তারীকা মানে পন্থা, উপায়, নিয়ম, পদ্ধতি। সুন্নাহ অর্থও তাই।

তাওহীদ ঃ ওয়াহিদ মানে এক, আহাদ মানে অদ্বিতীয়, একক। তাওহীদ মানে একত্ব ঘোষণা করা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো আল্লাহকে সর্বদিক দিয়ে অদ্বিতীয় হিসাবে বিশ্বাস করা। আল্লাহর যাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), ইখতিয়ার (ক্ষমতা) ও হুকুক (অধিকার)-এর দিক দিয়ে আর কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক না করাই তাওহীদের দাবী। এসব দিক দিয়েই একক ও অদ্বিতীয় বলে আল্লাহকে মেনে নেয়ার নামই তাওহীদ।

তাকওয়া ঃ 'ওয়াকয়ুন' মানে সংরক্ষণ করা, পাহারা দেয়া, সাবধান হওয়া, আশ্রয় দেয়া, প্রতিরক্ষা করা, হিফাযত করা। 'ইত্তাকা' মানে কোন কিছুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সাবধান হয়ে চলা, ক্ষতিকর বিষয় থেকে নিজকে পাহারা দেয়া ও রক্ষা করা। এর পারিভাষিক অর্থ হলো এমন সাবধান হয়ে চলা, যাতে আল্লাহর অপছন্দনীয় সব কিছু থেকে বেঁচে থাকা যায়। সব ব্যাপারেই মন্দ থেকে বেঁচে চলার চেষ্টাই হলো তাকওয়া। যেহেতু আল্লাহর ভয় ছাড়া এভাবে চলা সম্ভব নয়, তাই তাকওয়ার অর্থ করা হয় খোদা-ভীতি।

তাকদীর ঃ কাদর মানে মূল্য, মর্যাদা, মান। কাদ্‌দারা অর্থ গুণ বিচার করেছে, নির্দেশ দিয়েছে, ফয়সালা করেছে। তাকদীর শব্দের অর্থ নির্ধারণ, নির্দেশ, ধার্য, মূল্য নিরূপণ। পারিভাষিক অর্থ সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত এবং স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধি-বিধান।

সমস্ত সৃষ্টির সাথে মানুষও আল্লাহর নির্ধারিত বিধানের অধীন। মানুষকে সামান্য যেটুকু স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তা শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টার বেলায়। ভাল বা মন্দ কাজের ইচ্ছা করা ও এর জন্য চেষ্টা করার ইখতিয়ারটুকু ছাড়া আর সব বিষয়েই মানুষ আর সব সৃষ্টির মতোই তাকদীরের অধীন। কোন কাজ করে ফেলার ইখতিয়ারও মানুষের নেই, সে শুধু চেষ্টা করার অধিকারী।

এ তাকদীরের কারণেই মানুষকে শুধু ইচ্ছা ও চেষ্টা করার জন্য পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। কোন কাজ সম্পন্ন করতে না পারলেও সে কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টার ভিত্তিতেই কাজের বিচার হবে। তাকদীরে না থাকলে কাজ সম্পন্ন হবে না। কিন্তু সে কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করে থাকলে এর বদলা পাবে। ভাল কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সে কাজটা করতে না পারলেও পুরস্কার পাবে।

তাফসীর ঃ ফাসসারা মানে ব্যাখ্যা করেছে বা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে, বিশদভাবে আলোচনা করেছে। এ থেকে তাফসীর অর্থ ব্যাখ্যা, বিশদ আলোচনা। পরিভাষায় কুরআনের ব্যাখ্যাকে 'তাফসীর' বলা হয়।

তাসবীহ ঃ সাব্বাহা মানে প্রশংসা করেছে বা গৌরব প্রকাশ করেছে। সুবহুন বা তাসবীহ মানে প্রশংসা। সুবহাতুন ও মিসবাহাতুন মানে জপমালা। এ জপমালাকেও তাসবীহ বলা হয় বাংলা ও উর্দূতে। এ মালার দানা গুনে তাসবীহ পড়া হয় বলে মালার নামই হয়ে গেছে তাসবীহ।

www.bjilibrary.com

দাওয়াত ঃ দোয়া মানে ডাক, আহ্বান, চাওয়া। দাওয়াত অর্থ ডাকার কাজ, আহ্বান জানাবার কাজ। বাংলায় নিমন্ত্রণ অর্থেও দাওয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কারো বাড়ীতে দাওয়াত দিয়েছে মানে যেতে আহ্বান জানিয়েছে। সাধারণত খাওয়ার জন্যই ডাকা হয় বলে এটাকে 'দাওয়াত খাওয়া' বলা হয়।

দ্বীন ঃ দ্বীন শব্দটিকে কয়েকটি অর্থে কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা ফাতিহাতে এর অর্থ প্রতিদান, প্রতিফল বা বদলা। মূলত দ্বীনের শাব্দিক অর্থ আনুগত্য, আনুগত্যের বিধান, আইন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা, জীবন বিধান ইত্যাদি। দ্বীন ইসলাম মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলাম নামে যে জীবন বিধান রাসূলের নিকট পাঠানো হয়েছে। উপরিউক্ত কয়েকটি অর্থে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

নাবী ঃ নাবা মানে খবর, সংবাদ। নাবী মানে সংবাদবাহক। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছাবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণই নাবী।

নবুওয়াত ঃ সংবাদ বহনের দায়িত্ব বা কাজটিই হলো নবুওয়াত। নাবীর পদটিকেই নবুওয়াত বলে।

নাফস ঃ নাফস শব্দটিকে বহু অর্থে কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও প্রবৃত্তি অর্থে, কোথাও জীবন অর্থে, কোথাও আত্মা অর্থে, কোথাও মন অর্থে, কোথাও মানুষ অর্থে, কোথাও নিজ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে নাফস মানে মানবদেহের দাবী বা প্রবৃত্তি ও স্পৃহা। মানবদেহ বস্তু দিয়ে তৈরি বলে বস্তু জগতের দিকে তার প্রবল আকর্ষণ। এ আকর্ষণের ফলে ভালমন্দ বিচার না করে দেহ যখন অবাধে ভোগ করতে চায়, তখন কুরআনে এর নাম দেয়া হয়েছে নাফসে আম্মারা (ইউসুফ-৫৩)। রূহ হলো নৈতিক সত্তা। এরই পরিচয় হলো বিবেক। রূহ বা বিবেক ভালমন্দ বিচার করে নাফসকে ভোগে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত নাফসকে নাফসে লাওয়ামা (কিয়ামাহ-২) নাম দেয়া হয়েছে। আর নাফস যখন নৈতিক দিক দিয়ে রূহের সাথে একমত হয় এবং নাফস ও রূহের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ যখন থাকে না, নাফস তখন নাফসে মুতমাইন্নাহ-এর মর্যাদা পায় (ফাজর-২৭)। মুতমাইন্নাহ অর্থ প্রশান্ত। এতমিনান শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। এতমিনান অর্থ প্রসন্নতা, তুষ্টির প্রশান্তি, স্থিরতা।

নিফাক ঃ 'নিফাকুন' মানে সুড়ং বা গোপন পথ। সুড়ং-এর এক ছিদ্র দিয়ে ঢুকে অপর ছিদ্র দিয়ে বের হওয়া যায়। এ থেকেই নিফাক শব্দ হয়েছে। এর অর্থ হলো কপটতা বা ভণ্ডামি। পরিভাষায় নিফাক মানে মুসলিম না হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম পরিচয় দেয়া। সে দেখাচ্ছে যে, ইসলামে প্রবেশ করেছে- কিন্তু সুড়ং-এর অপর ছিদ্র দ্বারা সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। মুখে একরকম, আর মনে অন্যরকম হওয়াই নিফাক।

নিয়ামাত ঃ আরবীতে শব্দটি নি'মাতুন, না'মাতুন। অর্থ আরাম, সহজ, সৌভাগ্য, উন্নতি। নি'মাতুন মানে এমন অনুগ্রহ, যা আরামদায়ক, যা জীবনকে সহজ ও সুখকর বানায়, যা সৌভাগ্য ও উন্নতির কারণ হয়। বাংলা ও উর্দূ উচ্চারণে নি'মাতুন শব্দটি নিয়ামাত শব্দে পরিণত হয়েছে।

ফাকীর ঃ 'ফাকর' মানে দরিদ্রতা, অভাব, গরীবী অবস্থা। ফাকীর অর্থ অভাবী, গরীব, দরিদ্র,

www.bjilibrary.com

নিঃসম্বল, যার জীবিকার কোন পথ নেই।

ফাজির ঃ ফুজুর মানে লাম্পট্য, নীতিহীনতা, কামুকতা, অসংযম জীবন, নৈতিক সীমালংঘন ইত্যাদি। যার এসব দোষ আছে, সেই ফাজির। ফুজুর-এর শাব্দিক অর্থ ছিঁড়ে ফেলা। শরীয়তের পর্দা যে ছিঁড়ে ফেলে সেই ফাজির।

ফাসিক ঃ 'ফিসক' ও 'ফুজুর'-এর অর্থ প্রায় একই। ফাজির ও ফাসিক শব্দের অর্থ লম্পট, কামুক, নীতিহীন, অসংযমী। পারিভাষিক অর্থে ঐ ব্যক্তি ফাসিক ও ফাজির, যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে। অর্থাৎ পাপী, গুনাহগার ও দোষী।

ফিতনা ঃ ফাতানা অর্থ মোহিত করেছে, প্রলুব্ধ করেছে, যাদু করেছে, বুদ্ধিভ্রষ্ট করেছে, বিপথে নিয়ে গেছে। এ থেকে ফিতনা শব্দ তৈরি হয়েছে। যে কারণে মুগ্ধ হয় ও প্রলুব্ধ হয় বা বুদ্ধিহারা হয় এবং বিপথে যায়, সে কারণটাকেই ফিতনা বলে। তাই ফিতনা অর্থ পরীক্ষা, অজুহাত। ঐ কারণটা পরীক্ষা হিসাবেই আসে এবং ঐ অজুহাতেই বিপথগামী হয়। পরিভাষা হিসাবে আল্লাহর আনুগত্য করার পথে যতরকম বাধা সৃষ্টি হয়, তারই নাম ফিতনা। দুনিয়ার যেসব জিনিসের মহব্বত আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাও ফিতনা। সন্তান ও ধন-সম্পদকে এ অর্থেই ফিতনা বলা হয়েছে। (তাগাবুন-১৫)

বাখীল ঃ বুখল মানে কৃপণতা। বাখীল অর্থ কৃপণ।

বাতিল ঃ বুতলুন অর্থ মিথ্যা, অসত্য। বাতিল মানে যা অস্তিত্বহীন, মিথ্যা, পরিত্যাজ্য, অগ্রাহ্য, তুচ্ছ, অসার, নিরর্থক। হক শব্দের বিপরীত অর্থেই বাতিল শব্দ ব্যবহার করা হয়।

মাওত ঃ এর অর্থ মৃত্যু, বিনাশ, লয়।

মাগফিরাত ঃ গাফারা অর্থ মাফ করেছে, ক্ষমা করেছে। মাগফিরাত ও গুফরান মানে ক্ষমা, মার্জনা। ইসতিগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া।

মাশগুল ঃ শুগল মানে পেশা, কাজ, ব্যস্ততা, ব্যবসা। মাশগুল অর্থ ব্যস্ত, কাজে মগ্ন, যার অবসর নেই।

মাহরূম ঃ বঞ্চিত, নিরাশ, যে কিছু পায়নি।

মাল ঃ ধন, সম্পদ, যাবতীয় মূল্যবান জিনিস।

মিসকীন ঃ মাসকানাতুন অর্থ দারিদ্র্য, মিসকীন মানে দরিদ্র, গরীব, নিঃস্ব। পরিভাষায় এর অর্থ হলো এমন লোক, যে ফাকীরের মত নিঃসম্বল নয় বটে, কিন্তু যা তার দরকার, তার চেয়ে কম আছে।

মুখলিস ঃ ইখলাস থেকে মুখলিস শব্দ হয়েছে। যার ইখলাস আছে, সেই মুখলিস (ইখলাস অর্থ দেখুন)। এর শাব্দিক অর্থ খাঁটি, নিষ্ঠাবান, একনিষ্ঠ, সৎ, আন্তরিকতাসম্পন্ন, অকপট, সরল।

মু'জিযা ঃ 'আজযুন মানে অক্ষমতা, দুর্বলতা, ব্যর্থতা, অসহায়ত্ব, ক্ষমতাহীনতা। এ থেকেই মু'জিযা শব্দ হয়েছে। এর অর্থ হলো এমন ঘটনা বা কাজ, যা মানুষ করতে অক্ষম। পরিভাষায় ঐ সব কাজকে মু'জিযা বলে, যা অলৌকিক, যা সাধারণ নিয়মে হতে পারে না, যা আশ্চর্যজনক।

www.bjilibrary.com

নবীদের জীবনে এমন যে সব ঘটনা ঘটেছে, তাকে মু'জিযা বলে। নাবী ছাড়া আল্লাহর ওলীদের জীবনে এ জাতীয় যা ঘটে, তাকে কিরামত বলে। এ সবই আল্লাহর কাজ। কোন মানুষ নিজের ইচ্ছায় এ সব করতে অক্ষম।

মুত্তাকী ঃ তাকওয়া অর্থ দেখুন। যার মধ্যে তাকওয়ার গুণ আছে, তিনিই মুত্তাকী। অর্থাৎ যিনি ভাল ও মন্দ বাছাই করে ভালটা গ্রহণ করেন ও যা কিছু মন্দ তা ত্যাগ করেন। যিনি আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার জীবন যাপন করেন, তিনিই মুত্তাকী। (বাকারা-১৭৭)

মুনাফিক ঃ নিফাক অর্থ দেখুন। যার মধ্যে নিফাকের দোষ আছে, সেই মুনাফিক। মুনাফিক অর্থ কপট।

মুফাসসির ঃ তাফসীর অর্থ দেখুন। যিনি কুরআনের তাফসীর করেন, তিনিই মুফাসসির। মুফাসসির অর্থ কুরআনের ব্যাখ্যাদানকারী বা বিশদ আলোচনাকারী।

মুমিন ঃ ঈমান অর্থ দেখুন। যার মধ্যে ঈমান আছে, তিনিই মুমিন। এর অর্থ বিশ্বাসী, ঈমানদার। যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, সেই মুসলিম। মুসলিম অর্থ হলো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী।

মুশরিক ঃ শিরক অর্থ দেখুন। যে শিরকে লিপ্ত, সেই মুশরিক। মুশরিক অর্থ অংশীবাদী তাওহীদ-বিরোধী।

রব ঃ কুরআন পাকে এ শব্দটি বিভিন্ন আকারে নয় শতের বেশী বার ব্যবহার করা হয়েছে। তারবিয়াত ও মুরব্বী শব্দ দুটো এ থেকেই তৈরি। বহু অর্থে রব শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১। প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী, ক্রমবিকাশদাতা।

২। যিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, দেখাশুনাকারী।

৩। নেতা, সর্দার, যাঁর আনুগত্য করা হয়, ক্ষমতাশালী কর্তাব্যক্তি, যাঁর কর্তৃত্ব স্বীকৃত, যাঁর হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার আছে।

৪। মালিক, মুনীব, প্রভু, স্রষ্টা।

রাসূল ঃ রিসালাত অর্থ বাণী, চিঠি, সংবাদ, প্রবন্ধ, সরকারী চিঠি। রাসূল মানে বাণীবাহক, সংবাদ পরিবেশনকারী, দূত। পরিভাষায় আল্লাহর বাণীবাহক, আল্লাহর দূত যাকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে যার উপর রিসালাত বা বাণী নাযিল করা হয়েছে।

রিযক ঃ জীবিকা, জীবন ধারণের উপকরণ। বস্তুগত উপকরণ ছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন দানই রিযকের মধ্যে শামিল। সন্তান, ইলম, যোগ্যতা ইত্যাদিও রিযকের মধ্যে গণ্য। পরিভাষায় একমাত্র হালাল মালই রিযক। হারাম মাল রিযকে গণ্য নয়।

রূহ ঃ এর শাব্দিক অর্থ আত্মা, জীবন, চেতনা। পরিভাষায় এর অর্থ বিবেক বা নৈতিক সত্তা। মানুষের শরীর বস্তু দিয়ে তৈরি। কিন্তু রূহ বস্তু নয়। আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন. 'বল যে, রূহ আল্লাহর হুকুম বা বিষয়, এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য ইলমই দেয়া হয়েছে' (বনী ইসরাঈল-৮৫)। মানবদেহ বস্তুর দিকে টানে, আর রূহ আল্লাহর দিকে টানে। তাই দেহের

www.bjilibrary.com

সাথে রূহের লড়াই চলে (নাফসের অর্থ দেখুন)। এ লড়াইয়ে নামায, রোযা, যিকর, জিহাদ ইত্যাদি রূহকে বিজয়ী করে।

রিওয়ায়াত ঃ রাওইয়া মানে বর্ণনা করা, বিবরণ দেয়া। রিওয়ায়াত মানে বিবরণ, বর্ণনা, রিপোর্ট, শোনা কথা, ইতিহাস, গল্প ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ হাদীসে বর্ণিত বিষয়।

লা'নাত ঃ অভিশাপ, বদদোয়া, অমঙ্গল কামনা, শাপ।

শাহীদ ঃ শাহাদাত অর্থ সাক্ষী, সাক্ষাৎ, প্রমাণ, সার্টিফিকেট। শাহীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ সাক্ষী। এর পারিভাষিক অর্থ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা, কোন আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করা। এ জাতীয় মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে সে ব্যক্তি প্রমাণ দেয় যে, সে ঐ আদর্শের সত্যিকার ধারক। সে জীবন দিয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ঐ আদর্শের জন্য নিষ্ঠাবান।

শায়তান ঃ শাতানা অর্থ দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। শায়তান মানে যাকে অভিশপ্ত করে চিরতরে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে যার মুক্তি নেই। ইবলীসেরই আর এক নাম শায়তান রাখা হয়েছে। শায়তান নাম নয়, গালি।

শাফায়াত ঃ শাফায়া মানে মধ্যস্থতা করেছে, সুপারিশ করেছে। শাফায়াতের শাব্দিক অর্থ পক্ষ সমর্থন, ওকালতি, মধ্যস্থতা। পারিভাষিক অর্থে প্রধানত উম্মতের পক্ষে আল্লাহর কাছে নাবীদের সুপারিশ বুঝায়। সাধারণভাবে আখিরাতে সবরকম সুপারিশই শাফায়াত হিসেবে গণ্য। কুরআন, নামায, রোযা ইত্যাদিই শাফায়াত করবে। নাবী ছাড়াও আল্লাহ পাক যাকে খুশী শাফায়াতের সুযোগ দেবেন। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফায়াত করতে পারবে না।

শিরক ঃ শরীক অর্থ অংশীদারী, সঙ্গী, সহযোগী। শিরক-এর শাব্দিক অর্থ শরীক করার কাজ। পরিভাষায় এর অর্থ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করার কাজ। তাওহীদের বিপরীত পরিভাষাই হলো শিরক। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে আর কাউকে শরীক করাকেই শিরক বলে। আল্লাহকে অস্বীকার যারা করে, তারাই শিরকে লিপ্ত হয়; যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা নাস্তিক বা মুলহিদ। আর যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, তারা মুশরিক। শিরককে বুঝতে হলে তাওহীদকে বুঝতে হবে। তাওহীদকে বুঝতে হলেও শিরককে জানতে হবে। (তাওহীদের অর্থ দেখুন)।

শুকরগোযারী ঃ কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা, শুকরিয়া জানানো।

সবর ঃ এর শাব্দিক অর্থ ধৈর্য, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা। বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে আপন লক্ষ্যে স্থির থাকা, যে কাজে যতটা সময় দরকার, ততোটা সময় অপেক্ষা করা, কাজের ফল অস্বাভাবিক উপায়ে তাড়াতাড়ি পাওয়ার চেষ্টা না করা, আপাতমধুর প্রলোভনে না ভুলে আপন আদর্শের পথে মযবুত হয়ে টিকে থাকা ইত্যাদি অর্থে 'সবর' শব্দটি কুরআন পাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের পথে মানুষকে দাওয়াত দিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, যুলুম-নির্যাতন ও অপমান সইতে হয় বলে এ কাজ ছেড়ে দেবার অজুহাত দেখিয়ে যারা বলে, 'মানুষ কথা শুনে না, বলতে গেলে অপমানিত হতে হয়, তাই সবর ইখতিয়ার করেছি, তারা আসলে সবরই ত্যাগ করেছেন।

তারা যে অর্থে 'সবর' শব্দ ব্যবহার করেন, তা সবরেরই সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূল (সা.) এবং সাহাবাগণ (রা.) যদি সবরের এ অর্থ নিতেন, তাহলে দ্বীন ইসলাম তখনই খতম হয়ে যেতো।

সাওয়াব ঃ পুরস্কার, কাজের বদলা। গুনাহর বিপরীত।

হাক ঃ শাব্দিক অর্থ সত্য, সঠিক, শুদ্ধ, প্রকৃত, অধিকার ইত্যাদি। পরিভাষা হিসাবে বাতিলের বিপরীত অর্থেই হাক শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেহেতু আল্লাহ-ই একমাত্র হাক, তাই যা আল্লাহর বিধান, তা-ই হাক বা সঠিক ও বিশুদ্ধ। এর বিপরীত যা, তা অবশ্যই বাতিল বা অসত্য। হাক শব্দের আর একটি অর্থ হলো অধিকার বা প্রাপ্য। হাক মানে পাওনা বা যা পাওয়া উচিত। হাক্কুল্লাহ মানে আল্লাহর পাওনা।

হামদ ঃ মানে প্রশংসা, গুণ বর্ণনা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। পরিভাষায় আল্লাহর প্রশংসাকে হামদ বলা হয়।

হারাম ঃ নিষিদ্ধ, নৈতিকতা বিরোধী কাজ, বেআইনী আচরণ, অবৈধ। ইসলামী পরিভাষায় যা আল্লাহ ও রাসূল নিষেধ করেছেন, তা-ই হারাম। কাবাঘরে অনেক কিছু করা নিষেধ বলে তাকে বায়তুল হারাম বলা হয়। হারাম শব্দের আরেক অর্থ সম্মানিত। এ অর্থেও কাবা বায়তুল হারাম।

হালাল ঃ বৈধ, রীতিসিদ্ধ, সঠিক, আইনসম্মত। পারিভাষিক অর্থে যা আল্লাহ ও রাসূল নিষেধ করেন নি, তা-ই হালাল। হারামের বিপরীত অর্থেই হালাল শব্দ ব্যবহৃত।

হায়াত ঃ মাওতের বিপরীত শব্দ হায়াত। মানে জীবন, অস্তিত্ব।

হিফয ঃ সংরক্ষণ, নিরাপদে রাখা, পাহারা, যত্ন নেয়া। যারা কুরআন মুখস্থ করে, তারা তাদের মনে কুরআনকে সংরক্ষণ করে বলে মুখস্থ করাকে হিফয বলে। যারা মুখস্থ করে, তাদেরকে হাফিয বলে।

হিদায়াত ঃ হুদা অর্থ সঠিক পথ, পথ দেখানো। হিদায়াত মানে দেখানো সঠিক পথ। হাদী মানে পথ-প্রদর্শক বা নেতা।

হিসাব ঃ গণনা, বিবেচনা, হিসাব করা।

উর্দূ ও ফারসি

আমলনামা ঃ আমল মানে কাজ, নামা মানে লেখা, রচনা। শাব্দিক অর্থ কাজের লিখিত বিবরণ। পরিভাষায় মানুষের যাবতীয় কাজের যে রেকর্ড আখিরাতে মানুষকে দেয়া হবে।

আসমান ঃ আকাশ। যা কিছু পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আছে।

আসান বা আসানা ঃ সহজ, যা কষ্টদায়ক নয়।

ইয়াদ ঃ মনে রাখা, মুখস্থ করা, স্মরণ করা।

ওয়াকিফহাল ঃ ওয়াকিফ মানে যে জানে, হাল মানে অবস্থা, ওয়াকিফহাল অর্থ যে হাল-অবস্থা জানে।

www.bjilibrary.com

কামিয়াব ঃ সাফল্য, সফলতা, কৃতকার্যতা। যে সফল হয়, সে কামিয়াব বা সে কামিয়াবী হাসিল করল।

কুফরী ঃ আরবি কুফর দেখুন। কুফরেরই উর্দূ কুফরী। অর্থাৎ কাফিরী কাজ, যে কাজ কাফিরদের পক্ষেই সম্ভব বা সাজে।

গুনাহ ঃ পাপ, সাওয়াবের বিপরীত। সাওয়াব আরবি শব্দ।

গুমরাহ ঃ গুম মানে হারানো, রাহ মানে পথ। গুমরাহ মানে পথহারা, পথভ্রষ্ট। গুমরাহী মানে পথভ্রষ্টতা।

যমীন ঃ মাটি, পৃথিবী, দেশ, জমি।

যিন্দেগী ঃ জীবনযাপন।

তাকিদ ঃ চাপ, আদেশ, গুরুত্ব, জোর দেয়া।

দীদার ঃ দেখা, সাক্ষাৎ, দর্শন।

নাফরমানী ঃ নাফরমান মানে বিদ্রোহী, অবাধ্য। নাফরমানের কাজকেই নাফরমানী বলে- অর্থাৎ অবাধ্যতা, বিদ্রোহ।

নেকী ঃ নেক মানে ভাল, ভাগ্যবান, মঙ্গলজনক। ভাল কাজকেই নেকী বলে। সাওয়াবের কাজই নেকী। সাওয়াব অর্থেই নেকী শব্দের ব্যবহার হয়।

ফাসিকী ঃ ফাসিকের কাজকে ফাসিকী বলে। আরবিতে ফিসক বলে। ফাসিক অর্থ দেখুন।

ফায়সালা ঃ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, মধ্যস্থতা, বিচার।

বদী ঃ নেকীর বিপরীত অর্থে বদী শব্দ ব্যবহার করা হয়। বদ মানে মন্দ, দুর্ভাগা। বদের যে কাজ, তা-ই বদী। বদী অর্থ মন্দ বা খারাপ কাজ। গুনাহ অর্থেই বদী শব্দের ব্যবহার হয়।

বান্দাহ ঃ দাস, খাদেম। দাসের কাজকে বলে বন্দেগী। বন্দেগী মানে দাসত্ব। ইবাদাতের অর্থও বন্দেগী।

বেদ্বীন ঃ 'বে' না-বোধক শব্দ। বেদ্বীন মানে যে দ্বীনদার নয়, যে দ্বীনের ধার ধারে না। অর্থাৎ অধার্মিক।

বে-পরওয়া ঃ পরওয়া না থাকা। পরওয়া অর্থ দরকার, ঠেকা, উৎকণ্ঠা, ইচ্ছা, মনোযোগ। বে-পরওয়া মানে যে ঠেকা মনে করে না, ধার-ধারে না, অবহেলা করে, মনোযোগ দেয় না, নির্লিপ্ত।

মিনার ঃ উঁচু স্তম্ভ।

মুশকিল ঃ কঠিন, জটিল, শক্ত, কষ্টদায়ক।

মুনাফিকী ঃ আরবি নিফাকের উর্দূ হলো মুনাফিকী।

শিরিকী ঃ আরবি শিরকের উর্দূই শিরিকী।

সীনা ঃ বুক, বক্ষ, বক্ষস্থল।

হিফাযত ঃ রক্ষা, সংরক্ষণ, নিরাপদে রাখা।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

তাফহীমুল কুরআন

সারসংক্ষেপ

আমপারার তাফসীর

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.bjilibrary.com